যুক্তবঙ্গের স্মৃতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

আচার্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মরণে

উত্তর-ভূমিকা

প্রথম সংস্করণে যার নাম ছিল 'স্বাধীনতার পূর্বাভাষ' নতুন সংস্করণে তার নামান্তর হলো 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি'। "যাতে ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" প্রকারান্তরে এটি আমার আত্মচরিত, সেই সময়ের, যে সময় আমি ছিলুম পূর্ববঙ্গে নয় বছর ও পশ্চিমবঙ্গে নয় বছর। তেমনি শাসন বিভাগে নয় বছর ও বিচার বিভাগে নয় বছর। অদ্ভুত, না?

সেই সময়টার উপর যবনিকা পড়ে ১৪ই অগাস্ট, ১৯৪৭। একই সঙ্গে শেষ হয় ব্রিটিশ আমল ও লোপ পায় যুক্তবঙ্গ। আর সেই সঙ্গে আমার ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ। কারণ সার্ভিসটাকেই ইংরেজরা গুটিয়ে নেয়। আমরা যাঁরা থেকে যাই তাঁদের পরিচয় যদিও আই. সি. এস. রূপে তবু প্রকৃতপক্ষে আমরা উচ্চতর পর্যায়ের আই. এ. এস.। ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের সদস্য। আমি আমার ব্রিটিশ আমলের সার্ভিস জীবনের কথাই লিখেছি। তার আদি ও অন্ত যুক্তবঙ্গে।

যুক্তবঙ্গের প্রতি আমি একপ্রকার নসটালজিয়া বোধ করি। কে না করেন? সেখানে আমরা পরাধীন ছিলুম, পরাধীনতা সুখের নয়। কিন্তু পরাধীনতাই কি একমাত্র সত্য? রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা কি ভোলা যায়? স্মৃতি সতত সুখের।

অন্নদাশঙ্কর রায়

পূর্ব-ভূমিকা

স্বাধীনতার পূর্বে আমি ছিলুম অবিভক্ত বঙ্গের প্রশাসনে কর্মরত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। আমার ব্রিটিশ আমলের কার্যকাল ছিল প্রায় আঠারো বছর। তার অর্ধেকের উপর কাটে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সেদিনকার পূর্ববঙ্গ কোথায় মিলিয়ে গেছে! সেই নামে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ আর নেই। যা আছে তার নাম বাংলাদেশ। যা গেছে তার স্মৃতি আমার কাছে চিরমধুর। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। যৌবনকে স্মরণ করতে গেলে পূর্ববঙ্গকেও স্মরণ করতে হয়।

এই মনে করে আমি একদিন লিখতে বসি 'পূর্বঙ্গের স্মৃতি'। কয়েকটি কিস্তি সেই নামেই শারদীয় 'উল্টোরথে' বেরোয়। সেই নামে শেষ করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু একদিন শারদীয় 'যুগান্তরে'র তরফ থেকে প্রফুল্ল রায় চান শেষের অংশ। তাঁরই অনুরোধে নামান্তর হয় 'পূর্বাভাষ'। অর্থাৎ দেশ কেমন করে দু'ভাগ হলো তারই পূর্বাভাষ। সেইসূত্রে 'পূর্ব'কে রক্ষা করা গেল, কিন্তু 'বঙ্গকে' নয়।

দেশ কেমন করে ভাগ হলো সেকথা বিশদ করতে হলে শুধু পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা কেন পশ্চিমবঙ্গের' অভিজ্ঞতাকেও ঠাঁই দিতে হয়। নইলে প্রায় ছ' বছরের ফাঁক থেকে যায়। সুতরাং লিখতে হলো 'অন্তর্বর্তী কাল'। শারদীয় 'হিমাদ্রি'র জন্যে। পূর্ব পশ্চিম মিলিয়ে অবিভক্ত বঙ্গের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হলো ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি। বাদ পড়ল আমার চাকরির গোড়ার দিকে পৌনে দুই বছর। যখন আমি মুর্শিদাবাদের ও বাঁকুড়ার অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেটুকু না লিখেই লেখাগুলি সাজিয়ে বই করে বার করতে দিই শৈব্যা পুস্তকালয়ের রবীন্দ্রনাথ বলকে। তিনি বলেন 'পূর্বাভাষ' নামে তো অন্য একজনের একখানা উপন্যাস আছে, একই নামে বই করার চেয়ে নাম পালটে দেওয়াই ভালো। তিনিই প্রস্তাব করেন 'স্বাধীনতার পূর্বাভাষ'। আমি সে প্রস্তাব সমর্থন করি। দেশভাগ আর স্বাধীনতা একই দিনে ও একই ক্ষণে সম্পন্ন হয়। উভয়েরই প্রস্তুতি দীর্ঘকাল জুড়ে। সুতরাং এই নামটিও অযথা নয়।

বই ছাপা প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় খেয়াল হয়, পশ্চিমবঙ্গই যদি থাকে তবে চাকরির শুরু থেকে কেন নয়? আদিপর্ব ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ কেন বাদ পড়ে? তাতেও তো স্বাধীনতার পূর্বাভাষ। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ, ছাব্বিশে জানুআরি স্বাধীনতা দিবস পালন, লবণ সত্যাগ্রহ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, এসব কি স্বাধীনতার পূর্বাভাষ নয়? তাই 'সূত্রপাত'রূপে আরো একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে দিচ্ছি।

অন্নদাশঙ্কর রায়

যুক্তবঙ্গের স্মৃতি

সূত্রপাত

ভাবতে অবাক লাগে বঙ্গ তখন অবিভক্ত ছিল। আমার উপর নির্দেশ, বম্বেতে জাহাজ থেকে নেমে সটান কলকাতা গিয়ে বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারীর সকাশে রিপোর্ট করতে হবে যে আমি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত হয়েছি। চীফ সেক্রেটারী তখন মিস্টার প্রেণ্টিস, পরে স্যার উইলিয়াম প্রেণ্টিস। পুত্রের সঙ্গে পিতার মতো ব্যবহার করেন। জিজ্ঞাসা করেন বাড়ি গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই কিনা। তা হলে ক'দিন জয়েনিং টাইম চাই। আমি তো লম্বা সময় চেয়েছিলুম। তিনি দিন সাতেক সময় দেন। তার পরেই জয়েন করতে হবে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর স্টেশন বহরমপুরে। হতে হবে অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেখানে আমার উপরওয়ালা হবেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেকটর মিস্টার জে সি. ফ্রেঞ্চ, আই. সি. এস.।

একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে বহরমপুর পৌঁছই। কেউ আমাকে নিতে আসেনি। পথঘাট অজানা। কোথায় উঠব তাও কি জানতুম? ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে বলি, "চলো কলেকটর সাহেবের কুঠি।" ফ্রেঞ্চ সাহেব আমাকে দেখে খুশি হন, বিশেষত আমি ইটালি ও দক্ষিণ ফ্রান্স হয়ে এসেছি শুনে। তাঁরও তো পরিকল্পনা অকালে অবসর নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস। প্রৌঢ় চিরকুমার। শিল্পে আগ্রহশীল। পালযুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। আমার কথাবার্তা শুনে তাঁর ধারণা জন্মায় যে আমিও একজন কলারসিক। আলাপ শুরু হয় আর্ট নিয়ে, তার থেকে আসে রাজনীতি। সে সময় ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়ে আলোচনা চলছে, কিন্তু ইতিমধ্যে জবাহরলালরা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের রব তুলেছেন। সাহেব বলেন, "তোমাদের সৈন্য নেই, অস্ত্র নেই, স্বাধীনতা পেলে তোমরা রাখবে কী করে? একদিন জাপান এসে আক্রমণ করবে। জবাহরলাল কি এটা বোঝেন না?" আমি বলি, "জবাহরলালের মতে পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক ঈর্ষা ভারতকে রক্ষা করবে।" তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, "শার্ক'স! শার্ক'স! শার্ক'স! হাঙ্গর! হাঙ্গর! হাঙ্গর! সব ক'টাই হাঙ্গর। রক্ষা করবে না, ভক্ষণ করবে।" রাজনীতি থেকে যুদ্ধবিগ্রহ। সাহেব যদিও সিভিলিয়ান তবু মিলিটারি জেনারেলদের উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। মানুষের মধ্যে ওঁরাই নাকি সেরা। একটা যুদ্ধ পরিচালনা কি কম শৌর্যবীর্যের, কম বুদ্ধিমত্তার, কম সম্বন্ধতার পরিচায়ক? পলিটিসিয়ানদের তিনি পাত্তাই দেন না। আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে ইংলণ্ডের সদ্যনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড নাকি অজ্ঞাত পিতার সন্তান। তাতে ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

আবিষ্কার করি যে আমার বন্ধু করুণাকুমার হাজরা তখন সেখানকার

অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁরই ওখানে আমার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কোয়ার্টার্সে গিয়ে অবগত হই যে পরের দিন তিনি বহরমপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে। সেখান থেকে যাবেন মহকুমায়। সুতরাং সে-বাসায় আমিই কর্তা। ইচ্ছা করলে তাঁর বাবুর্চিকে আমি আমার বাবুর্চি করতে পারি। আমার একটি বেয়ারা চাই। ইচ্ছা করলে আমি তাঁর অস্থায়ী বেয়ারাকে আমার স্থায়ী বেয়ারা করতে পারি। তাঁর স্থায়ী বেয়ারা ফিরে এসেছে। অস্থায়ীটিও অভিজ্ঞ লোক। হাজরা তাঁর আসবাবপত্র আপাতত রেখে যাচ্ছেন। আমি কিছুকাল ব্যবহার করতে পারি। এ ছাড়া তিনি আমাকে সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন। কাজকর্ম সম্বন্ধেও পরামর্শ দেন। পরের দিন আমি কলেক্টরের কাছারিতে গিয়ে কর্মভার বুঝে নিই, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ভারও তুলে নিই। সামাজিকতাও সেই দিন থেকে শুরু।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই বাংলার লাট স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন আসেন মুর্শিদাবাদ সফরে। কলেকটর তাঁর কাছারির একখানা হলঘরে লাটসাহেবের দরবার বসান। দেয়ালগুলোকে চুনকাম করে নতুন রঙে রাঙানোর সময় আমাকে মনে পড়ে। তাঁর চাপরাসী এসে বলে, "সাহেব সেলাম দিয়েছেন।" মানে, ডেকেছেন। আমি তো ভারী বুঝি? দেখে শুনে আমার মতামত জানাই। তিনি একটু আধটু মেনে নেন। দরবার হয়ে যাবার পর একদিন আমাকে পাকড়াও করে বলেন, "দরবারের দিন আপনি সাধারণ পোশাক পরেছিলেন কেন? মর্নিং ড্রেস নেই? তবে অবিলম্বে কলকাতা গিয়ে মর্নিং ড্রেস বানাতে দিন। যতদিন চাই ততদিন ছুটি পাবেন। আই. সি. এস. শুনলে দর্জিরা ধারে পোশাক দেবে, পরে আস্তে আস্তে শোধ করলে চলবে। মর্নিং ড্রেস হচ্ছে আই. সি. এস.দের ইউনিফর্ম।"

কী বিপদ! এখনো আমি প্রথম মাসের মাইনেই পাইনি। মাইনে পেলেও তার থেকে একটা মোটা অংশ কেটে নেবে বিলেত থেকে ফেরবার সময় যে অ্যাডভান্স নিয়েছিলুম সেটা শোধ দিতে ও আর-একটা মোটা অংশ বাদ যাবে জার্মানীতে ভাইয়ের শিক্ষাব্যয় মেটাতে। বাবুর্চি বেয়ারা জমাদার না থাকলে ছোটসাহেব হওয়া যায় না। বড়োসাহেব, জজসাহেব ও ছোটসাহেব এই তিনজনই আই. সি. এস.। এঁদের মতো সম্মান আর কারো নয়। হাজরা তো সিভিল সার্জনের মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছিলেন, "আর সকলে প্রমোশন পেয়ে আই. এম. এস. হতে পারেন, আই. পি. হতে পারেন, আই. ই. এস. হতে পারেন, কিন্তু আই. সি. এস. হতে হলে গোড়া থেকেই হতে হয়। যেমন জাত ব্রাহ্মণ।" মেজর কাপুর তাঁকে ক্ষমা করেননি। কাপুর ছিলেন পাঞ্জাবী খ্রীস্টান। তাঁর স্ত্রী থাকতেন ফ্রান্সে। সেদেশের মেয়ে।

পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টও পাঞ্জাবী। তিনি হিন্দু। নিম্ন পদ থেকে

প্রমোশন পেতে পেতে আই. পি.। টেনিস খেলতেন অসাধারণ। তাঁর ছেলেরাও তেমনি। বড়োটি তো টেনিস চ্যাম্পিয়ন পুরুষোত্তমলাল মেহতা। ইনি পরে প্রতিযোগিতায় জিতে আই. পি. হন। এঁদের সঙ্গে টেনিস খেলা ছিল আমার নিত্যকর্ম। বহরমপুরের ক্লাব একটি বনেদী প্রতিষ্ঠান। সেখানে বিলিয়ার্ডস ও স্কোয়াশ খেলারও সুবন্দোবস্ত ছিল। বিলিয়ার্ডস আমি রোজ খেলতুম। সাথী না পেলে একা। মার্কার আমাকে শিখিয়ে দিত। ক্লাবে তাসের আসর বসত। কিন্তু আমার তাতে রুচি ছিল না। ছিল না সুরাপানেও। পান করতে ও করাতে হয়। নইলে ক্লাবে খাপ খায় না।

ডিস্ট্রিক্ট ও সেসনস জজ ছিলেন লর্ড সিনহার অন্যতম পুত্র অনারেবল সুশীল-কুমার সিনহা। আমাদের সার্ভিসে ফ্রেঞ্চের তুলনায় জুনিয়র, আমার তুলনায় সিনিয়র। টেনিসের নিয়মিত খেলোয়াড়, কখনো কখনো আমার পার্টনার। তাঁর স্ত্রীও তাই। বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষের দৌহিত্রী। ইনিই ছিলেন আমাদের স্থানীয় অফিসিয়াল সমাজের প্রধান মহিলা। মাঝে মাঝে পার্টি দিতেন। নিমন্ত্রণ করতেন আমাকে ও দ্বিজেনকে। বলতে ভুলে গেছি যে আমার আসার দিন পনেরো বাদে আমার সতীর্থ দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদারও অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। এমনি করে আমরা হই চারজন আই. সি. এস.। দু'জন ছোট সাহেব। সংসার আমরা ভাগাভাগি করে চালাই। যার যার বেয়ারা তার তার। আর সব উভয়ের। টানাটানির হাত থেকে বেঁচে যাই।

শিক্ষানবীশী আমরা বিলেতেই চুকিয়ে দিয়েছি। পরীক্ষায় পাশ করেছি। অশ্বারোহণ তার মধ্যে পড়ে। বহরমপুরে এখন আমরা ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। সব ক'টা বিষয়ে পাশ করতে পারলে সেটলমেণ্ট ট্রেনিং-এর পর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হব। হতে বছর দেড়েক লাগে। পরীক্ষায় কোনো একটা কি দুটো বিষয়ে ফেল করলে আরো মাস কয়েক আটক। আমি রেভিনিউ আইনের পরীক্ষা পরে দিই। তাই আমার মহকুমা পেতে মাস কয়েক দেরি হয়। সে সময়টা আমি বহরমপুরে ফিরে না এসে বাঁকুড়ায় বদলী হয়ে কাটাই। দ্বিজেন্দ্রলাল চলে যান ঝাড়গ্রামে। তাঁকে দেওয়া হয়েছিল প্রথমে কুষ্টিয়া। কে একজন দুর্মুখ সরকারকে জানায় যে তাঁর আদি নিবাস কুষ্টিয়ার চাপড়া গ্রামে। যেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন। তাঁরা তাঁর অনুগ্রহ পাবেন। সরকার কাউকে তাঁর স্বস্থানে নিয়োগ করেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের বেলা সত্যিকার স্বস্থান ছিল কলকাতা। সরকার সেটা গ্রাহ্য করেন না। কুষ্টিয়া কেঁচে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও আমি একসঙ্গে একটি বছর ঘরসংসার করি। কিন্তু শেষের দিকে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। অচেনা অজানা এক বিদেশিনী ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থিনী হয়ে কলকাতা আসেন। সেখান থেকে তাঁর লখনউ যাত্রার কথা।

আমার নামে একটি পরিচয়পত্র ছিল। আমি তাঁকে পরামর্শ দিই বহরমপুরে এসে মুর্শিদাবাদ দর্শন করতে। প্রধান দ্রষ্টব্য হাজারদুয়ারী। আমার চিঠি পেয়ে তিনি কি সত্যি আসবেন ? বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অঘটন আজও ঘটে। তিনি সত্যি সত্যি এলেন। কাছেই সারকিট হাউস। সেইখানেই রাত্রিযাপন। আমাদের সঙ্গে ভোজন। দিন তিনেক পরে যখন তিনি বিদায় নেন তখন তাঁকে আমি দুটি কি তিনটি বাংলা কথা শেখাই। ধরে নিই যে আর দেখা হবে না। কিন্তু পুজোর ছুটিতে কলকাতা গিয়ে শুনি তিনি তখনো কলকাতায় অপেক্ষমাণ। আবার দেখা করি। কথাচ্ছলে বলি, "আমি যাচ্ছি রাঁচীতে বন্ধুর বাড়ি ছুটি কাটাতে। রাঁচীও একটা দেখবার মতো জায়গা। আপনি কলকাতায় বসে না থেকে রাঁচী বেড়িয়ে আসতে পারেন।" তিনি কথা দেন না, কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন রাঁচীতে গিয়ে আমার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর অতিথি হন। সেখান থেকে যখন ফেরেন তখন তিনি শ্রীমতী লীলা রায়। আমাদের বিয়েতে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ছিলেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদের অস্থায়ী কলেকটর যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পরে রায়বাহাদুর। বিবাহের জন্যে তিনিই আমাকে ক্যাজুয়াল লীভ দেন। নিজে রক্ষণশীল কিন্তু আমার বিবাহের বেলা উদার। আমাদের দু'জনের প্রতি তাঁর স্নেহ প্রীতি পরবর্তীকালেও অনুভব করেছি।

বহরমপুরে গিয়ে আমরা দ্বিজেনকে কোণঠাসা করি। দ্বিজেন ইতিমধ্যেই বাগ্‌দান করেছিলেন, কিন্তু সেটেলমেন্ট ক্যাম্প থেকে নিষ্কৃতি না পেলে বিবাহ করতেন না। তাঁর বাগ্‌দানে আমারও কিছু হাত ছিল। এবার দেখা গেল একজনের বিয়ে হলে আরেকজন আর সবুর করতে পারেন না। ক্যাম্পে যাবার আগেই শুভকর্ম সারা করেন। তাঁর বিয়েতে আমি যোগ দিই, কিন্তু লীলা ততদিনে আমেরিকা ফিরে গেছেন পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিতে। সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে দ্বিজেন আর আমি দু'জনেই বিরহী যক্ষ। এক তাঁবুতেই বাস। হুগলী জেলার বৈঁচিতে একমাস, হরিপালে তিনমাস। তারপর দ্বিজেন যাত্রা করেন ঝাড়গ্রামে আর আমি বহরমপুরে ফিরে গিয়ে সংসার গুটিয়ে নিয়ে বাঁকুড়ায়। সেখান থেকে একদিন খড়্গপুর গিয়ে বম্বে মেল থেকে লীলাকে নামিয়ে বাঁকুড়ার ট্রেনে তুলি। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করার সময় হাজরার সঙ্গে দেখা। তিনি যাচ্ছিলেন মেদিনীপুর। সেখানকার জেলাশাসক মিস্টার পেডী নিহত হয়েছেন। চমকে উঠি।

ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল লবণ সত্যাগ্রহ। সংঘটিত হয়েছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। অহিংস ও সহিংস উপায়ে স্বাধীনতার পূর্বাভাষ। সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হয়েছিল দেশভাগের পূর্ব লক্ষণ। বহরমপুরে আমার জায়গায় এসেছিলেন আজিজ আহমদ, আই. সি. এস.। দেশভাগের দিন ইনিই হন পূর্ববঙ্গের চীফ

সেক্রেটারি। তখনো তাঁর কার্যকালের সতেরো বছর পূরো হয়নি। তাঁর সমসাময়িকরা কেউ কমিশনার বা সেক্রেটারিও হননি। তিনিও হতেন না, যদি বঙ্গ থাকত অবিভক্ত।

আমাদের স্বামীস্ত্রীর ঘরসংসার নতুন করে পাতা হয় বাঁকুড়াতেই। সেদিক থেকে বহরমপুরের চেয়ে বাঁকুড়ার গুরুত্ব। শহরটি কতকটা রাঁচীর মতো অসমতল। মাটিও কতকটা ছোটনাগপুরের মতো। আগেকার দিনে কলকাতার লোক হাওয়াবদলের জন্যে যেমন মধুপুরে গিরিডি দেওঘরে যেত তেমনি যেত বাঁকুড়ায়। আমরা যখন যাই তখন বাঁকুড়া আর স্বাস্থ্যনিবাস নয়। তবু স্বাস্থ্যকর। অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমার প্রধান কাজ তখন রেভিনিউ আইনের পরীক্ষা পাশ করা। বিষয়টা গোলমেলে। প্রথম বারে আমি ও-বিষয়ে পরীক্ষাই দিইনি। পড়াশুনায় অবহেলা করে টেনিস ও বিলিয়ার্ডস খেলেছি। সকালবেলা বিলিয়ার্ডস খেলতে ক্লাবে হাজির হয়েছি। তা ছাড়া লিখেছি কবিতা আর গল্প আর প্রবন্ধ আর উপন্যাস। আরম্ভ করেছি 'যার যেথা দেশ'। আরম্ভ ও শেষ করেছি 'অসমাপিকা' ও 'আগুন নিয়ে খেলা'। বহরমপুরে ওই একটা বছরে আমি যত লিখেছি তত আর কোনো স্থানে নয়। তবে দুই স্থান একত্র করলে এক বছরে তত লেখা পরেও হয়েছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় জুডিসিয়াল ট্রেনিং-এর অবসরে। মহকুমা অফিসার হয়ে আমার যেটুকু বা অবকাশ ছিল, জেলা শাসক বা জেলা জজ হয়ে সেটুকুও থাকে না। লেখার উৎস ক্রমেই শুকিয়ে যায়।

বহরমপুরে থাকতে আমি একবার অচিন্ত্যকুমারকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাই ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বলেন, "তুমি বাংলাদেশ বেছে নিলে কেন? আমি হলে যুক্তপ্রদেশ বেছে নিতুম।" আমি উত্তর দিই, "আমি বাংলাসাহিত্যের লেখক। তাই বাংলাদেশই আমার প্রকৃত স্থান।" তিনি ভাবছিলেন সার্ভিসের দিক থেকে। আর আমি ভাবছিলুম সাহিত্যের দিক থেকে। সার্ভিসের দিক থেকে ভেবে দেখলে বাংলাদেশের চেয়ে যুক্তপ্রদেশ ঢের বেশী স্বাস্থ্যকর, ঢের কম ভয়ংকর। সেখানে সন্ত্রাসবাদ নেই বললেই চলে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাও বাধে না। জমিদারির মতো রায়তওয়ারি ব্যবস্থা তেমন জটিল নয়। শিক্ষিতজন মুষ্টিমেয় বলে সমালোচকও মুষ্টিমেয়। খবরের কাগজগুলো এমন চেঁচামেচি করে না। রাস্তাঘাটও এত ভালো আর এত বেশী যে মোটর চালিয়ে আরাম আছে। আণ্ডার সেক্রেটারি ওয়ালিস আমাকে প্রথম দিনই বলেছিলেন, "বেঙ্গলে এলেন কেন? রাস্তা কোথায় যে মোটর চালাবেন!" তিনি বদলি হয়ে বাংলার বাইরে চলে যান। চাকরির দিক থেকে বেঙ্গল ইংরেজদেরও পছন্দসই ছিল না। যুক্তপ্রদেশেই ছিল স্টেশনের সংখ্যা বেশী। গ্রীষ্মকালে মেমসাহেবরা সেখানে যান। বাচ্চারাও সেখানকার স্কুলে পড়ে।

তবে আমার জীবনটা তো চাকুরে হবার জন্যে হয়নি। চাকরি আমি নিয়ে-

ছিলুম ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশটা ঘুরে ফিরে দেখে পাঁচ বছর পরে চাকরি ছেড়ে দেব, জীবনদেবতার কাছে এই ছিল আমার অঙ্গীকার। তখন তো ভাবতেই পারিনি যে প্রথম বছরেই আমার বিয়ে হয়ে যাবে, পাঁচ বছরের মধ্যেই জন্মাবে প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান।

বাকী পরীক্ষায় পাশ করার পর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রাজশাহী জেলার নওগাঁয় বদলি হই। সেই আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা পাশ। বয়স ততদিনে সাতাশ বছর। মাসটা অগস্ট আর সালটা ১৯৩১। লবণ সত্যাগ্রহীরা ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছেন। গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। রাউন্ড টেবিল বৈঠকে যোগদানের তোড়জোড় চলছে। কিন্তু পরিস্থিতি তখনো অগ্নিগর্ভ। এতদিন আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না। এইবার আমার উপরে ন্যস্ত হলো মহকুমার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেজারির দায়িত্ব। জেলের দায়িত্ব। আমি যতবার জেলে গেছি ততবার আর কোন্ সাহিত্যিক গেছেন? জরাসন্ধ বাদ। (১৯৭৯)

॥ এক ॥

প্রথম বয়সেই আমাকে এমন কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার ফলে আমার বাকী জীবনটাই যায় বদলে। বি-এ পাশ করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আই-সি-এস পরীক্ষায় বসব ও সফল হলে বিলেত যাব। তার বছরখানেক বাদে সিদ্ধান্ত নিই যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুধু বাংলা ভাষাতেই করব। ইংরেজীতেও না। ওড়িয়াতেও না। তার পরের বছর সিদ্ধান্ত নিই যে আমি কোন্ প্রদেশে নিযুক্ত হতে চাই জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দেব তখনকার দিনের বাংলাদেশে। ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে নয়।

প্রথম সিদ্ধান্তের ফলে আমি হই আই-সি-এস অফিসার। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক। তৃতীয় সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশে নিযুক্ত সিভিলিয়ান। ইতিমধ্যে আমি আরো একটি সিদ্ধান্ত নিই। বছর পাঁচেক চাকরির পর আমি স্বেচ্ছায় বিদায় নেব ও অবশিষ্ট জীবন সাহিত্যসাধনায় আত্মোৎসর্গ করব। অবশিষ্ট জীবন বলতে আমার ধারণা ছিল আরো বছর পাঁচেক। আমার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। আমার আয়ু বোধ হয় তাঁরই অনুরূপ হবে। কারণ আমার শরীর তাঁরই মতো দুর্বল ও ক্ষীণ।

পঁচিশ বছর বয়সে যখন বিলেত থেকে ফিরি তখন আমার সামনে ছিল মাত্র দশ বছর আয়ুষ্কাল। তার প্রথম পাঁচ বছর কেটে যেত 'সত্যাসত্য' নামক এপিক উপন্যাস লিখতে। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হবার কথা। পরবর্তী পাঁচ বছরে আমি চাকরি থেকে মুক্ত হয়ে আরো বেশী ও আরো ভালো লিখতুম। প্রধানত কবিতা। তার পরে এ জগৎ থেকে বিদায় নিতুম অসময়ে শেলী বা কীটসের মতো। ব্রাউনিং বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘজীবী হতে আমার ইচ্ছা ছিল না। মরার চেয়ে ভয় করতুম জরাকে। যৌবনের সাথে সাথে জীবনও যাক, এই মর্মে আমার একটি কবিতা ছিল ওড়িয়া ভাষায়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত হয়েই আমি আরো দুটি সিদ্ধান্ত নিই। একটি তো ওই পাঁচ বছরের মধ্যে 'সত্যাসত্য' লিখে শেষ করার। অপরটি ওই পাঁচ বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশ ঘুরে দেখার। তার মানে বছরে দু'বার বদলি হওয়ার। এমন এক উদ্ভট সিদ্ধান্তের জন্যে পরে আমাকে পশতাতে হয়েছে। তখন তো জানতুম না যে বিলেত থেকে ফিরে আসার বছরখানেকের মধ্যেই আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের চার বছরের মধ্যেই হয় দুটি সন্তান। সপরিবারে বদলি যে কী জ্বালা তা ভুক্তভোগীমাত্রেরই জানা। একুশ বছরে আমাকে একুশ বার বদলি করা হয়। কোনোখানেই পুরো তিন বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়নি। শেষে আমার স্ত্রী বিদ্রোহ করেন। আমি চাকরিতে ইস্তফা দিই।

বার বার বলেছি, "মা, আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো।" তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারছি। বাংলাদেশ যে হঠাৎ এমন করে ভেঙে যাবে, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের স্থান হবে না, স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে ঢুকতে হবে, এসব তো আমার জানা ছিল না। দেশভাগের পর বলি, "মা, তোর অশেষ করুণা যে আমরাই তাদের শেষ দলটি যারা অবিভক্ত বাংলাদেশের সেবক।" বিধাতার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে অবিভক্ত বাংলার সব দিক দেখিয়েছেন। যদিও সব জেলা নয়। এ সুযোগ আমি চাকরিতে না থাকলে, ঘন ঘন বদলি না হলে পেতুম না। যেন বঙ্গদর্শনের জন্যেই চাকরি ও বদলি।

বাংলাদেশে নিযুক্ত হবার আগে আমি চিনতুম দুটি মাত্র স্থান। কলকাতা আর শান্তিনিকেতন। একটা রাত সিউড়িতে কাটানো ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের "সীতা" অভিনয় দেখা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নিযুক্তির পর এক এক করে অনেকগুলি জেলায় কাজ শিখি ও কাজ করি। মুর্শিদাবাদ। হুগলি। বাঁকুড়া। রাজশাহী। চট্টগ্রাম। ঢাকা। আবার বাঁকুড়া। নদীয়া। আবার রাজশাহী। আবার চট্টগ্রাম। ত্রিপুরা। মেদিনীপুর। আবার বাঁকুড়া। আবার নদীয়া। বীরভূম। ময়মনসিং। হাওড়া। এইখানে অবিভক্ত বাংলায় ছেদ। অতঃপর কলকাতা। আবার মুর্শিদাবাদ। আবার কলকাতা। এইখানে চাকরিতে ছেদ।

দেশ দেখা কেবল প্রকৃতিকে দেখা নয়, মানুষকেও দেখা। কার আকর্ষণ বেশী? প্রকৃতির না মানুষের? এর উত্তরে আমি বলব সমান সমান। কিন্তু আমার লেখায় প্রকৃতির বর্ণনা তেমন থাকে না। এর কারণ অত ঘোরাঘুরি করলে ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়। আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপে। নদীয়ার ছবি আঁকতে গিয়ে হয়তো রাজশাহীর ছবি আঁকব। রাজশাহীর ছবি আঁকতে গিয়ে হয়তো মুর্শিদাবাদের। মানুষ আঁকতে গেলেও যে সেকথা খাটে না তা নয়। তবে আমি যাদের কথা লিখি তারা ব্যক্তি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্থান অনুসারে বদলায় না। কথ্য ভাষা বদলাতে পারে। প্রথা বদলাতে পারে। কিন্তু বাঙালী মোটের উপর বাঙালী।

তা হলেও এটা মানতেই হবে যে বাংলাদেশের সত্তা দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। এটা ইংরেজের চক্রান্তে নয়। প্রকৃতির চক্রান্তে। পদ্মার এপার আর ওপার আবহমানকাল ভিতরে ভিতরে বিচ্ছিন্ন। তা না হলে দেশভাগ এমন আচমকা এত সহজে হতো না। তেমনি আর একটি দ্বৈত হিন্দু ও মুসলমান। কী করে এ রকম হলো যে পূর্ববঙ্গের প্রায় সব ক'টি জেলাই মুসলিম প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব ক'টি জেলাই হিন্দুপ্রধান? এটা কি ইতিহাসের চক্রান্তে?

যদি কেউ কেবল শহরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখত তা হলে তার মনে ধারণা জন্মাত যে বাংলাদেশ একটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ। কারণ প্রত্যেকটি শহরেই হিন্দুপ্রাধান্য। অথচ একটু কষ্ট করে গ্রামগুলোর মাটি মাড়ালেই সে ধারণা ধূলিসাৎ হতো। অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ গ্রামই ছিল মুসলিমপ্রধান। হিন্দুরা যতই শহরে এসে ভিড় করে ততই গ্রামঅঞ্চলে তাদের শূন্যতা পূরণ করে মুসলমান। জমির স্বত্ব হিন্দুর হলে কী হবে, ইতিমধ্যেই রব উঠেছে লাঙল যার জমি তার। বাংলাদেশে তা মুসলমানের, যেমন যুক্তপ্রদেশে হিন্দুর। স্বাধীনতার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছিল যে হিন্দুরা সব ক'টা শহরে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে আর মুসলমানদের হাতে চাষবাসের ভার ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে তাদের ঘাঁটি গাড়তে দিয়েছে। শহরের ঘাঁটি রক্ষা করতেন ইংরেজ সরকার। আর গ্রামের ঘাঁটি হিন্দু জমিদার। কিন্তু জমিদারের জমিদারি যাওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁরা নিজেরাই গ্রামছাড়া হন। ইংরেজদের কুইট ইণ্ডিয়া, হিন্দু জমিদারদের কুইট ভিলেজ, এর অনিবার্য পরিণতি পার্টিশনের পর পাকিস্তানের হিন্দুদের কুইট টাউন। পূর্ববঙ্গের শহরগুলো দেখতে দেখতে মুসলিমপ্রধান হয়ে যায়।

মুসলমানদের সমাজে ছিল দুটিমাত্র শ্রেণী। অভিজাত জমিদার আর অনভিজাত চাষী, জোলা ও জেলে। অশরাফ ও আতরাপ। মধ্যবিত্ত বলে যে মধ্যবর্তী শ্রেণীটি হিন্দুসমাজে ধনে জনে শিক্ষায় ও প্রভাবে মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল সেটি ইংরেজ আমলেরই বিবর্তন। যে কারণেই হোক তার সমান্তরাল বিবর্তন মুসলিম সমাজে ঘটেনি। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেমন উচ্চাভিলাষ ছিল ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে লাল কেল্লা, লাল দীঘি ইত্যাদি দখল, মুসলিম সমাজের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও তেমনি মনোবাঞ্ছা ছিল হিন্দুদের হটিয়ে দিয়ে তাদের চেয়ারগুলি অধিকার। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ও ভারত সরকার তথা বাংলা সরকারের চাকরিবাকরিতে কোটা সীসটেম আমার চোখের সমুখেই বাংলাদেশে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বাঙালী হিন্দুরা যদি এটা খুশি মনে মেনে নিত ও বন্ধুতার জন্যে ডান হাত বাড়িয়ে দিত তা হলে বাঙালী মুসলমানরাও হয়তো দেশভাগের কথা মুখে আনত না। ওরা দেশভাগের কথা মুখে না আনলে এরাও হয়তো প্রদেশভাগের কথা মুখে আনত না।

আমি যখন ১৯৪০ সালে কুমিল্লা ছাড়ি তখনো বাঙালী হিন্দু মুসলমানদের মনোমালিন্য চাকরি ভাগাভাগির স্তর থেকে রাজ্য ভাগাভাগির স্তরে পৌঁছয়নি। তার পর পাঁচ ছয় বছর পশ্চিমের জেলাগুলিতে কাটিয়ে ১৯৪৬ সালে যখন ময়মনসিং-এ যাই তখন দেখে অবাক হই যে পদ্মার জল অনেক দূর গড়িয়েছে। ইতিমধ্যে পাশ হয়ে গেছে লাহোরের মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব

ও তার অনুকূলে প্রচারকার্য দিকে দিকে বিস্তারলাভ করেছে। আমার চোখের সুমুখেই অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। মুসলিম লীগের জয়। ঝীণা সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। হিন্দুদের পালটা দাবী প্রদেশভাগ। ম্যাউন্টব্যাটেনের দ্বিতীয় কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড। দেশ ও প্রদেশ ভাগাভাগি। হিন্দু মুসলমান আহ্লাদে আটখানা যে দেশ হয়েছে দু'খানা। প্রদেশ হয়েছে দু'খানা।

ব্যস্! চুকে যায় আমার পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক। সম্পর্কটা কোনো-দিনই জন্মসূত্রে ছিল না। পুরুষানুক্রমিকও নয়। সম্পর্কটা কর্মসূত্রে। ভালোবাসার রেশমী সুতো, সেটিও আর একটি সূত্র। সেই সূত্রে আমি এখনো তার সঙ্গে বাঁধা। তার নাম এখন হয়েছে "গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ"। সংক্ষেপে বাংলাদেশ। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র এ নাম মেনে নিয়েছে। নেয়নি যারা তারাও নেবে। আমার এই রচনা সেকালের পূর্ববঙ্গে আমার জীবন ও যৌবনযাপনের স্মৃতিচারণ।

॥ দুই ॥

মাঝখানের কয়েক মাস বাদে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আমি পূর্ববঙ্গে বাস করেছি। আমার সাতাশ বছর বয়স থেকে ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হয়েছি। ওটাই ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে সৃষ্টিশীল কাল। তার সঙ্গে যোগ করতে পারি ময়মনসিং-এর দেড় বছর। যখন আমার বয়স বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। ততদিনে আমার সৃষ্টিতে ভাঁটা পড়েছে। অকপটে বলতে পারি আমার জীবনের ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কেটেছে পূর্ববঙ্গে।

আমার প্রথম মহকুমা রাজশাহী জেলার নওগাঁ। ওই নামের গ্রাম থেকেই মহকুমার নামকরণ। গ্রাম ক্রমে ক্রমে শহর হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনো সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি হয়নি। লোকে চাইছে, সরকার রাজী হচ্ছেন না। পাছে খরচ বেড়ে যায়। অথচ নওগাঁর যে পাড়াটি গাঁজা কাল্টিভেটার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তুলেছে সেটি একটি ছোটখাটো টাউনশিপ। সেখানে শহরের মতো বড়ো বড়ো ইমারত। মহকুমা অফিসারের বাংলো তার বাইরে পড়ে। আকারেও অকিঞ্চিৎকর। প্রকারেও আদিম। কিন্তু অবস্থানটি মনোহর। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী যমুনা। এ যমুনা ব্রহ্মপুত্র যমুনা নয়। এটি উত্তর থেকে এসে দক্ষিণে আত্রাই নদীর সঙ্গে মিশেছে।

নওগাঁ মহকুমার সৃষ্টির মূলে গাঁজার চাষ। এটা আগে তিনটি জেলায় ছড়ানো ছিল, পরে প্রশাসনের সুবিধার জন্যে একটিমাত্র জেলায় একটিমাত্র মহকুমায় নিবদ্ধ হয়। তারও তিনটিমাত্র থানায়। এমনভাবে গণ্ডী দেওয়া হয়

যাতে চোরা চালান না হয়। এককালে গাঁজার মণ নাকি ৪০০০ টাকা দামে বিক্রী হতো। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তার দাম বেঁধে দেওয়া হয় ২৪০০ টাকা মণ। তার থেকে ২১০০ টাকা সোসাইটি ও সরকার ভাগাভাগি করে নেন। সোসাইটির সভ্য হিসাবে চাষীরাও মুনাফার অংশ পায়। গাঁজার মতো লাভ আর কোনো ফসলেই ছিল না। তাই গাঁজা মহালের চাষীদের মতো সম্পন্ন চাষীও আর কোনো চাষী ছিল না। তাদের প্রায় সবাই মুসলমান।

দারিদ্র্যের সাগরে সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ। সোসাইটি তার লাভের একাংশ ব্যয় করত স্কুল, ডিসপেনসারি প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে। এসব তার এলাকার ভিতরে। তখনকার দিনে কোঅপারেটিভ মুভমেণ্টের মধ্যমণি ছিল নওগাঁর গাঁজা সোসাইটি। বিভাগীয় অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রারের সদর অবস্থিত ছিল নওগাঁয়। জেলার কলেকটর ছিলেন সোসাইটির চেয়ারম্যান। তিনি থাকতেন রাজশাহী জেলার সদরে। মাসে মাসে আসতে পারতেন না বলে মাসিক অধিবেশনগুলো হতো ভাইসচেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে। তার মানে আমার। প্রশাসনের ভার ছিল যাঁর উপরে তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান। তিনি একজন বাছাই করা সিনিয়র ডেপুটি কলেকটর। সোসাইটি তাঁর বেতন বহন করত। তাঁর অধীনে একজন ম্যানেজার। তিনিও বেতনভুক। ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রায়ই আমার সঙ্গে পরামর্শের জন্যে আসতেন ও বিপদে পড়লে আমার সাহায্য চাইতেন। বিবিধ প্রতিষ্ঠানে তো আমাকে থাকতে হতোই। এমনি করে গাঁজা মহালের কাজই ছিল আমার প্রধান কাজ। কিন্তু তার জন্যে নওগাঁ শহরে আটকে থাকতে আমার খুব যে ভালো লাগত তা নয়। আমার পা ছটফট করত সারা মহকুমা চষে বেড়াতে। যেখানে ইচ্ছা তাঁবু খাটাতে। কখনো হাতীর পিঠে চড়তে। কখনো হাউসবোটে চাপতে। কখনো বা পদব্রজে ভ্রমণ করতে। প্রাচীন কীর্তির ছড়াছড়ি চারিদিকে।

তবে গাঁজা মহালের প্রজাদের সঙ্গে মিশে আমার একটা শিক্ষা হয়েছিল। ওরা হাতে কলমে শিখেছিল কেমন করে গণতন্ত্র চালাতে হয়, সমাজতন্ত্রের জন্যে এগিয়ে থাকতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রামে গ্রামে সমবায় পদ্ধতিতে চাষবাস প্রবর্তন করতে যান। এর জন্যে ভিত পাতা হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে নওগাঁয়। এখন তার কী অবস্থা জানিনে। কারণ গাঁজা যারা কিনত তারা প্রধানত হিন্দু ও তাদের বাস প্রধানত আজকের দিনের ভারতে। বাংলাদেশ এখন তার গাঁজার বাজার হারিয়েছে। খান্ সাহেব মোহাম্মদ আফজল লিখেছেন বর্তমানে গাঁজা চাষ ১০০ বিঘা জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ। আগেকার সীমা ছিল ৯০০০ একর। তার থেকে ৩৫২টি গ্রাম লাভবান হতো। খোদ সরকারের রাজস্বই ছিল বার্ষিক ৬৬ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতিটাই বড়ো কথা নয়। গ্রামের চাষী গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের যে তালিমী পাচ্ছিল সেটা তো আর পাচ্ছে না।

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হলেও তাদের মধ্যে আমি যে বুদ্ধিসুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা লক্ষ করেছি তা অসামান্য। যে লীডারশিপ দেখেছি তা অসাধারণ। ডেপুটি চেয়ারম্যানকেও তারা নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত। আমাদের চাষীরা কেবল যে সোনা ফলাতে জানে তাই নয়। সুযোগ পেলে ও তালিমী পেলে তারা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রও চালাতে পারে। কিন্তু খোদাতালাকে ধন্যবাদ, আর গাঁজা নয়। একটা খারাপ জিনিসের জন্যে আমরা সবাই মিলে আমাদের সমবেত শক্তির অপচয় করেছি।

আমার বাংলোর লাগাও ছিল গাঁজার গুদাম। ঘ্রাণেন অর্ধ-ভোজনম্। গাঁজার মরসুমে নিখরচায় আমারও নেশা লাগত। যঃ পলায়তে স জীবতি। সপরিবারে বেরিয়ে পড়তুম সফরে। তখনকার দিনে সরকার আর সব খাতে ব্যয়সংকোচ করছিলেন, কিন্তু সফরের খাতে করলে প্রশাসন চলে না। কলেকটর ছিলেন একজন মধ্যবয়সী ইংরেজ। আমাকে তিনি বলেন, "আমি সরকারকে লিখেছি যে মহকুমা হাকিমদের সফরের জন্যে বরাদ্দ কমালে গ্রামঅঞ্চলের উপর তাঁদের ও আমাদের মুঠো শক্ত থাকবে না। এর বেলা ব্যয়সংকোচ চলে না। অবাধে ঘুরে বেড়ান। এক এক জায়গায় ক্যাম্প করে যতদিন খুশি থাকবেন ও লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবেন। মহকুমা হাকিমরাই তো সরকারের চোখ কান।" তিনি নিজে ঘোড়ায় চড়ে সফর করতেন। মোটরের উপযোগী সড়ক ছিল কম। হাতীর চেয়ে ঘোড়াই তাঁর পছন্দ। একবার আমাকে বলেন, "মোটরগম্য রাস্তা না থাকলে আমার কিছু আসে যায় না। আমার ঘোড়া আছে।" সেকালে ঘোড়া রাখলেও সরকার থেকে খরচা পাওয়া যেত। তবে ও কর্ম আমি করিনি। একবার দেখি তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে ঠ্যাং ভেঙে শুয়ে আছেন ও শুয়ে শুয়ে কাজ করছেন। তাঁর খুব ইচ্ছা তিনি পোলো খেলার জন্যে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেন ও আমাকেও তাঁর অতিথি হতে বলেন। অতিথি হয়েছিলুম আমি ঠিকই। কিন্তু থ্যাংক গড, পোলো খেলার জন্যে নয়। পোলো খেলাই হয়নি।

হাতী ছিল আমার প্রধান বাহন, যেমন হাউসবোট ছিল আমার প্রধান যান। পাই কোথায়? জমিদারদের কাছে। যেখানে মোটরযোগ্য রাস্তা নেই, পায়ে হাঁটাও যায় না, কারণ জল কাদায় কোমর পর্যন্ত ডুবে যায়, সেখানে হাতীর মতো সহায় আর কে আছে? সেই হাতীও একবার তলিয়ে যাচ্ছিল আমাকে নিয়ে। তবে হাতীতে চড়ে তো সপরিবারে যাওয়া যায় না। যেতে হয় পাল্‌কিতে চড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো। উনি কেমন করে যে পারলেন জানিনে, আমি তো হাত পা গুটিয়ে বসে হাঁপিয়ে উঠি। হাঁ, আমার ভাগ্যে লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথের পাল্‌কিতে চড়া, তাঁর হাউসবোটে চড়ে বেড়ানো। তবে পাল্‌কিটা পতিসরের নয়, শিলাইদার। দুই জায়গাতেই আমাকে যেতে হয়েছে, কখনো নওগাঁ থেকে,

কখনো কুষ্টিয়া থেকে। আক্ষরিক অর্থে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। পতিসরে নয়, শিলাইদায় কুঠিবাস করেছি। রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কালীগ্রামেও গেছি। এত করেও তাঁর প্রেরণায় শতাংশের একাংশও পাইনি। প্রশাসন আমাকে রাহুর মতো গ্রাস করেছিল। যুগটা ছিল সত্যাগ্রহের তথা সন্ত্রাসবাদের যুগ। আমাকেও পাল্লা দিয়ে জনসংযোগ করতে হচ্ছিল। লোকের ছিটেফোঁটা উপকার করে বোঝাতে হচ্ছিল সরকার মা বাপ। মা বাপ কি দুষ্টুমি করলে মারেন না? মাঝে মাঝে দণ্ডশক্তি ব্যবহার করতে হয়।

নওগাঁ মহকুমার প্রত্নসম্পদ অতুলনীয়। পাহাড়পুর না দেখলে পালযুগের গৌড়কে, বৌদ্ধদের গৌড়কে দেখা হয় না। এই বিরাট স্তূপ এখন নিঃসঙ্গ। নিশ্চয়ই এর আশেপাশে বৌদ্ধ বসতি ছিল। এখন মুসলিম বসতি। বৌদ্ধ থেকে মুসলমান? অসম্ভব নয়। একই যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব দীঘি দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমমুখে গেলে। হাজার বছর কি বারোশ' বছর তাদের পরমায়ু। এক একটা পাড় এক এক কিলোমিটার লম্বা। আরো পশ্চিমে গেলে পায়ে ঠেকে সেকালের তৈরী ছোট ছোট ইট। বাঁধানো সড়ক মাটির তলা থেকে উঁকি মারছে। যেখানে খুব চওড়া সেখানে বোধ হয় চাতাল ছিল। আরো পশ্চিমে গেলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর পাষাণ মূর্তি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এত মূর্তি যাদুঘরে ধরবে না। বেশীর ভাগই ভগ্ন। কেউ যে ইচ্ছে করে ভেঙেছে তা নয়। বরং সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করছে। কোন্‌টা যে কার মূর্তি সাধারণ তা জানে না। বৌদ্ধ মূর্তি হয়ে গেছে হিন্দু কিংবা সাঁওতাল বিগ্রহ। দেবকে হয়তো দেবী বলে অর্চনা করা হচ্ছে। কিংবা দেবীকে দেব বলে। চলতে চলতে আমরা প্রাচীন গৌড়ের কাছে এসে পড়ি। নিয়ামতপুর থানায় আমি সপরিবারে পায়ে হেঁটে বেড়াই। যুগ বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যও বদলে যায়। মুসলমানদের চমৎকার চমৎকার সব মসজিদ চোখে পড়ে। কুসুম্বার মসজিদ সবচেয়ে বিখ্যাত। কিন্তু মহাকাল কাউকেই রেহাই দেননি। ভগ্ন মূর্তি, ভগ্ন মসজিদ।

জমিদার শ্রেণীরও তেমনি ভগ্ন দশা। ঠাকুরবাবুরা কদাচিৎ আসেন। রবীন্দ্রনাথকে মাত্র একটিবার আসতে দেখেছি। আত্রাইঘাটে প্রজাপরিবৃত। শেষ বিদায় নিচ্ছেন। তখন আমি রাজশাহীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আমার কাছে জমিদার হিসাবে তাঁর একটি গোপনীয় আর্জি ছিল। নওগাঁ মহকুমায় অবস্থিত জমিদারদের মধ্যে ছিলেন দুবলহাটির জমিদার কিংকরীনাথ রায়চৌধুরী, বলিহারের জমিদার বিমলেন্দু রায়, কাশিমপুরের জমিদার অন্নদাপ্রসন্ন লাহিড়ী, মহাদেবপুরের জমিদার নারায়ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, ভবানীপুরের জমিদার প্রিয়শঙ্কর চৌধুরী। দু'এক ঘর মুসলিম জমিদারও ছিলেন। রাতোয়ালের আকবর আলী আকন্দ। নিয়ামতপুরের আবদুল আজিজ চৌধুরী। শেষোক্ত ভদ্রলোকের নামটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না। পদবীটি মনে আছে। এঁদের মধ্যে

মহাদেবপুরের নারায়ণবাবুর সঙ্গেই আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর খেতাব ছিল রায়বাহাদুর। রায়বাহাদুরকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলুম, "মহালে যাবেন। প্রজাদের সঙ্গে মিশবেন। ওদের জন্যে কিছু করবেন। নয়তো জমিদারি রাখা দায় হবে।" রায়বাহাদুর মহালে যেতেন কি না জানিনে, কিন্তু জনহিতকর কাজে অর্থব্যয় করে মুসলমানদের হৃদয় জয় করেছিলেন। পার্টিশনের পরেও তিনি মহাদেবপুর ত্যাগ করেন না, টাকাকড়ি সরিয়ে দেন না। তাঁর রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৫৬ সালে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিন হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেয়। কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মোগল আমলের ভদ্রাসনের মায়া কাটাতে হয়। দীন অবস্থায় তাঁকে বর্ধমানে আশ্রয় নিতে হয়। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু। তাঁর দানধ্যান ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার নওগাঁর লোক এখনও ভোলেনি। লিখেছেন 'নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস' প্রণেতা খান্ সাহেব মোহাম্মদ আফজল। "সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভোলে।"

দেওয়ালের লিখন আমি তখনি পড়তে পেরেছিলুম। যাঁদের দিন ঘনিয়ে এসেছিল তাঁরা কিন্তু পড়তে পারেননি। কিংবা পড়লে পড়তেন বিপরীত দিক থেকে। কলকাতায় সম্পত্তি কিনে নিরাপদ মনে করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান তাঁরা পড়তেন তির্যকভাবে। তাঁরা মুসলমান প্রজার ভয়ে মুসলিম লীগে ভিড়ে যেতেন। ফেজ টুপী ও আচকান পায়জামা ধরতেন। এসব কিন্তু আমি গোড়ায় দেখিনি। নওগাঁ থেকে বদলি হয়ে আবার চার বছর বাদে যখন কলেকটর হয়ে রাজশাহী ফিরে আসি তখন রাতোয়াল গিয়ে দেখি জমিদার বাড়ির সিংহদ্বারের সিংহ দুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। সিংহ নাকি পৌত্তলিকতার প্রতীক। নাটোর গিয়ে দেখি ব্যারিস্টার আশরাফ আলী চৌধুরী সাহেব আর ইউরোপীয় পোশাক পরেন না। তাঁর মৌলবী বেশ। মিস্টার চৌধুরী বলে সম্বোধন করতেই তিনি চুপি চুপি বলেন, "না না, আর চৌধুরী না। আমি এখন শুধু আশরাফ আলী।" এই বলে কার্ড বার করে দেখান। এই চার বছরের ভিতরেই মুসলিম মানসে একটা ভাববিপ্লব ঘটে যায়। হিন্দুয়ানীর কোনো ধারই তারা ধারবে না। সেটা যদি হয় বাঙালীয়ানা তা হলেও না। উচ্চপদস্থ নিম্নপদস্থ সব স্তরের মুসলমানকে আমি ধুতি পরতে দেখেছিলুম। নামও অনেকের হিন্দু নাম। কিন্তু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন মুসলিম আমলের পুনরারম্ভ।

জমিদার শ্রেণী বহু অপরাধে অপরাধী। কিন্তু সঙ্গীতের জন্যে সাহিত্যের জন্যে শিক্ষার জন্যে কাজ কি জমিদারদের দ্বারা কম হয়েছে? অমন একটি অবসরভোগী শ্রেণী না থাকলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পেতুম না। আমি যেটা চেয়েছিলুম সেটা ওঁদের অন্তঃপরিবর্তন। পূর্ণ বিলোপ নয়। ওঁদের জন্যে আমার হৃদয়ে একটি নরম কোণ ছিল। কিন্তু ইংরেজ অফিসারের কাছে

যিনি সাহস পেতেন না বাঙালী অফিসারের কাছে তাঁর অদম্য সাহস। একদিন গাঁজা সোসাইটি থেকে পায়ে হেঁটে বাংলোয় ফিরছি। পথরোধ করেন এক জমিদার। সেইখানেই সেই ক্ষণেই তাঁর বন্দুক পরীক্ষা করে লাইসেন্স রিনিউ করতে হবে। আমি রাগ করে বলি, "আমি এখানকার মহকুমা হাকিম। আপনার যেমন মান ইজ্জৎ আছে আমারও তেমনি প্রেসটিজ আছে। বন্দুক নিয়ে আপনি নিজে হাজির হতে না পারেন আপনার রিটেনারকে পাঠিয়ে দেবেন। আপিসে বসে গান লাইসেন্স ক্লার্ককে ডেকে খাতাপত্রে অর্ডার দেব।" তিনি সকলের সামনে অপমানিত বোধ করেন। তাঁর মাথায় আসে না যে আমিও সকলের সামনে অপমানিত বোধ করি। জমিদারদের রেওয়াজ ছিল হাকিমদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ করা ও আতিথেয়তার ছলে এসব কাজ হাসিল করে নেওয়া। তাঁর অতিথি হয়েছিলুম ও তাঁর মুখরক্ষাও করেছিলুম একবার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাপীড়নের অভিযোগ শোনার পর থেকে সতর্ক হয়েছিলুম। প্রজাদের কাছেও তো আমাকে সুনাম রক্ষা করতে হবে। তাঁর রাজবাড়িতে গেলে যদি আমার মান না যায় আমার কাছারিতে বা কুঠিতে এলে তাঁর মানহানি হবে কেন? তিনি নাকি আমার বাংলোয় এসে আমাকে পাননি। কিন্তু আগে থেকে খবর দিয়ে তো আসেননি। আমি কি একখানা চিঠিও প্রত্যাশা করতে পারিনে? অবশ্য তিনি যদি আমাকে পথের মাঝখানে আটক না করে আমার সঙ্গে সঙ্গে বাংলোয় যেতেন তাহলে আমি সেখানে বসে সেইদিনই তাঁর কাজটা করে দিতুম। জমিদারদের বেলা এসব বাংলোয় বসে হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরাও তাই করতেন। আর জমিদার যদি হতেন রাজা মহারাজা তাহলে রাজবাড়িতে অতিথি হয়ে অস্ত্রাগার পরীক্ষাচ্ছলে লাইসেন্স রিনিউ করতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আমিও তাই করেছি। সে পদে আমার এক পূর্ববর্তী তো নাটোরের এক জমিদারনন্দনকে কুঠিতে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর রিভলভার আটক করেছিলেন। তিনি নাকি জেলা বোর্ডের সদস্যদের রিভলভার দেখিয়ে তাঁকে ভোট দিতে বলেছিলেন। সাহেবের মুখে একথাও শুনেছিলুম যে জমিদারনন্দনকে তিনি নাটোর থেকে ছ'মাস কি এক বছরের জন্যে নির্বাসিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য আইন অনুসারে নয়। বাড়িতে সুন্দরী রানী থাকতে তিনি শহরের প্রত্যেকটি বেশ্যাকে জ্বালাতন করতেন। সেকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরাই ছিলেন জমিদারকুলের অভিভাবক। বিপদের দিনে সহায়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কী না করতে হতো! যেবার মিস্টার পিনেলের ঠ্যাং ভাঙা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই তিনি আমার দিকে একটা ফাইল বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "অদম্য সন্ত্রাসবাদী। একে এখন ছেড়ে দিয়ে আমরা এর বিয়ে দিচ্ছি। তাতে যদি স্বভাব শোধরায়।" জমিদারের স্বভাব শোধ-রানোর জন্যে যেমন নাটোর থেকে কলকাতায় নির্বাসন তেমনি সন্ত্রাসবাদীর

স্বভাব শোধরানোর জন্যে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে সরকারী উদ্যোগে বিবাহ দান। নরম আর গরম দ'রকম পলিসি ছিল ইংরেজদের। যেখানে যখন যেটা কাজে লাগসই সেখানে সেটা কাজে লাগাত। যাঁদের গলি করে মারা হয়েছিল সেসব ইংরেজদের কারো কারো সঙ্গে আমার ছিল সাক্ষাৎ পরিচয়, কারো কারো কথা আমি অন্যের মুখে শুনেছি। কেউ কেউ ছিলেন অতি সজ্জন। দক্ষিণ মুখও তাঁদের ছিল, শুধু রুদ্র রূপ নয়।

মিস্টার পিনেল আমার চিঠি পেয়ে আমার নওগাঁ বদলির সংবাদ শুনে আমাকে নওগাঁর আগেই রাজশাহীতে গিয়ে সপরিবারে তাঁর অতিথি হতে লিখেছিলেন। চার্জ নেবার পূর্বেই প্রশাসন নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হবে। আমি কী করে যাই! সঙ্গে ছিল স্ত্রীর গ্র্যান্ড পিয়ানো। শিয়ালদা থেকে সোজা সান্তাহার যাই আসাম মেলে। ঈশ্বরদি থেকে বেঁকে যাইনে। পরে যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় তিনি আমাকে বলেন, "মহকুমার দায়িত্ব আপনার। আমার নয়। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, দোষ হলেও আপনার, গুণ হলেও আপনার। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাজ করবেন না। তবে আমার পরামর্শ চাইলেই পাবেন।" আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার আশঙ্কা ছিল ইংরেজরা আমাকে দিয়ে তাদের ময়লা কাজ করিয়ে নেবে। সরকারী চাকরিতে থাকতে না চাওয়ার সেটাও একটা কারণ। কেবল সাহিত্য সাধনা নয়। প্রথম দিকেই তিনি আমাকে একটা চমক দেন। আমার আগে যিনি মহকুমা হাকিম ছিলেন তাঁর কাছে কিছু রিলিফের টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। সেটা তিনি ফেরৎ দেবার সময় পাননি। বেশী নয়, শ'দুয়েক টাকা। মনি অর্ডার করে পাঠালেই চলত। বোধ হয় এক টাকা লাগত। কিন্তু সে টাকাটা তিনি খরচ করতেন কোন্ খাত থেকে? রিলিফের টাকা থেকে? কন্‌টিনজেন্সী থেকে? জবাবদিহি এড়ানোর জন্যে তিনি আমাকে বলেন জেলা বোর্ডের মিটিং-এ যোগ দিতে সদরে গেলে টাকাটা যেন পকেটে করে নিয়ে যাই ও হাতে হাতে ফেরৎ দিই। আমি ভালো মনে করে টাকাটা যখন মিস্টার পিনেলকে দিতে যাই তিনি যেন তড়িৎস্পৃষ্ঠ হবার ভয়ে বলেন, "আই ডোণ্ট টাচ মানি। আমি টাকা ছুঁইনে। আপনি ও টাকা কাছারিতে গিয়ে নাজিরকে দিতে পারেন।"

তিনি যদি টাকা না ছোঁন আমিই বা কেন ছোঁব? আমি ও টাকা নওগাঁয় ফিরিয়ে নিয়ে যাই ও সেখান থেকে মনি অর্ডারে সদরে পাঠিয়ে দিই। অতি সহজ সমাধান। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে আগেই সেটা করতুম। কিন্তু এমনি করেই আমার আক্কেল হয়। কে কখন বলে বসবে সাহেব টাকা খান সেই ভয়ে তিনি তটস্থ থাকতেন। আমাকেও তটস্থ থাকতে শেখান। একবার তিনি একটি বিদ্যালয়ের ভিত পাতেন। সে সময় পাঁচ টাকা দামের একটা রূপোর কুরনি ব্যবহার করেন। সবাই বলে তিনি যেন সেটা স্মারক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি রাজী

হন না। বলেন, "এই পাঁচ টাকা দামের কুরনি গ্রহণের জন্যে আমাকে সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আমি সেটা চাইনে। আপনারাই এটা যত্ন করে রেখে দিন। আমার স্মারক।" এইভাবে আমাকে তিনি শিক্ষা দেন। কতবার কত লোকের ডালি ফিরিয়ে দিয়েছি, ভেট ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি যদি রিপোর্ট না করি আমার নামে রিপোর্ট যাবে। কেন কাউকে তার সুযোগ দিতে যাওয়া? কড়াহাতে শাসন করতে গেলে শত্রু তো এমনিতেই কত হয়। শত্রুর হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করি কী উপায়ে?

গান্ধীজী রাউন্ড টেবল কনফারেন্স থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আরম্ভ হয় গণ সত্যাগ্রহ। আমাদের এর উপর রিপোর্ট পাঠাতে হতো। একদিন দেখি গাঁজা সোসাইটিতে বসে টাইপরাইটারে পিনেল রিপোর্ট লিখছেন। লেখা সারা হলে কার্বন-পেপারটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলেন। নতুন কার্বন অমন করে কি ছিঁড়ে ফেলা উচিত? তিনি আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, "কার্বন যদি এখানে ফেলে যাই যে কোন লোক তার পাঠ উদ্ধার করতে পারবে। তা হলে আর গোপনতা রইল কোথায়? খবরদার কখনো কার্বন দেখতে দেবেন না।" গাঁজা সোসাইটিতে কেই বা কার্বন উল্টো করে পড়তে যাচ্ছিল! কিন্তু বলা তো যায় না। কেউ পড়ুক আর না পড়ুক আমার অভ্যাসটা যেন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো হয়। যার অভ্যাস শিথিল সে কখনো গুরুতর দায়িত্বের যোগ্য হতে পারে না।

আমাকে একবার তিনি ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন। আত্রাইঘাটে সঙ্কটত্রাণের একটি আশ্রম ছিল। এখনো আছে। পলিটিকাল কিছু নয়। স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার প্রতিষ্ঠাতা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। বন্যার সময় ওর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আচার্য মাঝে মাঝে এসে সেখানে থাকতেন। খাদির কাজ কিছু কিছু হতো। আমিও একজন খাদিপ্রেমী। আশ্রমিকদের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক। ওঁদের এখানে একটা ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে দেখে পুলিশ থেকে আপত্তি ওঠে। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন নতুন করে আরম্ভ হয়েছিল।

আশ্রমিকদের বা তাঁদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আইন অমান্য করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে বলেন, "স্যার প্রফুল্লচন্দ্রকে আপনি চেনেন। আপনি কি তাঁকে লিখতে পারেন না যে আশ্রম যদি আইন অমান্যের কেন্দ্র হয় তা হলে বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। অন্তত পতাকাটা তো সরানো উচিত।" আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে চিঠি লিখি ইংরেজীতে "ডিয়ার স্যার প্রফুল্লচন্দ্র" বলে সম্বোধন করে। তা পড়ে তিনি কোনো জবাব দেন না। আশ্রমের প্রবীণতম কর্মী ডাক্তার নীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত আমাকে চিঠি লিখে বকুনি দেন। ত্রিবর্ণ পতাকাটা ছিল জন বুলের চক্ষুঃশূল। ষাঁড়ের সামনে যেমন লাল ন্যাকড়া। একেবারে রেল লাইনের ধারে। একদিন আমি গিয়ে আশ্রমিকদের অনুরোধ করি যে তাঁরা যেন

ওটা নামিয়ে রাখেন। স্বাধীনতা দিবসে ওই ঝাণ্ডা তাঁরা নিজেদের হাতে তুলে-ছিলেন। ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা। ওঁরা বলেন ওঁদের হাত দিয়ে অমন কাজ হবে না। আমি যদি অপসারণ চাই তো অপসারণ করতে হবে আমাকেই। সেই অপ্রিয় কাজ করতে হলো আমাকে নয়, মহকুমা হাকিমকে। "ওটা আপনিই নিয়ে যান। বাজেয়াপ্ত করুন।" ওদের অভিপ্রায় অনুসারে আমিই নিই, কিন্তু বাজেয়াপ্ত করিনে। নিজের কাছেই রেখে দিই। সত্যিকার স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত আমার কাছেই ছিল। এদিন আমার ডাক পড়ে হাওড়া ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে। পরে জজকোর্টে আরো একবার পতাকা তুলতে। সেদিন আর এদিন!

আইন অমান্য আন্দোলনে আমার হাতে প্রথম সাজা পান আত্রাইঘাটের ডাক্তার যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী। সাজা না দিয়েও পারিনে। সাজার জন্যে আইন অমান্য করলে সাজাই পেতে হয়। অথচ যে ডাক্তার জনসেবক তাঁকে কয়েদ করলে জনগণকেই বঞ্চিত করা হয়। এই দোটানার থেকে পরিত্রাণ ছিল না। দিতেই হলো এক বছর কারাদণ্ড। আন্দোলনটা কী জানি কেন মিইয়ে যায়। তখন যশোদাবাবুর জন্যে দুঃখ হয়। এক বছর বাদে নওগাঁ থেকে আমি বদলি হই। আমাকে কেউ বিদায় দেয় না। বোধ হয় কারুর কোনো উপকার করিনি। তাই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে আত্রাইঘাট স্টেশনে অপেক্ষা করছেন কে? না যশোদাবাবু! তিনি এসে একজন পুরাতন বন্ধুর মতো করুণদৃষ্টিতে বিদায় দেন। একজন কেন, একমাত্র বন্ধু। অদ্ভুত নয় কি! যাঁর অপকার করেছি তিনিই আমার বদলিতে দুঃখিত। হয়তো সেটা তাঁর কাছে গৌরবের বিষয়। দেশের জন্যে কারাবরণ।

নওগাঁয় আইন অমান্য জমেনি। মুসলমানরা সাড়া দেয়নি। একেবারেই দেয়নি বললে ভুল হবে, কারণ একজন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণকে ও একজন মুসলমান সরদারকে আমি একসঙ্গে বসে চক্রান্ত করতে দেখে আটক করার হুকুম দিয়েছিলুম। ব্রাহ্মণটি খাটের উপরে, মুসলমানটি মেজের উপরে। দেখে আমার গা জ্বলে যায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিনেল মুসলমানটিকে আটকান না। বলেন, "মুসলমানদের সঙ্গে তো ইংরেজদের কোনো বিরোধ নেই। মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগ দিতে যায় কেন?" ওকে ফিরে আসতে দেখে আমি তো তাজ্জব! আমার মুখ রইল কোথায়! তবে হিন্দুটিকেও উনি সাতদিন পরে ছেড়ে দেন। বেশ ভালো করে আমার মনে রগড়িয়ে দেওয়া হয় যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য আমার কাছে কাম্য হতে পারে, ইংরেজের কাছে নয়। সেই বছরই ঘোষিত হয় র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড। মুসলমানদের আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যোগ না দেওয়ার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল। আত্রাইঘাটের নীরেনবাবুর সঙ্গে আবার যখন দেখা হয় তিনি আপসোস করে বলেন, "এতকাল ধরে ওদের এত সেবা করলুম, তবু ওরা আন্দোলনে তেমন

সাড়া দিল না !" অসহযোগের সময় থেকেই তিনি সর্বত্যাগী।

এত সেবা করেও হিন্দুরা মুসলমানদের হৃদয় জয় করতে পারে নি। করতে পারলে কংগ্রেস টিকিটে মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করতে পারত। যেমন দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। যুক্তপ্রদেশে। বিহারে। এর গোড়ায় কি ওই একটাই কারণ ছিল ? ইংরেজের কূটবুদ্ধি ? ডিভাইড অ্যান্ড রুল ? না, আরো একটা কারণ ছিল। যেখানে শতকরা নব্বই জন চাষী মুসলমান সেখানে শতকরা নব্বই ভাগ জমি হিন্দুর। জমি থেকেই রুশ চীনে বিপ্লব। জমি থেকেই বাংলায় হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ। যেটা আসলে জমিঘটিত সেটাই ধর্মঘটিত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এক পুরুষ আগেও এ রকম ছিল না। হাসাইগাড়ির আস্তান মোল্লার প্রজাবিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ সেকুলার। দুবলহাটির জমিদার অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করেছিলেন। পঞ্চাশ হাজার প্রজা একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা করেছিল। কিন্তু হিংসার পথ নেয়নি। সাত বছর ধরে নানাপ্রকার মামলা চলেছিল। কিন্তু ফৌজদারী মামলা নয়, দেওয়ানী। একথা শুনেছিলুম জমিদারের ম্যানেজার মহাশয়ের মুখে। আস্তানকে তিনি দেখতে পারতেন না, কিন্তু স্বীকার করতেন যে সে হিংসাচারী নয়।

আস্তান তখন আশি বছরের বুড়ো। কিন্তু কী তেজ ! কী নিঃস্বার্থপরতা ! পঞ্চাশ কেন ষাট হাজার প্রজা সে একজোট করেছিল। আমাকেই ধরেছিল তাদের নেতৃত্ব নিতে। লড়াইটা এবার যার বিরুদ্ধে তার নাম বাতরাজ। বাতরাজ ! কোনো জন্মে বাতরাজের নাম শুনিনি। ইঙ্গরাজ নয়, কঙ্গোরাজ নয়, জমিদাররাজ নয়, বাতরাজ !

দুবলহাটির বিল অঞ্চলের ষাটখানা গ্রামের সর্বনাশ করছে ওই বিদেশী শত্রু। জার্মানী থেকে যুদ্ধের সময় আগত কচুরিপানা। কোনো রকম অস্ত্রেই ওকে হটাতে পারা যাচ্ছে না। সরকারের কাছে আবেদন আর নিবেদন করে দিস্তা দিস্তা দরখাস্ত করা হয়েছে। এখন বাকী আছে দুটিমাত্র উপায়। একটি তো হাত দিয়ে কচুরিপানা তুলে পুড়িয়ে ফেলা। তার জন্যে ষাট হাজার প্রজার একশো কুড়ি হাজার হাত প্রস্তুত ! আর একটি হচ্ছে আরো অপরূপ। "হুজুর, সধবার দাঁড়া বাঁধাতে হবে।"

কাঁকড়ার দাঁড়ার কথা জানি। ধরতে গিয়ে কামড়ও খেয়েছি। ছেলেবেলায় কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দেওয়াও ছিল আমার এক কীর্তি। কিন্তু সধবার দাঁড়া ! কখনো তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। যাক, শুনে আশ্বস্ত হই যে সধবার দাঁড়া আসলে একটা খাল। চাষীরা তাদের জমি সেচ করার জন্যে আত্রাই নদী থেকে খাল কেটে জল এনেছে। সেই সঙ্গে কুমীরও ডেকে এনেছে। কুমীর এক্ষেত্রে বাতরাজ। ওই সর্বনাশী দাঁড়াই সর্বনেশে বাতরাজকে ষাটখানা গ্রামে ঢুকিয়েছে। জনকয়েক চাষীর তাতে লাভ, কিন্তু বেশীর ভাগ চাষীর ফসল

নষ্ট। কচুরিপানা ফসলের শত্রু। ফসল ঘরে আনতে পারলে তো মানুষ খেয়ে বাঁচবে ও খাজনা দেবে। "হুজুর, সধবার দাঁড়া বাঁধাতে হবে।"

সরকারকে লিখে ওরা সাড়া পায়নি। বেশ কয়েক বছর বৃথা গেছে। এবার ওরা বদ্ধপরিকর। দাঁড়া যেমন করে হোক বাঁধবেই কিন্তু কাজটা বেআইনী। খাল যেই কেটে থাকুক না কেন, ওটা বুজিয়ে দিলে জমির সেচ হবে না। যাদের ক্ষতি হবে তারা নালিশ করবে। আমি এই বেআইনী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিই কী করে? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলি। কলকাতার সেচ বিভাগের বড় কর্তাদের জানানো হয়। আমি হুঁশিয়ারি দিই। এই মুসলমান প্রজারা ইংরাজের বিরোধী নয়, বাতরাজের বিরোধী। কিন্তু হতাশ হলে শেষে ইংরাজের বিরোধীও হতে পারে। বৃকুৎসায় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মশাইরা খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। সে আন্দোলন আমার এলাকায় ছড়ায়নি। ছড়াবে, যদি দাঁড়া বাঁধানো না হয়। শেষে একটা রফা হয়। দাঁড়া যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানে একটা কপাটে পুল হবে। যাকে বলে স্লুইস গেট। জল মাঝে মাঝে ছেড়ে দেওয়া হবে। দু'পক্ষের প্রজা সন্তুষ্ট।

এর পরে আক্কান দেখিয়ে দেয় তার অসাধারণ নেতৃত্ব। ষাট হাজার পুরুষ কোদাল চালিয়ে মাটি কাটে চৌকা করে। বয়ে নিয়ে আসে ঝাঁকায় করে। ঢেলে দিয়ে যায় দাঁড়ার মুখে। মিলিটারি ডিসিপ্লিন। আক্কান দাঁড়িয়ে থেকে কমান্ড দেয়। আমাকে বলে, "দাঁড়া বাঁধানোর পর একদিন বাঁধের উপর দিয়ে হাতী চালিয়ে দেব। হুঁজুরকে হাতীর পিঠে চড়াব।" যথাকালে হাতী এল। হুজুরও চড়লেন। একটা কাজের মত কাজ হলো। নওগাঁ থেকে যখন বিদায় নিই তখন আমার মনে এই সান্ত্বনা যে আমার কার্যকালে একটি পুরোনো সমস্যার সমাধান হলো।

বিধাতা পুরুষ হাসলেন। আমাকে দেখতে দিলেন না সে হাসি। চার বছর বাদে আবার যখন আমি রাজশাহী জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে ফিরি তখন আক্কান মোল্লা বোধ হয় পরলোকে। আবার নালিশ। "হুজুর, সধবার দাঁড়া তো বাঁধিয়ে দিলেন। এখন ওই বদলোকেরা নদীর উজানে পাঁজরভাঙার কাছে আর একটা খাল কেটে জল নিয়ে যাচ্ছে।" তার মানে আর একটা দাঁড়া। আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি চমৎকার একটি স্লুইস গেট রয়েছে। সধবার দাঁড়ার মুখ বন্ধ। কিন্তু নতুন দাঁড়ার মুখ খোলা। নামটা আমার দেওয়া। আক্কান নেই। কে আবার ষাট হাজার ভলানটিয়ার যোগাড় করবে! দেখা যাবে শীতকালে, যদি ততদিন থাকি। তার আগেই আমাকে আবার বদলি করা হয়। জানিনে আখেরে কী হলো। কিন্তু একটা জিনিস শিখলুম। লোকে একজোট হয়ে শ্রমদান করলে অসাধ্য সাধন হয়। স্লুইস গেটটার খরচ মিস্টার পিনেল

দিয়েছিলেন, যতদূর মনে পড়ে। কিন্তু শ্রমটা তো গ্রামবাসীদের দেওয়া। অমনি করে শ্রমদান করে ওরা একদিন বাতরাজও উপড়ে ফেলেছিল। আমাকে শুধু যোগাতে হয়েছিল বিনামূল্যে চিঁড়ে আর গুড়। টাকাটা কোনখান থেকে জুটেছিল মনে পড়ে না। বোধ হয় চাঁদা থেকে। আইন অমান্য রোধ করার জন্যে আমাদের হাতে কিছু ডিস্ক্রেশনারি গ্রাণ্টেরও তহবিল ছিল বোধ হয়। ইসমাইল বলে সার্কল অফিসার ছিলেন। তিনিই বাতরাজ অভিযান পরিদর্শনের ভার নেন। চিঁড়ে গুড় বিতরণেরও। হয়তো চাঁদা সংগ্রহেরও। ভলানটারি লেবার দিয়ে কতদূর যাওয়া যায় আমরাই সেটা সকলের আগে দেখিয়ে দিই। যদিও নাম হয় সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা হাকিম নিয়াজ মোহাম্মদ খান্ আই. সি. এস-এর।

কিন্তু এটাও শিখলুম যে খণ্ড খণ্ড ভাবে এসব সমস্যার সমাধান হয় না। সেচের জন্যে খাল কাটতে হবেই। কচুরিপানা সে খাল দিয়ে ঢুকবেই। যারা জল চায় না তাদের জমিও বানের সময় বেনো জলে ভরে যাবে। তাদের ফসলও নষ্ট হবে। এর প্রতিকার কি সব কটা দাঁড়া বাঁধানো? সর্বত্র স্লুইস গেট? কার এত টাকা আছে? এত শ্রমদানই বা করবে কারা? আঞ্জান মোল্লার ষাট হাজার সৈনিকের সেনাপতিই বা হবে কে? পরে ল্যাণ্ড আর্মি গঠনের আইডিয়াটা আমার মাথায় আসে।

জমিদারদের কথা বলছি। রায়তদের কথাও বললুম। এখন বলি জোতদার শ্রেণীর কথা। এই শ্রেণীটির সঙ্গে আমার পরিচয় ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন উপলক্ষে। প্রতি মাসেই সফরে বেরিয়ে আমি অন্যান্য কাজের ফাঁকে ইউনিয়ন বোর্ড দেখতুম। সমগ্র মহকুমায় তখন ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ছিল ষাটের কাছাকাছি। কয়েকটা দেখতে পারি নি, কারণ যাতায়াত সময়সাপেক্ষ ও অবস্থান দুর্গম। ছিলুম তো মাত্র কুড়ি মাস। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন হিন্দু মুসলমানের যৌথ ভোটে। জেতার জন্যে হিন্দু প্রার্থীরা ছিলেন মুসলিম মুখাপেক্ষী আর মুসলিম প্রার্থীরা হিন্দু মুখাপেক্ষী। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ছিল না। সংখ্যানুপাতে যতগুলি আসন হিন্দুদের পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁরা পেয়েছিলেন ও তার জোরে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তা হলেও মুসলিম সদস্য ও প্রেসিডেণ্টদের সংখ্যাই বেশী। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ যে মুসলমান। তখনো সাবালকের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয় নি। যারা চৌকিদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়ন রেট দিত তারাই ভোটাধিকারী হতো। এতে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরই সুবিধা, কারণ হিন্দুরাই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। অথচ বিস্ময়ের বিষয়ই এই যে, দরবার উপলক্ষে যখন মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টরা সম্মিলিত হন তখন মুসলমানরাই বলেন তাঁরা সম্পত্তিমূলক ভোটাধিকারের পক্ষপাতী। কেবল ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে নয়, উচ্চতর

পর্যায়ের নির্বাচনেও : সেই মুহূর্তে তাঁরা মুসলমান নন, তাঁরা জোতদার। জোতদারের স্বার্থ রায়তকে তার সংখ্যানুপাতিক গুরুত্ব না দেওয়া। জমিদারদের প্রভাব অস্তাচলগামী। জোতদারদের প্রভাব উদয়ের পথে। জোতদার শ্রেণীতেও হিন্দুর সংখ্যা কম নয়, তবে মুসলমানদের সংখ্যাই বাড়তির মুখে। পূর্ববঙ্গের ভাবী শাসকদের আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলুম। যৌথ নির্বাচনের ভিতর দিয়ে গেলে এঁরা মুসলিম লীগকে জিতিয়ে দিতেন না। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন মুসলমানদের বেলা স্বতন্ত্র ভিত্তিতে হতো বলেই মুসলিম লীগ জিতে গেল। তাও ১৯৩৭ সালে নয়, ১৯৪৭ সালে। তখনো আমি তার আভাস পাই নি। এমন কি কৃষকপ্রজা পার্টি গঠনেরও না। বছর দুই বাদে কুষ্টিয়া মহকুমায় গিয়ে কৃষকপ্রজা পার্টির সঙ্গে পরিচিত হই। সে পার্টি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সব চেয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন এনায়েৎপুরের যোগেন্দ্রনাথ খান্। নামের সামনে তিনি একটি "পণ্ডিত" বসিয়ে দিতেন, সেটা তাঁর পাণ্ডিত্যসূচক নয়, ব্রাহ্মণ্যসূচক। অত্যন্ত উদারপ্রকৃতির হিন্দু। মুসলমানদেরও আস্থাভাজন। আত্মমর্যাদাবোধও প্রখর। সাহেব-সুবোরাও তাঁকে সমীহ করতেন। জনস্বার্থের জন্যে লড়তেন। যদিও এম. এ., বি. এল, অ্যাডভোকেট, তবু তিনি প্র্যাকটিস না করে জোতদারি করতেন। শিকারপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট দেওয়ান নাসিরউদ্দীন আহমদ ছিলেন পীরবংশীয় সম্ভ্রান্ত জোতদার। একদা কলকাতার "সুলতান" পত্রিকার সম্পাদক ও বহু বাংলা গ্রন্থের প্রণেতা। আত্রাই থানার পাট ব্যবসায়ী তথা জোতদার আহসানউল্লা মোল্লা প্রেসিডেন্ট না হলেও আহসানগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের সর্বেসর্বা। তাঁর ভাই মোসলেম আলী মোল্লা ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট। পরে আত্রাইঘাট রেলস্টেশনের নাম রাখা হয় আহসানগঞ্জ। মোল্লা বলে এঁরা ধর্মান্ধ ছিলেন তা নয়। যথেষ্ট উদার ও প্রগতিশীল। রেলী ব্রাদার্সের সঙ্গে ছিল এঁদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক। সাহেবসুবোদের সঙ্গে মিশতেন।

আমার সেকেণ্ড অফিসার ইব্রাহিম সাহেব যদিও সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তবু প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। তাঁর উপর আদালতের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আমি গাঁজা সোসাইটিতে কিংবা সফরে যেতুম। এটা কখনো সম্ভব হতো না, যদি তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাযুক্ত হতেন। যেমন প্রায় সর্বত্র দেখা যেত। সেইজন্যে তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ। আদালতের বাইরে তিনি ধুতি পাঞ্জাবি পরা বিশুদ্ধ বাঙালী। ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে। ডেপুটি চেয়ারম্যান খান বাহাদুর কলিমুদ্দীন আহমদ সাহেবও তাই। কোঅপারেটিভের অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রার রায় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ছিলেন দেশকর্মে সমর্পিতপ্রাণ অতি উদারপ্রকৃতির পুরুষ। তাঁর স্ত্রী আমাদের পরম উপকার করেছিলেন।

আমার চাপরাসী আসমৎ ফকির ছিল আমার ফিলজফার ও গাইড। বহু

হাকিম দেখেছে, বহু মানুষ চিনেছে, বহু জায়গা ঘুরেছে। একবার ওকে সঙ্গে করে আমি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ি। আদালতে বসে একটি মুসলমান তরুণীর করুণ কাহিনী শুনে আমি অভিভূত হই। বাংলোয় গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার অবকাশ ছিল না, গেলে ট্রেন ধরতে পারতুম না। ভেবেছিলুম সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই ফিরতে পারব। সঙ্গে জল পর্যন্ত নিইনি। টমটমে নওগাঁ থেকে সান্তাহার, ট্রেনে সান্তাহার থেকে আত্রাইঘাট, নৌকায় আত্রাই নদীর ভাটিতে একটি গ্রাম, সেখান থেকে পদব্রজে মাইল কয়েক দূরে সেই দুর্ধর্ষ শয়তানের বাড়ি। নারীহরণ করে সে লুকিয়ে রেখেছিল, নারী কোন্ ফাঁকে পালায়। দেখি পাখী উড়ে গেছে। কাউকে আমি জানতে দিইনি, এমন কি আসমৎকেও না, কেন আমি কার খোঁজে বেরিয়েছি। ব্যর্থ হলেন শার্লক হোমস। এখন তাঁকে একটা অজুহাত বানাতে হবে ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করতে বেরিয়েছেন বলে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠতেন, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের বাড়িতেই আপিস। ভদ্রলোক না খাইয়ে ছাড়বেন না। উজান স্রোতে নৌকা চারগুণ সময় নেয়। ট্রেন দিল ছেড়ে। সে রাত্রে আর কোনো ট্রেন ছিল না। রেলপথ ভিন্ন আর কোনো পথও ছিল না। ওদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে স্ত্রী অপেক্ষা করছেন। তখনকার দিনে টেলিফোনও ছিল না। মরিয়া হয়ে রেল লাইন দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিই। বর্ষাকাল। অন্ধকার রাত। লাইনের ধার সংকীর্ণ ও পিছল। অগত্যা স্লীপারের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলি। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো কালভার্ট। দুই স্লীপারের মাঝখানে শূন্যতা। সেখানে যদি পা ফেলি তো বিপদ। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ভাগ্যিস আসমতের হাতে ছিল একটা ছাতা।

কোনো মতে মাথা বাঁচিয়ে চলি। সমস্তক্ষণ ভয়, পেছন থেকে যদি ট্রেন এসে পড়ে। একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাই। ঘণ্টা চারেক হাঁটার পর সান্তাহার স্টেশন। সে সময় দার্জিলিং মেল এসে হাজির। দুই প্রান্ত থেকে দুটো। আমার পেশকার একটা টমটমে করে সান্তাহার থেকে নওগাঁ যাচ্ছিলেন। রাস্তায় আমাকে হেঁটে যেতে দেখে টমটম ছেড়ে দেন। বাড়ি যখন ফিরি তখন রাত দুটো। গোবিন্দবাবু যদি অত কিছু খাইয়ে না দিতেন তা হলে বোধ হয় ট্রেন ফেল করতুম না, কিন্তু খাইয়ে দিয়েছিলেন বলেই রক্ষা।

একদিন শান্তিনিকেতন থেকে আরনল্ড বাকে সাহেব গিয়ে লোকগীতির রেকর্ড করতে চান। ভাগ্যক্রমে মনসুরউদ্দীন সাহেব ছিলেন সেখানকার স্কুল সাবইনস্পেক্টার। লোকগীতি সংগ্রহ করা তাঁর বাতিক। তিনিই নিয়ে এলেন কোন্খান থেকে এক ফকিরনীকে। সে একটার পর একটা গান শোনায় আর সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যায়। যন্ত্র থেকে আবার বাজিয়ে শোনানো হয়। সেই ফকিরনীর মুখেই প্রথম শুনি—

"প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু লহ চিনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারাই প্রেমের শিরোমণি
এক মরণে দুজন মল রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।"

আমার সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটলেও বিরাম ছিল না। "যার যেথা দেশ" নওগাঁ থাকতেই শেষ করি। সেইখানেই আমার প্রথম সন্তান পুণ্যশ্লোক ভূমিষ্ঠ হয়। জনভোজ দিতে চেয়েছিলুম। হেড ক্লার্ক হেমবাবুর পরামর্শে যাত্রা দেখতে দিই। বহুদূর থেকে বহু লোকের সমাগম হয়। পুণ্যকে নিয়ে যখন সফরে যাই যারা দেখে তারা বলাবলি করে, এই সেই ছেলে যার জন্যে যাত্রা দেখতে গেলুম।

॥ তিন ॥

পূর্ববঙ্গে যতবার বদলি হয়েছি কোনবার খুশি হয়ে যাইনি, কিন্তু গিয়ে খুশি হয়েছি বার বার। বিধাতার মনে কী ছিল সে বয়সে বুঝতে পারি নি, এখন বুঝি আর ধন্যবাদ দিই। একালের সরকারী কর্মচারীরা আমার মতো বদলির দুঃখ পাবেন না, কিন্তু সুখও পাবেন না বাংলার মুখ দেখার। যে-মুখ পদ্মার ওপারে বিচিত্র সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। মানুষও কি কম বিচিত্র, কম সুন্দর! আমি তো মনে করি ওরা আরো অকপট, আরো অকৃত্রিম, আরো দিলখোলা, আরো তেজী। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা একটা দুর্লভ সুযোগ। সে সুযোগ একালের সরকারী কর্মচারীদের হবে না। এঁরা জানবেনও না এঁরা কী হারালেন।

নওগাঁয় আমি তো বেশ জমে গেছলুম, মহকুমার জন্যে কতরকম পরিকল্পনা ছিল আমার মাথায়। গাঁজা মহালের তিনটে হাইস্কুলের কোনোটাই ভালো চলছিল না। তিনটে হাইস্কুলের উপরের দিকের ক্লাসগুলোকে নিয়ে চতুর্থ একস্থানে কেন্দ্রীয় হাইস্কুল পত্তন করা ও নিচের দিকের ক্লাসগুলোকে যথাস্থানে রেখে তিনটে মাইনর স্কুলে পরিণত করা, এটা আমার আইডিয়া নয়, গাঁজা সোসাইটির চেয়ারম্যান অর্থাৎ রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিনেলের। তা হলে সোসাইটির অর্থসাহায্য কেন্দ্রীভূত হতো ও তার ফলে শিক্ষার মান উন্নত হতো। আমার উপর পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়ায় আমি তার সঙ্গে আমার নিজের আইডিয়া জুড়ে দিই। কৃষিকে করি উপরের দিকের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। আমার বিশ্বাস ছিল বিষয়টা ঐচ্ছিক হলেও আবশ্যিকের মতোই কাজ দেবে।

ছাত্ররা প্রায় সবাই চাষী গৃহস্থের পুত্র। চাষ কেমন করে আরো বৈজ্ঞানিক ও আরো লাভজনক হয় সেটা তাদের ঘরের দোরগোড়ায় তারা নিখরচায় শিখতে পারবে। চাকরির জন্যে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হবে না। গাঁজার মরসুম যখন থাকবে না তখন অন্য ফসল ফলিয়ে অর্থবান হবে।

চতুর্থ একস্থানে পাহাড়পুরে নতুন একটা হাইস্কুল গড়ে উঠল বটে, কিন্তু চাকলা, চক আতিথা ও কীর্তিপুর হাইস্কুলের মোড়ল প্রধানরা তাঁদের স্কুলের মর্যাদা খর্ব করতে অসম্মত হলেন। সোসাইটির অর্থসাহায্য বন্ধ হলে তাঁরা চাঁদা করে চালাবেন। পিনেল থাকতে এ মূর্তি তাঁদের ছিল না। তিনি বদলি হয়ে যান, এঁরাও অন্য মূর্তি ধারণ করেন। ওদিকে চাষের ক্লাসে একটিমাত্র ছাত্র। সেটি চাষী মুসলমানের নয়, কেরানী ব্রাহ্মণের বংশধর। আমার হেড ক্লার্ক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ওকে সরকারী চাকুরে করতে চেয়েছিলেন। কৃষি ফার্মের ডেমনেস্ট্রেটর। চাষীর ছেলেরাও চায় চাকুরে হতে, তাদের চাষে অরুচি। তাদের অভিভাবকরাও চান জাতে উঠতে। কে জানে যদি একটি ছেলে ডেপুটি কি দারোগা হয়! হাইস্কুলের উদ্দেশ্য কি চাষীকে চাষ শেখানো? না চাষীকে রাজভাষা শিখিয়ে রাজপুরুষ বানানো?

বদলির হুকুমটা আমার অপ্রত্যাশিত। কত রকম কাজে হাত দিয়েছি, কোনোটাই সমাপ্ত করে যেতে পারব না। তবে গাঁজা মহালে আমার প্রেস্টিজ দিন দিন কমে আসছিল। বদলি না হলে আমার মুখরক্ষা হতো না। তখনকার মতো আমি ব্যর্থই হলুম। মনের দুঃখে বিদায় নিলুম। গাঁজা মহালের হাই স্কুলের কথা যখন আমার স্মরণ থেকে মুছে গেছে তখন—তিন বছর বাদে—নদীয়া জেলায় বাংলার গভর্নরের এক্জিকিউটিভ কাউনসিলার স্যার নাজিমউদ্দীন আমাকে ভ্রমণকালে সহযাত্রী পেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেন যে আমার সেই পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন। তারপরে কেটে যায় আরো ঊনচল্লিশ বছর। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাসচিব ভারতীয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভোজনকালে আমাকে জানান যে আমার সেই পরিকল্পনার কাগজপত্র তিনি পড়েছেন ও বাংলাদেশ স্থির করেছে সব হাইস্কুলেই কৃষিবিদ্যা শেখাবে। না, কিছুই ব্যর্থ যায় না। কিন্তু তার সময় অসময় আছে।

আমাকে প্রথমে বদলি করা হয় বসিরহাটে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদেই। কলকাতার কাছাকাছি, সাহিত্যের দিক থেকে সুবিধের। কিন্তু পরে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আমার বছরের চারজন আই. সি. এস. অফিসারকে জুডিসিয়াল ট্রেনিং দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলার সদরে। আমাকে যেতে হবে চট্টগ্রামে। কোথায় কলকাতার নিকটবর্তী বসিরহাট আর কোথায় বঙ্গোপসাগরের অপর প্রান্তে চট্টগ্রাম! আর ওই যে জুডিসিয়াল ট্রেনিং তার মানে তো এই যে আমাকে শাসনবিভাগ থেকে সরানো হবে। এতদিন ধরে প্রাণ ঢেলে কাজ করে আমার এই পরিণাম? মাসকয়েক

করতে হবে মুনসেফি। তারপরে হব সাবজজ ও তারো পরে উপরন্তু অ্যাসিস্টান্ট সেসনস জজ। তখন তো আমি সরকারকে ও বিধাতাকে দোষই দিয়েছিলুম। পরে ভেবে দেখেছি সেই বছরখানেক বসিরহাটে কাটিয়ে আমার যা লাভ হতো তার চেয়ে অনেক বেশী হয় চট্টগ্রামে ও ঢাকায়। মহকুমা শহরেও আজকাল বিদ্বানদের সঙ্গ পাওয়া যায়। তখনকার দিনে কিন্তু সেটা ছিল দুর্লভ। মানুষ তো কেবল কাজ নিয়ে বাঁচে না। সে চায় তারই মতো মানুষের সঙ্গ।

চট্টগ্রাম যেতে হলে গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর স্টীমারে পদ্মা পার হতে হয়। রাইন ও ডানিয়ুবের স্টীমারযাত্রাও কি ওর মতো উপভোগ্য ? সে এক আনন্দময় জলযানযাত্রা। সঙ্গে ন'মাসের শিশুপুত্র। আমার স্ত্রী ও আমি দু'ধারের দৃশ্য তন্ময় হয়ে দেখি। উত্তর থেকে যমুনা এসে যোগ দিয়েছে, তাই পদ্মা আর রাজশাহীর পদ্মা নয়। দিগন্ত থেকে দিগন্তে তার বিস্তার। স্টীমার একবার এপারের ঘাটে ভেড়ে, একবার ওপারের ঘাটে। জনতা, কোলাহল, ওঠানামা, তারই মাঝখানে খাবার বেচাকেনার হৈ-চৈ। পদ্মা কেমন করে পাড় ভেঙে দেয় সেটাও লক্ষ করি। কিন্তু এক পাড় ভাঙে তো আরেক পাড় গড়ে। একটা চর ডোবে তো আরেকটা চর জাগে। পদ্মার ভাঙন ও সৃজন দুই হাতের খেলা। যে দেখে সে একটা দিকই দেখে, সাধারণত ভাঙার দিকটাই। তাই বিহ্বল হয়। পদ্মার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমার জীবনদর্শনের উপর তার প্রভাব পড়ে। ধ্বংসই একমাত্র সত্য নয়। অন্যদিকে চোখ ফেরালেই দেখি সৃষ্টি। কিন্তু চোখ ফেরাব কী করে! একই সময়ে যে একটার বেশী দেখতে পাইনে।

সন্ধ্যার পর চাঁদপুর। ট্রেন দাঁড়িয়েছে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। বিস্তীর্ণ প্ল্যাটফর্ম। ছাড়ে রাত করে। পেঁছে দেয় সকালে। আমাদের জন্যে সরকারী কোয়ার্টার্স ছিল না। উঠতে হলো সারকিট হাউসে। প্রাসাদোপম দ্বিতল সৌধ। মনোরম আবেষ্টন। সমতলের চেয়ে উচ্চতর। সেখানে তখন গোরা মিলিটারি অফিসারদের মেস। দু'খানা ঘর ছেড়ে দিয়ে সমস্তটা তাঁরাই অধিকার করেছেন। সেই দু'খানায় সিভিল অফিসারদের আনাগোনা। আমার তো ধারণা ছিল দিন সাতেকের মধ্যে সরকার থেকে আমাকে আলাদা একটা বাসা বরাদ্দ করা হবে। ধারণাটা ভুল। সরকারের হাতে একটাও বাসা খালি ছিল না, আমাকে বলে দেওয়া হলো নিজের চেষ্টায় বাসা খুঁজে নিতে। কাকেই বা আমি চিনি! কেই বা চেনে আমাকে! কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর হাল ছেড়ে দিই। যদিও সারকিট হাউসে বেশীদিন থাকতে দেয় না তবু সপরিবারে তাড়িয়ে দিতেও পারে না। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দিবারাত্র মিলিটারি বেষ্টিত হয়ে আমাদের মাসতিনেক কাটাতে হয়। অত লোকের মাঝখানে আমার স্ত্রীই একমাত্র নারী। চারিদিকে উদ্যত রাইফেল ও বেয়োনেট হাতে গুর্খা পাহারা। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরতে গা ছমছম করে। পরিবারকে তো প্রায় পর্দানশীনের মতো থাকতে হয়। তবে

কোনোদিন কেউ অভদ্র ব্যবহার করেননি। আমাদের তল্লাট মাড়াননি। গর্খারাও কঠোর শৃঙ্খলাধীন। ক্রমে আমাদের সঙ্গে চেনাপরিচয় হয়ে যায়।

সালটা ১৯৩৩। সন্ত্রাসবাদী অধ্যায় তখনো শেষ হয়নি। মিলিটারি অফিসাররা রোজ রওনা হয়ে যান। রাত করে ফেরেন। কোথায় যান, কী করেন, তা এতদিনে ইতিহাস হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদীদের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে সন্ধান করা হচ্ছিল। শহরের হিন্দু ভদ্রলোকদেরও চলাফেরা করার সময় পকেটে রাখতে হতো পারমিট। আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম যে পারমিট আমি চাইব না, নেব না, দেখাব না। কী করবে! বদলি? তাই তো আমি চাই। আমি কি ইচ্ছে করে চট্টগ্রামে এসেছি, না এখানে আমার কোনো কাজ আছে? ট্রেনিং তো অন্যত্রও হয়। যাক, আমাকে কেউ ঘাঁটায়নি। যতদূর মনে পড়ে দুই দিক থেকে চিঠি যায় চীফ সেক্রেটারির কাছে। আমার দিক থেকে আমার অবস্থা সম্বন্ধে। আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দিক থেকে সারকিট হাউসের অবস্থা সম্বন্ধে। বদলির হুকুম আসে। এবার ঢাকায়।

মাসতিনেকের সেই চট্টগ্রাম বাস একদিক থেকে একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আরেক দিক থেকে একটা হাওয়া বদল। চট্টগ্রামের মতো সুন্দর নিসর্গ কি বাংলার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়? পাহাড় আর নদী আর সমুদ্র কি আর কোথাও মেলবন্ধন করেছে? সারকিট হাউস থেকে আমি পায়ে হেঁটে আদালতে যাই। যে পথ দিয়ে যাই সে পথ গেছে রেলওয়ে অফিসারদের উপনিবেশ দিয়ে। বিদেশী গাছপালার ও ফুলের কী বাহার! মনে হয় ইউরোপের কোনো অঞ্চল। আদালতের অবস্থান উঁচু এক টিলার উপরে। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে তাকালে অনেক দূর অবধি দৃষ্টি যায়। আদালতে কাজ আমার বিশেষ কিছু ছিল না। হাজিরা দিয়ে গল্পগুজব করে সারকিট হাউসে ফিরে আসি। বই লিখি। সরকারী উকিল মিস্টার ঘোষালকে আমার মনে আছে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের লোক, বোধ হয় কলকাতার। তাঁর কাছেই আমার দেওয়ানি মামলার হাতেখড়ি। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নৃসিংহরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ফাঁক পেলেই হাজির হতুম তাঁর খাস কামরায়। ঘরোয়া নিমন্ত্রণ করেছিলেন দু'একজন সহকর্মী। কুঞ্জবাবু সাবজজকে মনে আছে। আমাদের তো উপায় ছিল না যে প্রতিনিমন্ত্রণ করি। আমরা যে নিজ বাসভূমে পরবাসী। ও'রাও আতঙ্কিত। একদিন প্রিন্সিপাল অপূর্বকুমার চন্দ এসেছিলেন সারকিট হাউসে আলাপ করতে। ভারী মজলিশী মানুষ। আমরাও যাই তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে। বোধ হয় তাঁর ওখানেই পরিচয় বৌদ্ধগুরু অগ্গমহাপণ্ডিত ধর্মপালের সঙ্গে। অসাধারণ ধার্মিক। একদিন তাঁর বৌদ্ধমন্দির দর্শন করি। অগ্গ কথাটা সংস্কৃত ভাষায় অগ্র। লোকে সেটা জানে না, তাই উচ্চারণ করে অজ্ঞ। অগ্গ মহাপণ্ডিত কিন্তু সর্বজনপ্রিয়! হাঁ, এরা বাঙালী বৌদ্ধ। পালযুগের ধারাবাহক।

চট্টগ্রামই এঁদের শেষ আশ্রয়।

চট্টগ্রামের অফিসার মহল থাকেন এক একটা টিলার উপরে ছোট বড়ো বাংলোয়। তাঁদের সকলের ওখানে কল করে বেড়াতে হলে নিজের একখানা গাড়ি চাই। আমার তা ছিল না। পায়ে হেঁটে যে ক'জনের বাংলোয় যেতে পেরেছি গেছি। একমাত্র কমিশনার সাহেব মিঃ ড্যাশকেই মনে পড়ে পাল্টা কল দিতে ও ডিনারে নিমন্ত্রণ করতে। আমি একটু লিখিটিখি শুনে ড্যাশ বলেন, "আজকাল ক'খানা বই বেরোয় যা একবারের বেশী পড়া যায়?" কথাটা আমাকে উদ্দেশ করে বলা নয়, ইংরেজ লেখকদের উদ্দেশ্যেই বলা। তবু ভাবিয়ে দেয় আমাকে। আমিও কি তেমনি একজন লেখক যার লেখা একবার মাত্র পড়ে সরিয়ে রাখা হবে বা ফেলে দেওয়া হবে?

সারকিট হাউসের জমিতে ছিল সেগুনবীথি। সেখানে গিয়ে গাছের ছায়ায় আমার কবিতার জার্নাল লিখি। কিংবা লিখি উপন্যাস। কেউ বিরক্ত করে না। মহকুমা হাকিমের জীবন ছিল নিত্য ব্যাঘাতের। শেষের দিকে এমন হয়েছিল যে নদীতে স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে গেলেও সঙ্গে যেত রিভলভারধারী গার্ড। তার কর্তব্য আমাকে পাহারা দেওয়া। বিলেতে আমি নগ্ন স্নান করেছি। পুরুষদের সঙ্গে পুরুষের মতো। তা বলে দেশেও কি ওটা চলে? কিন্তু একবার একটা মওকা জুটে যায়। নওগাঁ মহকুমায় এক ডাকবাংলোর অদূরেই নদী। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ি গায়ে ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে। গোপীদের অনুকরণ করব। বেশীক্ষণের জন্যে নয়, মিনিট পাঁচেকের মতো। তা আমার গার্ড কি আমাকে সেটুকু সময়ের জন্যেও চোখের আড়াল করবে? ফাঁকা মাঠ, সন্ত্রাসবাদীর নামগন্ধ নেই। কে একটি বুড়ো পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছিল। জল এতই কম। লোকটি যেই অদৃশ্য হয় আমিও যমুনার জলে ঝাঁপ দিই। তখন যদি কেউ আমার বস্ত্রহরণ করত তা হলে গার্ড তাকে আস্ত রাখত না। কিন্তু গার্ডের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আমাকে রক্ষা করত কে? তাই তো তাকে কী একটা অছিলায় একটু দূরে হটাতে হলো। কাজটা বেআইনী। কারণ সেই ফাঁকে হঠাৎ কেউ এসে গুলী করতেও পারত। ক্ষণকালের জন্যে হলেও আমি দিগম্বর জৈন প্রথায় স্নানও করি, সাঁতারও কাটি। গার্ড যখন হাজির হয় আমি ততক্ষণে শ্বেতাম্বর জৈন। সে ছিল ভোজপুরী ব্রাহ্মণ। আমি যাই করব সেও তাই করবে। আমি হাতীতে চড়লে সেও হাতীতে চড়বে। আমি টমটমে চড়ব, সেও চড়বে টমটমে। এমন অবস্থায় আমার প্রাইভেট লাইফ বলে কিছু থাকলে তো আমি লিখব। চট্টগ্রামে গিয়ে আমি আমার রক্ষীদ্বয়ের হেফাজত থেকে রক্ষা পাই। দ্বিতীয় রক্ষীটিও ছিল ভোজপুরী। জাতে রাজপুত।

॥ চার ॥

'যার যেথা দেশ' সারা হয়েছিল নওগাঁয় থাকতে। 'অজ্ঞাতবাস' শেষ হয় চট্টগ্রামে ও ঢাকায়। 'পুতুল নিয়ে খেলা'র আদি অন্ত ওই দুই শহরে। 'প্রকৃতির পরিহাস'-এর কয়েকটি গল্পও এই সময়ের। সৃষ্টির পক্ষে আমার জুডিসিয়াল ট্রেনিং হয়েছিল একান্ত অনুকূল। যখন আমি ছিলুম সরকারের উপেক্ষিত। কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? কলকাতার বাইরে সেরা স্টেশন বলতে বোঝাত দার্জিলিং, ঢাকা আর চট্টগ্রাম। দার্জিলিং-এ বারো মাস বাস করা শক্ত। তা ছাড়া জুডিসিয়াল ট্রেনিং-এর সময় ফ্রী কোয়ার্টার্স মেলে না। সারকিট হাউসের দুখানা ঘর আটক করে রাখার জন্যে আমাকে যে অর্থদণ্ড দিতে হতো সেটা আমি সরকারকে লিখে আয়ত্তের মধ্যে আনি। আর ঢাকায় তো আমি পেয়ে যাই অতিরিক্ত জেলাজজের কোয়ার্টার্স। বিরাট দ্বিতল গৃহ। শ্বেতাঙ্গ এনজীনিয়ার শাসিয়েছিলেন পুরো ভাড়া চার্জ করবেন। করলে আমি ডুবে যেতুম। আমার পক্ষে ছিলেন জেলাজজ অমরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁরই কথায় আমি সেখানে উঠি। কার কাছ থেকে তিনি অনুমতি আদায় করেছিলেন, জানিনে। আমাকে সেইভাবে আশ্রয় মিলিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো সারকিট হাউসে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জায়গাই দিতেন না। বেদুইনের মতো আমাকে আবার বদলি হতে হতো। তবে অতিরিক্ত জেলা জজের কুঠি আমার বেশীদিন ভোগ করা হোল না। তিনি বিলেত থেকে ফেরেন। আর আমি আবার 'হা বাসা, হা বাসা' করে শহর চষে বেড়াই। শেষে এক দুর্দিনের বন্ধু আমাকে সপরিবারে অতিথি হতে আমন্ত্রণ করেন ও পুরানা পল্টনে একটি বাসা যোগাড় করে দেন। বাসাটি ছোট হলেও খাসা। শৈলেশ ঘোষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অতিরিক্ত জেলাজজের কুঠিতে বাস করি বলে অনেকের ধারণা দাঁড়িয়ে যায় যে আমিও উক্ত পদের অধিকারী। লোকচক্ষে মর্যাদা কিছু বেড়ে যায়। এমন সব অভ্যাগত আসতে আরম্ভ করেন যাঁদের আমি না পারি উচ্চাসনে বসাতে, না পারি খানা দিতে। বাড়িটা ফার্নিচারবর্জিত। আর আমার যা আসবাব তা হোল স্বদেশী। ঢাকা ক্লাবে আমাকে বা কোনো ভারতীয়কে নেবে না শুনে আমি রাস্তায় ঘাটে ধুতি, পাঞ্জাবি পরে হাঁটি আর বাড়িতে জলচৌকি পেতে বসি ও বসাই। আমার সাহেবিয়ানা সেই যে গলাধাক্কা খায় তার পর থেকে স্বদেশীয়ানাই হয় আমার জবাব। এ ব্যাপারে আমার গৃহিণীরই কৃতিত্ব বেশী। তিনি তো ছেলের সঙ্গে বাংলা ভিন্ন ইংরেজীতে কথা বলেন না। সেনদের ঠিক বিপরীত। আমরা দেশী ধরনের রান্নাই খেতুম। রাঁধত যে সে বোধ হয় একটি

নমঃশূদ্র। বামুন আবার আমাদের বাড়ি রাঁধতে রাজী হবে না। আমরা দুই সমাজের বাইরে। তা সত্ত্বেও আমাদের জন্যে অনেকগুলি দুয়ার খোলা। বিশেষ করে সেনদের। মিস্টার ও মিসেস সেন যে আমাদের কত রকমে সাহায্য করেন তা বলে শেষ করা যায় না। আদালতের কাজ সেন আমাকে যত্ন করে শেখান। চট্টগ্রামের জেলাজজ তো ভুলেও খোঁজ নেননি। এ. ডি. সি. উইলিয়ামসকে সাহেবরা বলত 'বীয়ারি বিল'। বীয়ার খেয়ে ফুর্তি করতেন, জজিয়তিটা ওঁর কাছে তেমন সীরিয়াস নয়। ছিলেন বহুদিন ভারত সরকারে। সেখানেই ফিরে যাবার ইচ্ছা। চট্টগ্রাম ওঁর কাছে নিছক কালহরণ। বেশ একটা আভিজাত্য ছিল তাঁর ও তাঁর জায়ার। যার দরুন স্থানীয় ইউরোপীয় সমাজকেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না। তেমনি অমরেন্দ্রনাথ সেন (এ. এন. সেন বা বেবী সেন) ছিলেন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্ম ও বিলেতফেরত। তাঁর পত্নী তো লর্ড সিনহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এন. পি. সিনহার কন্যা। ইঙ্গবঙ্গ হলেও এঁরা সাহেব মেমদের কেয়ার করতেন না। সেন বেপরোয়াভাবে এমন সব রায় লিখতেন যে কমিশনার গ্রেহাম পর্যন্ত জব্দ। সাহেবিয়ানায় এঁরা যে-কোনো সাহেবকে হার মানাতে পারেন। তবু ঢাকা ক্লাবের দুয়ার রুদ্ধ। সেনেরা এতে দারুণ ক্ষুব্ধ। অথচ গ্রেহামই বা এর কী প্রতিকার করতে পারেন! ক্লাবটা যাদের দৌলতে চলে তারা ইউরোপীয় বণিকশ্রেণীর লোক। তারা কিছুতেই কালা আদমীকে সদস্য করবে না। হোক না কেন সে লর্ড সিনহার ঘরানা।

ওদিকে একই অবস্থা স্যার কে. জি. গুপ্তের পুত্র প্রিন্সিপাল বি. সি. গুপ্তের ও তাঁর মার্কিন পত্নীর। তিনিও বড় ঘরের। আমরা এঁদের দুঃখে দুঃখী। কিন্তু দুটি কি তিনটি পরিবারের উপর অবিচার হয়েছে বলে তো নতুন একটা ক্লাব স্থাপন করা যায় না। তেমন প্রস্তাবে আমরা ধরাছোঁওয়া দিইনে। ঢাকার বর্ধিষ্ণু নাগরিকরা সেন সাহেবকে উৎসাহ দেন, কিন্তু ক্লাবের উপযোগী ভবন কোথায়? দেখান যেটাকে সেটা বাগানবাড়ি গোছের। তাও বহুদূরে। উৎসাহ আস্তে আস্তে হিম হয়ে যায়। ক্লাব জিনিসটা এতই ব্যয়সাপেক্ষ যে পরিচালকরা ধনিক বা বণিক না হলে আর তার সঙ্গে পানশালা ও ঘোড়দৌড় না থাকলে ওর খরচ ওঠে না।

সেন তাঁর বিচারকার্যে ধুরন্ধর। আমাকে একদিন বলেন, "আমার জাজমেণ্ট হচ্ছে আমার ওয়ার্ক অফ আর্ট। আপনার যেমন উপন্যাস।" সত্যি তাই। পড়তে পড়তে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। ওদিকে আবার বয়স্কাউটের কর্তা। একজন দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আমার আই. সি. এস. বন্ধু আর্থার হিউজ আমাকে বলেন, "সেনের মতো এফিসিয়েণ্ট অফিসারের প্রকৃত স্থান এক্‌জিকিউটিভে। ভুল করে এ পথে এসেছেন।" সরকার কিন্তু ভুল করে তাঁকে ঢাকায় পাঠাননি। ভারতীয়দের মনে তৎকালীন এক্‌জিকিউটিভের উপর যে অনাস্থা ছিল সেটার

প্রতিকার ছিল জুডিসিয়ারিকে জনপ্রিয় করা। সেন ছিলেন বিচারক হিসাবে জনপ্রিয়।

সেন সাহেবই বিশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন সাবজজ পান্নালাল বসুর এজলাসে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা বিচারের জন্যে পাঠিয়ে। সাবজজ আর যাঁরা ছিলেন কেউ তাঁরা পান্নালাল বসুর মতো ব্যক্তিত্ববান ছিলেন না। পান্নালাল বাবু প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। আইনের বাইরেও তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। পরবর্তীকালে তাঁকে মন্ত্রী করা হয়, কিন্তু করা উচিত ছিল হাইকোর্টের জজ। পান্নালালবাবুর অনুমতি নিয়ে একদিন আমি তাঁর এজলাসে বসে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর চেহারা দেখি ও জবানবন্দী শুনি। কয়েকজন মহিলাকেও তিনি সে সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার স্ত্রী। দুঃখের বিষয় আমার বা আমাদের কারো বিশ্বাস হয় না যে সেই লোকটি ভাওয়ালের মেজ রাজকুমার। চেহারা বাঙালীর মতো নয়। বুলিও নয় বাঙালীর বা বাঙালের মতো। মামলাটা ঢাকা শহরকে সরগরম করে রেখেছিল। একখানা চটি সাপ্তাহিক রাতারাতি দৈনিকে পরিণত হয় শুধুমাত্র ওই মামলাটার রিপোর্ট ছাপতে। কী তার কাটতি! জনমত একবাক্যে সন্ন্যাসীর স্বপক্ষে। আদালত তো লোকে লোকারণ্য। জনতার দুলাল সন্ন্যাসীর কাউনসেল বি. সি. চ্যাটার্জী। অর্থাৎ বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁর নাম ফিফটি ফিফটি চ্যাটার্জী। যাঁর মতে হিন্দুদের শতকরা পঞ্চাশ, মুসলমানদেরও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চাকরি ও আসন দিলেই সমস্যাটা মিটে যায়। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কাউনসেল এ. এন. চৌধুরী। অর্থাৎ অমিয়নাথ চৌধুরী। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর অনুজ। চৌধুরী ভ্রাতারা সকলেই এক একজন দিক্‌পাল। প্রমথ চৌধুরী তো সাহিত্যে অমর। শোনা যায় হাসির গানে এঁদেরই অমর করে দিয়ে গেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। "আমরা বিলেতফের্তা ক'ভাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই।"

সেন জজ হবার আগে ব্যারিস্টার ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর দুই বন্ধু দুই ব্যারিস্টারকে ডিনারে ডেকেছিলেন। চৌধুরী এলেন, কিন্তু চ্যাটার্জী এলেন না। সেটা তাঁর মামলার কথা ভেবে। ডিনারে আমরা কেউ মামলার প্রসঙ্গ তুলিনি বা তুলতুম না। সেটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমাদের ছিল। নইলে মক্কেলরা হয়তো অন্যরকম ঠাওরাত। মামলাও একজাতের লড়াই। চৌধুরীর মতো চক্ষুঃশূল শহরে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো দুপুরে আমার খাসকামরায়। সেখানে তিনি ছুটে আসতেন প্রকৃতির আহ্বানে। কাছাকাছি আর কোথাও তার ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্কোচের সঙ্গে অনুমতি নিতেন যখন, তখন দুটো একটা অবান্তর কথাও বলতেন। প্রমথ চৌধুরী আমার সাহিত্য-গুরু শুনে করুণা প্রকাশ করেন। "পুঅর প্রমথ! হি ইজ এ ফেইলিওর।"

চল্লিশ বছর বাদে ঢাকা গিয়ে দেখে এলুম আমার খাসকামরাটি অবিকল সেই রকম আছে, কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারলুম না আমার এজলাস কোন্ ঘরটি। আশেপাশে সব কিছু বদলে গেছে। আমিই কেবল এক রিপ্ ভ্যান উইঙ্কল; যাক, খাসকামরার কথায় মনে পড়ছে একদিন এক উকিল এসে আমাকে একখানি বই উপহার দেন। 'বিন্দুসাধন'। সে আবার কী! ভদ্রলোক আমাকে বোঝান যে জন্মশাসনের একটা সহজিয়া পদ্ধতি আছে। তাতে যৌবনকেও অনন্তকাল ধরে রাখা যায়। দেহের বা মনের কোনো ক্ষতি হয় না। সাধনমার্গে অবনতি হয় না। আমাকে সংশয়ান্বিত দেখে ভদ্রলোক বলেন, "আমার দিকে চেয়ে দেখুন। চোখে কেমন আভা!" আমি সেটা স্বীকার করি। "অথচ আমিও আপনাদেরই মতো বিবাহিত পুরুষ। স্বাভাবিক জীবন যাপন করি। আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার হয় না।" আমি তাঁকে সাবধান করে দিই যে তিনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। শেষে একটা শক্ত অসুখবিসুখ হবে। তিনি বলেন, "আপনি যদি আমার গুরুমাকে দেখতেন! বয়স পঞ্চাশের উপর। কিন্তু দেখতে পঁচিশের বেশী নয়। শান্তি আর সুষমা আর স্থিরতার প্রতিমা। এই তো সেদিন এসেছিলেন। ফরিদপুর জেলায় আখড়া।" আমার কৌতূহল ছিল, কিন্তু ও সাধনা সহধর্মিণীকে সঙ্গে না নিয়ে হয় না। ভদ্রলোক আমাকে ভজাতে আসেন নি। অনুরোধ করে যান ও নিয়ে যেন কিছু লিখি।

আমি যে একজন লেখক এটা অনেকেই জানতেন। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডক্টর খাস্তগীর আমার কুঠিতে পদার্পণ করেন। বলেন, "আমরা সবরকম ইনটেলেকচুয়াল নিয়ে একটা মণ্ডলী তৈরি করতে চাই। বারো মাসে বারোটা বৈঠক হবে। এক একবার এক একজনের বাড়িতে বসবে। সাহিত্যিক থাকবেন দু'জন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় আর আপনি। রাজী?" আমি বলি, "কেন, আমি কেন? মোহিতলাল থাকতে আমি?" তিনি বলেন, "বারোজনের চেয়ে বেশী নেওয়া হবে না, তাঁদের একজন হবেন আপনি, এটা আমরা স্থির করে ফেলেছি।" তাঁর অনুরোধে আমিই নাম প্রস্তাব করি 'বারোজনা'। সে নাম গৃহীত হয়। যাঁদের নিয়ে বারোজনা তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন (না কুমার) চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সেন, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, প্রফুল্লকুমার গুহ. সর্বাণীসহায় গুহসরকার, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মোহম্মদ হাসান, মাহমুদ হোসেন, আর্থার হিউজ, অন্নদাশঙ্কর রায়। মুসলিম নাম দুটি বোধ হয় উল্টোপাল্টা হলো। সর্বাণীবাবুর পুরো নামটিও ঠিক হলো কি না সন্দেহ। আর্থার হিউজ তখন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। চমৎকার বাংলা বলেন, মেশেন সকলের সঙ্গে, সর্বত্র জনপ্রিয়। দানখয়রাতে মুক্তহস্ত। স্বাধীনতার পর অবসর নিয়ে ভারতেই থেকে গেছেন।

'বারোজনা'র প্রথম বৈঠকটা কার বাড়িতে হলো মনে পড়ে না। সেদিন চারু

বন্দ্যোপাধ্যায় ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া কাহিনী পড়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। ও নিয়ে আলোচনাও হয়। এর পর 'বারোজনা'র নাম ছড়িয়ে পড়ে। আগ্রহ প্রকাশ করেন অনেকেই। কিন্তু ওই যে আমাদের নিয়ম। বারোজনের বেশী সদস্য নেওয়া হবে না। তবে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতে পারেন যাঁরা চান বা যাঁদের আমরা চাই। এতে মনোমালিন্য বাড়ে বই কমে না। এমনিতেই অধ্যাপকে অধ্যাপকে আদায় কাঁচকলায়। তার উপর এই এক নতুন উপলক্ষ। এ ছাড়া আরেক উপদ্রব আমাদের একজন সদস্যের অবিবেচনা। তিনি আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আধঘণ্টা ধরে কথা বলবেন, যদিও আমিই সেদিনকার বক্তা ও আমার বক্তব্য অসমাপ্ত। তিনি যেন সর্ববিদ্যাবিশারদ। যাক, 'বারোজনা'র একজনা হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে আমার আলাপীর সংখ্যা বেড়ে যায়। বহু জ্ঞানীগুণীর সংস্রবে আসি। ঢাকা ক্লাবের অভাব অনুভব করিনে। যাঁরা আমাদের মণ্ডলীর সদস্য নন তাঁদের বাড়ি যাই, আলাপ করি। 'বারোজনা'য় তাঁদের নেওয়া হয়নি বলে তাঁরা বিরূপ। তা বলে আমার উপরে নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, মোহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির সান্নিধ্যে আসি। শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা এর আগে প্যারিসেই হয়েছিল। সেখানে তিনি ডক্টরেটের জন্যে কর্মরত।

একদিন সভাপতি হিসাবে শহীদুল্লাহ সাহেব আমাকে মহাবিপদে ফেলেন। রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে সভা। আমিও একজন বক্তা। সভাটার এমন এক বেয়াড়া সময় যে টেনিস খেলে এসে আমি কাপড় ছাড়ারও সময় পাইনে। এক পেয়ালা চা খাওয়া তো দূরের কথা। যদি জানতুম যে আমার পালা আসবে সব শেষে তা হলে ধীরেসুস্থে যেতুম। সভাপতিকে যতই বলি, "আমাকে ছেড়ে দিন", তিনি ততই আমাকে আটকান। বলেন, "আপনাকে এখন ছেড়ে দিলে সভায় আর কেউ থাকবে না। আপনি আমার হাতের পাঁচ।" যেমন হয়ে থাকে। সভা চলে অনন্তকাল ধরে। ওদিকে আমার পেটের জ্বালা মাথায় উঠেছে। বলতে গিয়ে এমন সব কথা বলে বসি যা রামমোহনের সম্বন্ধে সদ্য পড়েছি, সত্য মিথ্যা খতিয়ে দেখিনি। আমার বক্তব্য ছিল মোটের উপর এই যে, শতবার্ষিকীর সময় একটা অতিশয্যহীন ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন হওয়া উচিত। রামমোহন একজন মহাপুরুষ, কিন্তু একজন প্রোফেট বা অতিমানব নন। আর যায় কোথা! ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুরা মনে কষ্ট পান। আমি লজ্জিত। আমিও তো একজন প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রলম্বিত পরম্পরার আমিও একজন অনুবর্তী। আমি কি কখনো রামমোহনের বিরুদ্ধে বলতে পারি?

এর পরে আমি রমনার বাড়ি থেকে বন্ধুর বাড়িতে ও তারপরে পুরানা পলটনের বাড়িতে স্থানান্তরিত হই। ভুলে যাই কবে কী বলেছিলুম। হঠাৎ

একদিন সকালবেলা দুই অধ্যাপকের শুভাগমন। সুশীলকুমার দে আর মোহিতলাল মজুমদার। এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! এঁরা এসেছেন কতদূরে থেকে আমাকে খুঁজে বার করতে! অবশেষে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোয়। "যা একখানা বক্তৃতা ঝেড়েছেন আপনি! রামমোহনকে এক হাত নিয়েছেন। ব্রাহ্মদেরও নাকাল করেছেন। আপনাকে সাধুবাদ জানাতে এসেছি। অভিনন্দন! প্রগাঢ় শ্রদ্ধা!" আমি তো চিন্তিত! হা ভগবান! আমি যে রামমোহনের শত্রুদের হর্ষবর্ধন করেছি! পরোক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীপক্ষের। তাঁরা আমাকে একটা নতুন কথা বলে যান। সেটা প্রণিধানযোগ্য। "ব্রাহ্মসমাজের যে ব্রহ্ম সে ব্রহ্ম বেদান্তের ব্রহ্ম নয়। তৎ নয়। ওঁদের ওটা ব্রহ্মবাদ নয়, ঈশ্বরবাদ। ক্লীবলিঙ্গ হয়ে গেছে পুংলিঙ্গ। তাতে পিতৃত্ব আরোপ হয়েছে। ব্রহ্মবাদের রামমোহন একেশ্বরবাদ বলে অর্থ করেছেন। দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে একাকার করে ফেলেছেন তিনি। একই নাম, কিন্তু দুই বিভিন্ন বস্তু।" ওঁরা বিদায় নেন। মনে মনে আমি নিজের নাক কান মলি! আর ও বিষয়ে একটি কথা নয়। প্রশংসাও অনেক সময় নিন্দার চেয়ে দুঃসহ! আমি বিষম অপ্রস্তুত হই।

একদিন সাইকেলে করে ফিরছি। এক পদাতিক যুবক আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, "দাদা, আপনি কি বলতে পারেন এ পাড়ায় অন্নদাশঙ্কর রায় কোথায় থাকেন?" তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাই। তিনি তাঁর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ 'ভোরের সানাই' উপহার দেন। এমনি করে আলাপ হয়ে যায় কবি আজিজুল হাকিমের সঙ্গে। তিনি বার বার আসেন। একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করার বাসনা জানান। আমার তো বিশ্বাসই হয় না যে তাঁকে দিয়ে ও কাজ হবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি নারায়ণগঞ্জের এক পাটের ব্যবসাদারকে তিনি সাহিত্যের আসরে নামিয়েছেন। সম্পাদক পদে। 'সবুজ বাঙলা' নামটা বোধ হয় আমারই দেওয়া। প্রথম সংখ্যার প্রথমেই ছিল আমার প্রবন্ধ 'মাদ্রাসী বাংলা'। আরবী-ফারসীবহুল মুসলমানী বাংলার বিরূপ সমালোচনা। মুসলমান সম্পাদক যে সেটা কী করে পত্রস্থ করলেন, জানিনে। তখনো সাম্প্রদায়িকতা তেমন উগ্র হয়নি। 'বুলবুল'ও আমার লেখা ছাপত। হিন্দু মুসলমান নিয়ে স্পষ্ট কথা শোনাতুম। বাহার আর নাহার দুই ভাইবোনের পত্রিকা ছিল ওটা। হাবিবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্ নাহার দু'জনেই পরে প্রসিদ্ধ হন। 'বুলবুল'-এর লেখক হিসাবে বহু মুসলিম লেখক-লেখিকার সঙ্গে আমার পত্রসম্পর্ক স্থাপিত হয়। কবি সুফিয়া এন হোসেন আমাকে চিঠি লিখে বলেন কেন আমি ওসব বিতর্কিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে শক্তিক্ষয় করছি। আমার কাছে তিনি আশা করেন গল্প উপন্যাস। আর এক ভদ্রমহিলা তো আমাকে 'বুলবুল'-এর পৃষ্ঠাতেই আরো কী সব হিতোপদেশ দেন। সলমা রওশন জাহান তাঁর নাম।

জীবন যে কী বিচিত্র ব্যাপার তখন কি তা জানতুম ! দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর বাহার হন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী। অথচ এককালে তিনি এমন দুরবস্থায় পড়েছিলেন যে আমার কাছে চান একটি সারকেল অফিসার পদ। তখন আমি চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আমার ক্ষমতায় কুলোয়নি। তাই তো তিনি সরাসরি মন্ত্রী হতে পারলেন। দেশভাগের আরো কয়েক বছর বাদে দিল্লীতে এশিয়ার লেখক-লেখিকারা সম্মিলিত হন যেবার, সেবার বেগম সুফিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। ততদিনে তিনি সুফিয়া কামাল। এর পরে তাঁকে দেখি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কলকাতায়। পরে আবার ঢাকায়। সেখানে তাঁর পাশেই ছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি দুষ্টু হাসি হেসে বলেন, "আমাকে চিনতে পারেন ?" কী করে চিনব ? কোনোদিন কি দেখেছি ? "আমিই সেই সলমা রওশন জাহান।" তা কী করে সম্ভব ! সলমা তো মেয়েদের নাম। হাঁ, কিন্তু সেই নামেই তিনি আমার সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন। আরো অনেকের সঙ্গেও। তাঁর চূড়ান্ত রসিকতা হলো বেগম সুফিয়াকে কামাল করা। তাঁর আসল নাম কামালউদ্দিন।

'বারোজনা'র বাইরেও বহুজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন। একই দিনে একই সঙ্গে দেখা হয়ে যায় একটা লাইব্রেরিতে। ওদুদের আমি ছিলুম গুণমুগ্ধ পাঠক। তাঁকে আমার সদ্য প্রকাশিত 'অজ্ঞাতবাস' উপহার দিই। সাড়া মেলে তাঁর কাছ থেকে নয়, মোতাহার হোসেনের কাছ থেকে। সে কী মনোহর সমালোচনা ! তিনিও যে একজন সুলেখক তখন একথা আমার জানা ছিল না। পরে তিনিও কীর্তিমান সাহিত্যিক হয়েছেন। এঁরা আর এঁদের বন্ধুরা মিলে 'শিখা' পত্রিকা অবলম্বনে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন চালনা করছিলেন ও সেই সূত্রে মুসলিম সমাজে নবজাগরণের অগ্রদূত হয়েছিলেন। এঁদের নেতা ছিলেন আবুল হোসেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তবে এ খবরটা আমার কানে এসেছিল যে গোঁড়া মুসলমানরা এঁদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত। ওদুদকে নাকি নির্যাতিত করা হয়েছিল। গোঁড়াদের পৃষ্ঠপোষক নাকি ঢাকার নবাব পরিবার।

নবাব হাবিবুল্লাহ বাহাদুরকে আমি প্রথম দেখি মুসলমানদের এক বিবাহবাসরে। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুগঠিত সুপুরুষ। বাঙালী নন, কাশ্মীরী মুসলমান। এঁরা বঙ্গবিজেতাদের বংশধর নন, বণিক বংশীয়। নবাব উপাধিটা ইংরেজদেরই দান। সমাজে এঁদের শীর্ষস্থান কেবলমাত্র ঐশ্বর্য বা আভিজাত্যের জন্যে নয়। এঁদের দানখয়রাতও যথেষ্ট ছিল। মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে সারা ভারতের মুসলিম হোমরাচোমরাদের ঢাকায় নিমন্ত্রণ করে এনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সংস্থাপন করেন নবাব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর। কিন্তু

এই পরিবারে এমন সন্তানও ছিলেন যিনি বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন নি। সামাজিক ব্যাপারে এঁরা রক্ষণশীল হলেও বেগম শাহাবউদ্দীন ছিলেন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উৎসাহী কর্মী। ঢাকার অন্যান্য মহিলা কর্মীদের সঙ্গে এঁর মেলামেশা ছিল। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও। ইনি পর্দা মানতেন না। একবার আমার সঙ্গেও আলাপ হয়। পরবর্তীকালে এঁর স্বামী তো আমার বাংলোয় এসেছিলেন, চট্টগ্রামে। স্যার নাজিমের সঙ্গে পরে লঞ্চে করে বেড়িয়েছি আর নবাব বাহাদুরের সঙ্গে মোটরে করে। নদীয়ায় ও রাজশাহীতে।

মুসলমানদের বিবাহবাসর দিনের বেলা। শহরের সব সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু নিমন্ত্রিত। যাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত এক ডাক্তার। অনুষ্ঠান বলতে যা লক্ষ করি তা এক ঘণ্টা ধরে কাবিননামা পাঠ। নবাব বাহাদুরও ছিলেন পাঠকালে। কাবিননামায় কতরকম শর্ত ছিল ঠিক জানিনে। ভাষাটা উর্দু না বাংলা তাও মনে পড়ে না। চুক্তিপত্রটা বরকে পড়ানো হচ্ছিল। কনে তো অন্তরালে। আমরা দর্শকরা বরকেই দেখতে পাই, কনেকে না। ভোজনটা অতিমাত্রায় হয়েছিল, তবে কী কী পদ খেয়েছিলুম তার ফর্দ এই তেতাল্লিশ বছরের স্মৃতির জঠরে তলিয়ে গেছে।

স্যার নাজিমকে প্রথম দেখি ঢাকার গভর্নরের দরবারে। গভর্নর তখন স্যার জন অ্যাণ্ডারসন। তখনকার দিনে গভর্নর বছরে একবার ঢাকায় যেতেন ও লাটভবনে কয়েক সপ্তাহ বাস করতেন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী ছিল ঢাকা। সে সময় বড়ো বড়ো একরাশ ইমারত তৈরি হয়েছিল। তার কতকগুলো পায় বিশ্ববিদ্যালয়, কতকগুলো তো জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা, একটা থাকে গভর্নরের জন্যে বরাদ্দ। সেই লাটভবনেই একদিন আমাকেও সস্ত্রীক মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ করেন লাটসাহেব। অ্যাণ্ডারসনকে ভয় না করত কে! রাজশাহীর কলেকটর মিস্টার মার্টিন তো বলতেন, "হি ইজ এ হোলি টেরর! জেলায় গেলে আগে থেকেই সব খুঁটিনাটি পড়েশুনে যান। অফিসারদের জেরায় জেরায় জেরবার করেন। আমরাই কি আমাদের জেলার অত কিছু খবর রাখি?"

আম কেমন করে খেতে হয় তার অভিনব কৌশল সেদিন পর্যবেক্ষণ করি স্যার জনের উপর দৃষ্টি রেখে। আমটাকে বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে একটা ছোট ছুরি নিয়ে তিনি বোঁটার চারদিক ঘিরে বৃত্তাকারে কাটেন। তারপর একটা ছোট চামচ দিয়ে শাঁসটাকে তিনি কুরে কুরে খান। রসের একটি ফোঁটাও বাইরে ছিটকে বা গড়িয়ে পড়ে না। খোসাটা যেমনকে তেমন, আঁটিটা নিঃসত্ত্ব। সাহেবদের সম্বন্ধে সেই যে মজার কাহিনী আছে, তাঁরা স্নানের ঘরে গিয়ে হাত মুখ রসে একাকার করে আম খান টেবিলে বসে, স্যার জন সেদিন সেটাকে কাল্পনিক প্রমাণ করেন। তবে আমকে অমন কুরে কুরে খেলে কি তৃপ্তি হয়?

ভোজনপর্ব সারা হলে লাটসাহেব যাঁদের সঙ্গে আলাপ করে সম্মান দেখাতে

চান তাঁদের ডাক আসে এক এক করে পাশের কক্ষে। সেদিন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার সহধর্মিণী। স্যার জন জানতেন আমাদের সম্বন্ধে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর। তাঁর অজ্ঞাত নয় চট্টগ্রামে আমাদের বদলি, সেখানে আমাদের বাসার অভাব ও সারকিট হাউসে স্থিতি, ঢাকায় বদলি ও এখানে আবার একই অসুবিধে। পারিবারিক কুশল প্রশ্ন শুধান ও সহানুভূতি জানান। এমন দরদ ও ভদ্রতা আমার গৃহিণী ইউরোপীয় মহলে বড়ো একটা দেখতে পাননি। গভর্নরের এই সদাশয়তায় তিনি বিস্মিত ও প্রীত হন। না, 'হোলি টেরর' নয়। হৃদয়বান মানুষ। আমি তখন কী! একজন জুনিয়র অফিসার মাত্র। চাকরির তো চারটি বছরও পূর্ণ হয় নি। বছর দুই বাদে পদ্মানদীর বুকে তাঁর সঙ্গে আরো একবার আমার মুখোমুখি হয়। সে এক রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার।

তখন আমি কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম। একদিন ট্যুর থেকে ফিরছি, পোড়াদা স্টেশনে কুষ্টিয়ার ট্রেন ধরব বলে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছি, এমন সময় দেখি দক্ষিণ থেকে একটা ইন্‌জিন ছুটে আসছে, তার পেছনে একটা সেলুন। পুলিশ সাহেব সুকুমার গুপ্তকে দেখে সেলুনে উঠে বসি একটু গল্পগুজব করতে। আর অমনি ইন্‌জিন স্টার্ট দেয়। কী করব? নেমে যাব না সঙ্গ নেব? মুহূর্তের মধ্যে মনঃস্থির করে ফেলি। চাপরাসীকে বলি কুষ্টিয়ায় গিয়ে খবর দিতে যে আমি পুলিশ সাহেবের সঙ্গে পদ্মাতীরে গভর্নরকে রিসিভ করতে গেছি। ফিরতে রাত হবে। সম্ভবত ঢাকা মেলে ফিরব। নিছক পাগলামি। গভর্নর তো স্টীমার থেকে নেমেই স্পেশাল ট্রেনে করে কলকাতা অভিমুখে অন্তর্ধান। সে ট্রেন পোড়াদায় দাঁড়ায় না। আর পুলিশ সাহেবও পোড়াদায় আমাকে নামিয়ে দিয়েই রানাঘাট অভিমুখে উধাও। তাঁর সঙ্গে সামান্য কিছু খাবার ছিল। একজনের মতো। আমার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। পথে যে কিনতে পাব তাও নয়। অথচ আমাকে কেউ ডাকেনি, আমি অনাহূত যাত্রী!

কলকাতার পরেই ঢাকা। তাই সেখানে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে গুণীজন সমাগম হতো। উদয়শঙ্কর একদিন সদলবলে নৃত্য পরিবেশন করেন। অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমরা তো চমৎকৃত, কিন্তু আমাদের 'বারোজনা'র সেই সবজান্তা বন্ধু বলেন, "পাশ্চাত্ত্য ব্যালের প্রাচ্য অনুকরণ। এটা আমাদের ঐতিহ্য নয়।" শুনে বিরক্ত হই। এ দেশে যা ছিল না, যা থাকলে আমাদের সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ হতো তাই এনে দিয়েছেন উদয়শঙ্কর। হলোই বা পাশ্চাত্ত্য। কোন্‌টা পাশ্চাত্ত্য নয়? থিয়েটার কি প্রাচ্য? থিয়েটারে যে কনসার্ট বাজানো হয় সেটাও কি প্রাচ্য? স্টেজ কি প্রাচ্য? সীন কি প্রাচ্য? হারমোনিয়াম না হলে তো গানই হয় না। সেটাও কি প্রাচ্য? আর অনুকরণ দিয়েই তো শুরু করে সবাই। একটু একটু করে কাটিয়ে ওঠে। সাহিত্যেও তাই হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুরা ততদিনে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায়। নতুন কোনো সাহিত্যিক-

গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। মাঝে মাঝে চারুবাবু ও মোহিতবাবুর সঙ্গে সাহিত্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলি। মোহিতবাবু তো বুদ্ধ, অচিন্ত্য প্রভৃতি নবীনদের উপর একধার থেকে অপ্রসন্ন। "ওরা যদি সাহিত্য নিয়ে থাকতে চায় তো ওদের দৈন্য বরণ করতে হবে। বই লিখব আর বড়লোক হব এটা সাহিত্যিকের আদর্শ নয়। ওরা বিপথে চলেছে। কেমন করে আমার শ্রদ্ধা পাবে?" তারপর তিনি বাঙাল ভাষা সহ্য করতে পারতেন না। বাংলা ভাষা কেমন করে বাঙাল ভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত দিতেন তিনি ও সুশীলকুমার দে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের কর্তারা সে সময় প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গীয়। যেমন সুশীলকুমার, তেমনি শহীদুল্লাহ, তেমনি চারু বন্দ্যো, তেমনি মোহিতলাল। এঁদের মনোভাবটা কতকটা প্রবাসী বাঙালীর মতো। আমি অবশ্য ধরাছোঁওয়া দিতুম না। শুনে যেতুম। শুনে শিখতুম। "ছোটদের বই" কেন ভুল। "ছেলেদের বই" কেন ঠিক। ছেলে বললে মেয়েছেলেও বোঝায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল খুব মজার একটা গল্প। ওটা বোধ হয় বীরভূমের। সাক্ষী দিতে এসে একজন হাকিমকে বলে, "হুজুর, এটা আমার ছেল্যা, ওটা আমার মায়্যা।" তার মানে কি এটা আমার ছেলে, ওটা আমার মেয়ে? উঁহু। এটি আমার মেয়ে, ওটি আমার স্ত্রী।

আমার সব চেয়ে ভালো লাগত চারুবাবুকে। তিনি কারো সমালোচনা করতেন না। মিষ্টভাষী নিরহংকার মানুষটি, নিজের সৃষ্টির কাজ নিয়েই ব্যাপৃত, পরের অনাসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন বা নীরব। প্রায়ই বলতেন শরীর শ্রান্ত, আর বইতে পারছেন না। আমার প্রথম লেখা বেরোয় 'প্রবাসী'তে। চারুবাবু নিজের হাতে পোস্টকার্ড লিখে জানান যে মঞ্জুর হয়েছে। ষোল বছর বয়সে সেটা একটা উৎসবের দিন।

মহকুমা হাকিমের জীবনে প্রচুর বৈশিষ্ট্য থাকে। কাজটা কেবল ফাইল ওয়ার্ক বা ডেস্ক ওয়ার্ক নয়। তার চেয়ে বেশী ফীল্ড ওয়ার্ক। শত শত জনের সংস্পর্শে আসতে হয়, শুধু বাদী ফরিয়াদী আসামী পুলিশ আর উকিল নয়। জুডিসিয়াল ট্রেনিং আমার জীবনকে একঘেয়ে করত, যদি না আমাকে দিত অনেক বেশী অবসর ও ঢাকা চট্টগ্রামের মতো শহরে গুণীজনসঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় প্রায়ই আমার ডাক পড়ত কিছু বলতে। ছাত্ররা ধরে নিয়ে যেত। অধ্যাপকরাও আগ্রহ দেখাতেন। জগন্নাথ হলের বক্তৃতার শেষে তার প্রোভস্ট অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আমাকে বলেন, "ছাত্ররা যে আপনার বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছে তার প্রমাণ এক ঘণ্টাকাল পিন-ড্রপ সাইলেন্স।" এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কী হতে পারে! এটা হয়তো তাঁর সৌজন্য।

দেওয়ানি মামলাগুলো আমি বেবাক ভুলে গেছি। ফৌজদারি মামলা দুটো একটা মনে আছে। সাধারণের ধারণা নারীধর্ষণ শুধু মুসলমানদেরই একচেটে,

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। ঢাকায় আমার আদালতে একবার জনা সাত আট নমঃশূদ্রকে চালান দেয়। বয়স তাদের সতেরো আঠারো থেকে ষাট বাষট্টি। কেউ বা ছিল ঠাকুরদাদা, কেউ বা ছিল নাতি। কী করে যে তাদের প্রবৃত্তি হলো একজোট হয়ে তাদেরি জ্ঞাতি একটি বিধবার উপর বলাৎকার করতে, সেটা আমার দুর্বোধ্য। মেয়েটির বয়সও কম নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। মিথ্যা মামলা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট তো ছিলই, তা ছাড়া মেয়েটির নিজের জবানবন্দী ছিল মর্মস্পর্শী। ঘটনার মাসতিনেক পরেও সে ব্যথা বোধ করছিল। তেতাল্লিশ বছর পরেও তার মুখ আমার মনে পড়ে, যদিও আবছাভাবে। তারই আশেপাশে দেখছি আরো কয়েকটি মেয়ের মুখ। তারা মুসলমান। ঢাকার নয়, নওগাঁর। তাদের একজনের নাম হাউসবি। একটি পশ্চিমা হিন্দুর মেয়ের মুখও মনে আছে। তার নাম রাধিয়া গোড়নী। স্বামীটা অপদার্থ। পালিয়ে যাচ্ছিল তাকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে। রাতে আশ্রয় নেয় যার বাড়িতে সেই রক্ষক হয় ভক্ষক।

ট্রেনিং-এর মেয়াদ ফুরোবার দেড় মাস আগেই আমাকে বদলি করা হয় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে মহকুমায়। আমরা একদিন নারায়ণগঞ্জে গিয়ে আবার স্টীমারে উঠে বসি। এবার উজানযাত্রা। সেই পদ্মা, সেই গোয়ালন্দ, সেইসব দৃশ্যের পুনর্দর্শন। ট্রেনটা এবার চিটাগং মেল নয়, ঢাকা মেল। রাতের অন্ধকার ভেদ করে সে পশ্চিমাভিমুখে ছুটে চলে। পেছনে পড়ে থাকে ঢাকা চট্টগ্রামের স্মৃতি। সাড়ে তিন বছর বাদে আবার আমি চট্টগ্রামে ফিরি, কিন্তু ঢাকায় ফিরতে লেগে যায় কিছু কম ঊনচল্লিশ বছর। তাও আকাশপথে।

বিষ্ণুপুরে ছ'মাস থাকার পর আমি ছুটি নিয়ে দেরাদুন যাই ও সেখান থেকে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন ঘুরে বাংলাদেশে ফিরি। সঙ্গে আমার স্ত্রী, দুই পুত্র ও বেয়ারা। দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম বিষ্ণুপুরে। ছুটির পর বদলি হই কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসকের পদে। 'কলঙ্কবতী' বিষ্ণুপুরে লেখা হয়।

॥ পাঁচ ॥

তখনকার দিনে কুষ্টিয়া ছিল নদীয়া জেলার সামিল। কলকাতা থেকে একশো মাইলের মতো। শিয়ালদা থেকে চট্টগ্রাম মেল ধরলে তিন ঘণ্টার রাস্তা। কুষ্টিয়ায় যেতে হবে শুনে আমি তো খুব খুশি। কিন্তু আমার এক আলাপী আমাকে সতর্ক করে দেন। "কুষ্টিয়া! ওখানে যা দারুণ ম্যালেরিয়া! প্রাণে বাঁচলে হয়! পারেন তো বদলিটা এড়ান।"

কুষ্টিয়া নামটার সঙ্গে কুষ্ঠের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক

আছে জানতুম না। থাকলেও তার কাটান আছে। বদলিটাকে বাতিল করার চেষ্টা না করে সপরিবারে কুষ্টিয়ায় গিয়ে মহকুমা হাকিমের কাজে যোগ দিই। ম্যালেরিয়া একদিনও হয়নি। কুষ্ঠের তো দেখাই পাইনি। তবে যেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল সেটার নাম কোষ্টা। তার মানে পাট। কারো কারো মতে কোষ্টার থেকে কুষ্টিয়া। কিন্তু পাটের চাষ তো সারা পূর্ববঙ্গ জুড়েই হয়। কুষ্টিয়ায় যে নারায়ণগঞ্জ বা সিরাজগঞ্জের চেয়ে বেশী তা নয়।

যার নামে মহকুমার নাম সেই শহরটা অর্বাচীন। তার চেয়ে পুরোনো শহর কুমারখালী। কিন্তু আমি যখন যাই তখন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে কুমারখালীর পড়ন্ত দশা। বাণিজ্য থেকে তার পূর্ব সমৃদ্ধি আর নেই। সম্ভবত গোরাই নদীর বহমানতার সঙ্গে তার সমৃদ্ধির একটা সম্পর্ক ছিল। গোরাই বর্ষাকালে বন্যাস্ফীত হলেও বারো মাস স্টীমার চালনার উপযুক্ত নয়। অথচ এককালে কুষ্টিয়া থেকে স্টীমার ধরতে হতো। একজন বিশপ—বোধ হয় বিশপ কটন—স্টীমারে উঠতে গিয়ে পা ফসকে জলে পড়ে যান ও সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হয়ে যান। আমি যখন যাই তখন কুষ্টিয়ার পথ দিয়ে স্টীমার যাওয়া আসা করতে দেখিনি। তবে লঞ্চ চলতে দেখেছি। প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনার টোয়াইনাম এসেছিলেন কলকাতা থেকে লঞ্চে করে। ও রকম বড়ো লঞ্চ বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে চলে না।

কুষ্টিয়ায় রেনউইক কোম্পানীর খানতিনেক লঞ্চ ছিল। ওঁরা আখ মাড়াইয়ের কল তৈরী করে গ্রামের চাষীদের ভাড়া দিতেন। সেই সূত্রে গোরাই ও অন্যান্য নদী দিয়ে লঞ্চেও চড়ে বেড়াতেন। সবচেয়ে বড় লঞ্চটা ব্যবহার করতেন বড়ো সাহেব গ্রেভস। মাঝারিটা মেজ সাহেব মে। ছোটটা ছোট সাহেব চ্যাপম্যান। ছোকরা তো একদিন লঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছে, হঠাৎ ঝড় উঠে লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়। পরে যাকে পাওয়া গেল সে চ্যাপম্যান নয়, চ্যাপম্যানের একটি বুটসুদ্ধ পা। গোরাই নদীতে আমরা কুমীর কখনো দেখিনি বা কুমীর আসে বলে শুনিনি। তবে পদ্মানদীতে আমি ঘড়িয়াল দেখেছি। জলে নেমে সাঁতার কাটছি, এমন সময় এক ঘড়িয়ালের আবির্ভাব। ঘড়িয়াল মানুষখেকো নয়, সুতরাং চ্যাপম্যানের শরীরের আর সমস্ত অংশ কার কবলে পড়ল বা কোথায় ভেসে গেল সেটা অজ্ঞাত থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ হাউসবোট আর শিলাইদার ঘাটে বাঁধা ছিল না। শিলাইদা গিয়ে দেখি পদ্মা দূর অস্ত। বোটের খোঁজ নিয়ে শুনি বোট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে খড়দায় না কোথায়। শিলাইদা ততদিনে ঠাকুরবাবুদের হাতছাড়া হয়েছে। ভাগ্যকুলের রায়রা তখন সেই এস্টেটের মালিক। আরো আগে মালিক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঁটোয়ারায় মহর্ষির জমিদারের সেই অংশটা পড়ে সত্যেন্দ্রনাথের ও তাঁর পরে তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথের ভাগে। রবীন্দ্রনাথ যখন

শিলাইদায় বাস করতেন তখন মহর্ষি বেঁচে। কুঠিবাড়িটি দেখে মনে হলো তেমন পুরোনো নয়। তবে কবি সেখানে এসে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতেন। তাঁর অনেক লেখা কুঠিবাড়ির সঙ্গে জড়িত। ঠাকুরবাবুদের আমলারা ভাগ্যকুলের অধীনে কাজ করলেও কবিকে ভোলেননি। তাঁরা আমাকে নিয়ে যান জমিদারির মহাফেজখানায়। যেখানে রক্ষিত ছিল পুরোনো নথিপত্র। কবির হাতে লেখা কয়েকখানি চিঠি আমাকে দেখানো হয়। কবিত্বের নামগন্ধ ছিল না তাতে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ জমিদারি সেরেস্তার আমলাদের নির্দেশ দিচ্ছেন জমিদারি ভাষায়। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ শিক্ষা সমাপন করে বিদেশ থেকে ফিরে বিজ্ঞানসিদ্ধ উপায়ে চাষবাস করবেন খুব বড় স্কেলে। চর এলাকায় জমি চাই। খাস জমি না থাকে লীজ নেবেন। কেটে গেছে চল্লিশ বছরের উপর। ঠিক মনে পড়ছে না শর্তগুলো কী কী। কিন্তু মুন্সিয়ানার সঙ্গে লিপিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ যেমন আদর্শবাদী তেমনি প্র্যাকটিকাল ছিলেন। তবু তাঁর সেই স্কীম কোনো কাজে লাগল না। রথীবাবু উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আবার বিদেশে যান। কবিও যান তাঁর সঙ্গে। এমন সময় ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে নোবেল পুরস্কার এসে সব ওলটপালট করে দেয়। জমিদারি বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। শিলাইদা অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের স্বত্ব থাকে না। রথীবাবুর জন্যে তখন অন্য পরিকল্পনা। চাষবাস তাঁকে করতে হয় নি। পতিসর অঞ্চলেও না।

কুষ্টিয়ায় বদলির আগে আমি ছিলুম ছুটিতে। বেশীর ভাগ সময় দেরাদুনে। ফেরবার সময় দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে আসি। স্মারক হিসাবে নামাবলী কেনা হয়েছিল। একে ওকে দেবার পরেও কয়েকটা সঙ্গে থেকে যায়। কুষ্টিয়ার বাড়ির দরজায় পর্দার কাজ করে। নামাবলীকে পর্দার বদলে ব্যবহার করা কারো কারো বিবেচনায় অন্যায়। কিন্তু অনেকে আবার তার থেকে অনুমান করে যে আমরা পরম বৈষ্ণব। তা দেখে বাউল দরবেশ বৈষ্ণব শাক্ত সাধক সাধিকারা আকৃষ্ট হন। একদিন একদল দরবেশ এসে গান জুড়ে দেন। একটি মাঝবয়সী নারী। তিনজন কি চারজন কমবয়সী পুরুষ। মধ্যবয়সিনীর নাম হরিদাসী শুনে হিন্দু বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর সহচরদের সকলের পদবী শাহ। নামও ইসব বা ইউসুফ ইত্যাদি। প্রশ্ন করে জানতে পারি ওঁরা সাঁই দরবেশ। সম্ভবত লালন শাহ ফকিরের গোষ্ঠী। কিন্তু তখনো আমি লালন সম্বন্ধে কৌতূহলী হইনি। তাই ওঁদের সেকথা জিজ্ঞাসা করিনি। লালনের আস্তানা ছিল ছেঁওড়িয়ায়। সেখানে গেলে তাঁর সম্বন্ধে তখনো কিছু বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ মিলত। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে আমার মেলামেশা তাঁরা হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, লালন ফকিরের মহত্ত্ব জানতেন না বা মানতেন না। ব্যতিক্রম আমাদের দ্বিতীয় মুনসেফ মতিলাল দাশ। কিন্তু বহুদূর থেকে অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন আসেন লালনের গান সংগ্রহ করতে। আশ্চর্যের

কথা তাঁকে আমি পাই নওগাঁর, পরে ঢাকায়, ঢাকার পরে কুষ্টিয়ায়। তাঁর ওই একই ধ্যান। হারিয়ে যাওয়া লোকগীতিকা। যার নাম 'হারামণি'।

তখনি লক্ষ করেছি যে বাউল সাধনার দিক থেকে কুষ্টিয়ার স্থান অবিভক্ত বাংলাদেশের কেন্দ্রে। যেমন বৈষ্ণব সাধনার দিক থেকে নবদ্বীপের স্থান। দুটিই তখন ছিল অবিভক্ত নদীয়া জেলার অন্তর্গত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগর যার সদর। জেলা বোর্ডের সভায় যোগ দিতে মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে যেতে হতো। পরে নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আরো পরে জেলা জজ নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণনগরে বাস করেছি। কলকাতার পূর্বে অবিভক্ত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর ও আরো পূর্বে নবদ্বীপ। এখন আর সেকথা বলা চলে না। ধর্মীয় গুরুত্ব আর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব একার্থক নয়। দেশভাগের পর কুষ্টিয়া, মেহেরপুর আর চুয়াডাঙ্গা আলাদা একটি জেলায় পরিণত হয়েছে। নাম কুষ্টিয়া জেলা কুষ্টিয়া যার সদর। মহকুমা হিসাবে কুষ্টিয়া বরাবরই বিশিষ্ট ছিল। অ্যাশলী ইডেন থেকে আরম্ভ করে দেশী বিদেশী বহু সিভিলিয়ান তার এস. ডি. ও. ছিলেন।

কুষ্টিয়ার শাসনকার্য দুরূহ ছিল না। কারণ সন্ত্রাসবাদ তখন অস্তগামী, অন্তত আমার এলাকায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা তখনো মারমুখো হয়নি, অন্তত আমার এলাকায় দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা ছিল না। আর গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ তো ততদিনে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত। শাসনকার্যের অভিনবত্বের মধ্যে ছিল সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে অর্থসংগ্রহ ও তা দিয়ে একটি মেটারনিটি হোম স্থাপন। সেটাই আমার এলাকার জনসাধারণের ইচ্ছা। তারপর বড়লাট লিনলিথগাউ সারা দেশের জন্যে মঞ্জুর করেছিলেন এককোটি টাকা। তার একটি ভগ্নাংশ কুষ্টিয়ার ভাগে পড়েছিল। কিন্তু তা দিয়ে কী করলে ভালো হয় সে বিষয়ে আমরা কেউ মনঃস্থির করতে পারিনি, অথচ খরচ না করে ফেরৎ দিতেও হাত ওঠে না।

প্রায়ই আমাকে ট্যুরে বেড়াতে হতো। কিন্তু মোটরগম্য পথ বলতে যা ছিল তা কয়েক মাইল মাত্র। কুষ্টিয়া শহরে তখন একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর মোটর ভিন্ন আর কোনো মোটর চলাচল করত না। তবে ছিল বোধ হয় মোহিনী মিলের ও রেনউইক কোম্পানীর কর্তাদের কদাচিৎ ব্যবহারের জন্যে মোটর। জমিদারদের কারো অবস্থা সচ্ছল নয়, বড়ো জমিদার বলতে একজনকেও দেখিনি। জমিদারি সম্পত্তি যাঁদের ছিল তাঁদের অবস্থান অন্যত্র। যেমন ভাগ্যকুলের বাবুদের বা মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর সাহেবদের। রাস্তার অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল রেলপথ। পোড়াদহ জংশন দিয়ে যাতায়াত করত ঢাকা মেল, চট্টগ্রাম মেল, আসাম মেল ও নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। প্রথম দুটি তো কুষ্টিয়ায় আমার বাসভবনের সামনে দিয়ে যেত আসত। যাত্রীরা সবাই দেখতে পেতো আমরা

আমাদের বারান্দায় বসে কথা বলছি বা আমাদের বাগানে বেড়াচ্ছি। পরবর্তী কালে বহু অচেনো ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে তাঁরা আমাদের সেই সূত্রেই চেনেন।

জরুরি কাজে ট্যুরে বেরোতে হবে, মেল বা প্যাসেঞ্জার সে সময়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে একটা মালগাড়ি। মালগাড়ির গার্ডের কামরায় উঠে বসি। গার্ড একটু আপত্তি করতে গেলে আমি বলি এটা সরকারী ব্যাপার ও জরুরি। তখন তিনি আমাকে একটা ছাপা কাগজে সই করতে বলেন। আমি সই করি। আমার প্রাণহানি বা অঙ্গহানির জন্যে রেল কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না। সে এক মজার অভিজ্ঞতা। ট্রেন থেকে নেমে বাকী পথটা পায়ে হাঁটতে হতো। রিক্সার যুগ তখনো আসেনি। টমটম নওগাঁয় পেয়েছিলুম, কুষ্টিয়ায় পাইনি। ওটা পশ্চিমের সেই এক্কা। উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেই পর্যন্ত তার দৌড়। হাতী আমি নওগাঁয় পেয়েছিলুম, কুষ্টিয়ায় দেখিনি। তবে পড়েছি যে ঠাকুরবাবুদের এক বরকন্দাজের হাতী ছিল। সেই হাতীর পিঠে চড়ে সে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাজনার সঙ্গে সঙ্গে আবওয়াব আদায় করে বেড়াত। ঠাকুরবাবুরা কি এটা জানতেন না? যাক, ইতিমধ্যে কৃষক-প্রজা আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার হয়ে উঠেছিল। তাই আবওয়াব ঘটিত অভিযোগ আমার গোচরে আসেনি। প্রজারা খাজনা না দিলে জমিদার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট জারি করতে আমি বাধ্য। সার্টিফিকেটের মামলা বিচার করার জন্যে আমার বা আমার সেকেন্ড অফিসারের সময় নেই। একজন স্পেশাল অফিসার আনিয়ে নিতে হলো। অপ্রীতিকর কর্তব্য। প্রজারা খাজনা দেবে কী করে যদি পাটের দাম পড়ে যায় ও পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়? তবে কারো ঘরে অন্নাভাব ছিল না।

কৃষক-প্রজা আন্দোলনের নেতা শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবের কথা মনে পড়ে। তিনি আমাকে বলেন তিনি নিজেও একজন জমিদার। প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ানো তাঁদের পলিসি নয়। আন্দোলনটা সাম্প্রদায়িকও নয়। তাঁর দলে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—জে. এল. ব্যানার্জি—মহাশয়ও নেতৃত্ব করতেন। আমি তো সেই আন্দোলনে অন্যায় বা অন্যায্য কিছু দেখতে পাইনি। এখনো মনে পড়ে খাজনার মামলার বা সার্টিফিকেটের মামলার দুই পক্ষ কেমন অসমান। মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ্ মহতাব বাহাদুর জি. সি. আই. ই, জে. সি. আই. ই. ইত্যাদি ইত্যাদি বনাম পাঁচু শেখ। পাঁচু শেখের সাধ্য কী যে সে মহারাজাধিরাজের সঙ্গে এককভাবে লড়ে। একদিকে বড়ো বড়ো উকিল, অপরপক্ষে ছোট ছোট উকিল। কোনো কোনো কেসে মোক্তার। পাঁচু শেখরা তো হারবেই। অনেক সময় মামলাগুলো একতরফা। এক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতাই আত্মরক্ষার উপায়। ট্রেড ইউনিয়ন যদি শ্রমিকদের স্বার্থে প্রয়োজন হয় তো কৃষকসমিতিও চাষীদের স্বার্থে প্রয়োজন। এটাকে মাথা পেতে মেনে নিলেই মঙ্গল। কিন্তু জমিদারদের তখন সত্যিই শোচনীয় অবস্থা। তাঁরা খাজনার চেয়ে বহুগুণ আবওয়াব আদায় করতেন ও সেই আয়ে বড়লোকী করতেন। সেটা বন্ধ হলে শুধুমাত্র খাজনায় তাঁদের

চাল রক্ষা হয় কী করে। ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদও আমি দেখেছি। মহাজনদের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয়। শোধ করতে না পারলে জমিদারি মহাজনের কবলে পড়ে। আর নয়তো কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ধোবড়াকোল ঠিক জমিদারি নয়, তবু তিনিও কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দেবার প্রার্থনা জানান ও নদীয়ার কলেক্টর হিসাবে আমি তাঁর পক্ষে লেখালেখিও করি। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের তখন ঘোর দুরবস্থা। কিন্তু তাঁরা যত টাকা মাসোহারা চেয়েছিলেন আমার রেভিনিউ ডেপুটি তত টাকা সুপারিশ করতে নারাজ। এস্টেটের আয় কম।

পরবর্তীকালে ময়মনসিং-এর একজন হিন্দু জমিদার আমাকে বলেছিলেন,—"দেখুন, মুসলমান প্রজারা খুব লক্ষ্মী। খাজনার টাকা ওরা ঠিক দিয়ে যায়। কিছুতেই যারা দেবে না তারা কারা, জানেন?" আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনে যখন তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ।" কারণ তারা খাজনা না দিলেও হিন্দু জমিদার তাদের চটাতে সাহস পাবেন না। জমিদার প্রজার বিরোধটা হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নয়। অথচ ওটাকে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ বলে চালিয়ে দিয়েছেন উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতি তথা কায়েমী স্বার্থের ধারক। কুষ্টিয়ায় থাকতে আমি লক্ষ করিনি বিরোধটা তলে তলে কতদূর গড়িয়েছে। কুষ্টিয়ার পর নদীয়া জেলার কলেকটর হই। তারপর ছুটি নিই। ছুটির পর রাজশাহী জেলার কলেকটর হই। তখনি বুঝতে পারি শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের রূপ নিচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় আমি ১৯৩৫-৩৬ সালেও মুসলমান ভদ্রলোকদের ধুতি পরতে দেখেছি। আমার চাপরাসী বাদল যে মুসলমান এটা আবিষ্কার করতে আমার লাগল দেড় বছর। নওগাঁতেও দেড় বছর লেগেছিল সুখলাল যে মুসলমান এ তথ্য আবিষ্কার করতে। ধর্মে আমরা যে যাই হই না কেন আর সব বিষয়ে আমরা বাঙালী, একে হাজার চেষ্টা করলেও উড়িয়ে দিতে পারা যাবে না। অথচ একে স্বীকার করতেও কায়েমী স্বার্থে বাধবে। তবে ধর্মের যে কতখানি জোর এটা আমি চল্লিশ বছর আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। ভিতরে ভিতরে আমি নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠেছিলুম ও তলে তলে আমার অনুরাগ ছিল সোভিয়েট কমিউনিজমের উপর। ধর্ম কী? সে তো জনগণের আফিং। আর আমরা বুর্জোয়ারাও ইচ্ছা করলে ফরাসীতে যাকে বলে 'দেক্লাসে' বা শ্রেণীহারা হতে পারি।

একবার ট্যুরে গিয়ে দেখি একই গ্রামে দুটি মসজিদ। মাঝখানে দূরত্ব বেশী নয়। জানতে চাই দুটি মসজিদ কেন। তখন একজন মোড়ল এর উত্তরে বলেন, "আমরা গেরস্তী। ওরা জোলা। ওদের সঙ্গে আমাদের জাতা নেই। সেজন্যে আলাদা মসজিদ।" একজন চাষী মুসলমান একজন

তাঁতী মুসলমানের সঙ্গে একসঙ্গে উপাসনাও করবে না, পাছে জাত যায়। এটা কি ইসলামের শিক্ষা না হিন্দু ঐতিহ্য? দুই পক্ষই সম্ভবত হিন্দু থেকে মুসলমান। ইসলাম যে জাতিভেদ মানে এর অন্য একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। নওগাঁয় একটি যুবক আমাকে চাকরির জন্যে ধরে। তার কথা হলো সে ধাওয়া মুসলমান। সমাজে হীন। সেইজন্যে তার চাকরি জুটছে না। ধাওয়ারা মাছ ধরে। পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল নিশ্চয়। মুসলিম সমাজের জাতিভেদের এইসব নমুনা দেখার পর ইসলামিক সলিডারিটি প্রভৃতি লম্বাচওড়া বুলি আমাকে ভোলায় না। জোলা আর ধাওয়ারাও একদিন চাকরির এক একটা হিস্সা চাইবে। তার পরে ক্ষমতার এক একটা হিস্সা। তখন মুসলমানে মুসলমানে ঝগড়া বাধবে। ওই মসজিদ দুটিই তার ইঙ্গিত।

জানিপুরে কাপালিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কাপালিক থেকে কাপালি কি না বলতে পারব না। তবে ওরা হিন্দুসমাজে অন্ত্যজ। এতকাল পরে আমার মনে পড়ছে না এদের সমস্যাটা তখন কী ছিল। চাকরি ওরা চায় নি। সামাজিক নির্যাতনের অভিযোগই বোধ হয় উঠেছিল! হিন্দুর দ্বারা হিন্দুর। আইন এক্ষেত্রে নিরুপায়। যদি না স্বাধীনতার পর আইন বদলায়। মহকুমা হাকিম হিসাবে আমি কোনো সম্প্রদায়ের ঘরোয়া ব্যাপারে হাত দিতে অক্ষম। বিবাদ থেকে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তবে অন্য কথা। তা হলেও মাঝে মাঝে আমার কাছে ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অনুরোধও আসত। একদিন গোসাঁই সদরচাঁদ এসে নিবেদন করেন, "ব্রাহ্মণ কেন বৈষ্ণবের গুরু হবে, বৈষ্ণবকে মন্ত্র দেবে, এর বিচারের জন্যে আমি এক সভা আহ্বান করেছি। সভায় আপনাকে সভাপতি হতে হবে।" আমি হেসে বলি, "এ তো আদালত নয় যে আমি যে রায় দেব তা দুই পক্ষই মেনে নেবে। সভায় গিয়ে শোভাবর্ধন করে কী হবে!"

কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট নাগরিকদের সকলের নাম আমার স্মরণ নেই। আমার যাঁদের ভালো লাগত তাঁদের মধ্যে ছিলেন শহরের মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান তারাপদ মজুমদার। আমি তাঁকে বলতুম মেয়র বা লর্ড মেয়র। এত দীর্ঘকাল ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে চেয়ারম্যান পদে থাকতে আমি আর কাউকে দেখিনি। পেশায় উকিল। সর্বজনপ্রিয়। মোহিনী মিলের কর্তা রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী ছিলেন অতিশয় সজ্জন। সমাজসেবায় তাঁর উৎসাহ ছিল। যতদূর মনে পড়ে অপহৃতা নারীদের উদ্ধার করে একটি আশ্রমে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসীর মুখ আমার মনে পড়ে। নাম ভুলে গেছি। কলকাতা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী নতুন একটি বাড়ি বানিয়ে বাস করছিলেন আমার বাসভবনের অদূরে। গেলেই তাঁর কর্মজীবনের বিচিত্র সব কাহিনী শোনাতেন। দুটো কাহিনী আমার স্মরণে জ্বলজ্বল করছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন ভারতে এসে দিল্লীতে দরবার

করেন তখন নানা প্রদেশ থেকে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারদের আনিয়ে নিয়ে তাঁর নিরাপত্তার ভার দেওয়া হয়। লাহিড়ীকে সাজতে হয় মুসলমান খানসামা। তিনি খানা পরিবেশন করেন।

সেইসূত্রে সম্রাট সম্রাজ্ঞী ও তাঁদের পার্শ্বচরদের উপর নজর রাখেন। তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না যে সম্রাট একটু বেশী রকম মাখামাখি করছেন সম্রাজ্ঞীর সহচরী এক অভিজাত মহিলার সঙ্গ আর তা দেখে সম্রাজ্ঞীর নয়নে রোষ। আমি হেসে বলি, "তা কী করে সম্ভব? ওঁরা যে ওঁদের দেশের আদর্শ দম্পতী।" তিনিও হাসেন। ঝানু ডিটেকটিভ।

আরো আগে লাহিড়ী যখন আরো জুনিয়র অফিসার ছিলেন তখন তাঁকে যেতে হয়েছিল সদলবলে চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবদের যেখানে অধিষ্ঠান। যার অনুচর হয়ে গেছলেন তিনি তৎকালীন বেঙ্গলের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। সেকালে ও পদে আই. সি. এস.দের নিযুক্ত করা হতো। বলা বাহুল্য তিনি একজন ইউরোপীয়ান। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সরেজমিনে তদন্ত করতে —একজন নীল চাষীকে মারতে মারতে মেরে ফেলার অভিযোগ সত্য কি না। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদেরই অতিথি হয়ে মহাপ্রভু খানাপিনা ও খেলাধুলায় দিন সাতেক ফুঁকে দিলেন। রোজ পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে ডেকে পাঠাতেন, সারাদিন খাড়া করিয়ে রাখতেন, বেলাশেষে সাহেবদের রক্তচক্ষুর সামনে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন বা অধীনস্থদের দিয়ে করাতেন। তদন্ত একদিন সমাপ্ত হয়। বিদায়দিবসে নীলকর সাহেবদের কর্মচারীরা এসে লাহিড়ীর হাতে পাঁচটি না ক'টি মোহর ধরিয়ে দেন। তেমনি অন্যান্যদের মর্যাদা অনুসারে কম বেশী। তাঁরা নেবেন কি নেবেন না জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের মহাপ্রভু বলেন, "নেবে না কেন? নাও, নাও। আমার বিবেক অত ভঙ্গুর নয়।" রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেন নীলকর সাহেবরা নির্দোষ।

সাহেবরা সাহেবদের অতিথি হলে কী রকম রিপোর্ট দিতেন আমি নিজেই তার ভুক্তভোগী। বিষ্ণুপুরে মাত্র মাস ছয়েক ছিলুম। আরো অনেকদিন থাকতে পারতুম, কিন্তু ছুটির দরখাস্ত করে দিলুম। ছোট ছেলেটির বয়স তিন মাস, বড়োটির সওয়া দু'বছর। তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম পথে। মন বিষিয়ে দিয়েছিল কমিশনারের রিমার্ক। বাঁকুড়ায় পুলিশ সাহেবের অতিথি হয়ে তিনি একতরফা মন্তব্য করেন, "দি এস. ডি. ও. ইজ এনটায়ারলি রং।" কিন্তু এমনি আমার বরাত যে শাপে বর হয়। কুষ্টিয়ার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা পাই। তারপর রাজশাহীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলা। হাঁ, কুষ্টিয়া থেকেও আমার বিরুদ্ধে ডি. আই. জি. পুলিশের রিমার্ক যায়। ইনিও একজন ইংরেজ। কিন্তু চীফ সেক্রেটারী আমার পক্ষ নেন। তিনিও ইংরেজ। পরে এ রকম আরো একবার হয়েছে। বড়ো ইংরেজরা সুবিচার করেছেন। আরো

গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু লড়তে হয়েছে ফী বার।

কুষ্টিয়ায় থাকতে এক সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সাধু না বলে তাঁকে সাধক বলাই সঙ্গত, কারণ পরে শুনতে পাই তাঁর একজন প্রকৃতি ছিলেন। নামটি আমার মনে নেই, মুখটিও মনে পড়ে না। পরতেন তিনি গাঢ় রক্তবর্ণ কাষায় বস্ত্র। ধুতি ও উত্তরীয়। মাথায় গোল করে বাঁধা জটাজুট। গলায় বোধ হয় রুদ্রাক্ষের মালা। আমি ধরে নিয়েছিলুম তিনি শাক্ত। কিন্তু তাঁর কথাবার্তার বিষয় ছিল দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনী। "বাবা, শুনেছি কৃষ্ণ নাকি বাঁশী বাজাতেন। ভাবতুম, কেমন না জানি! একদিন শুনি বাঁশী বাজছে। আমারই নাভিপদ্মে!" তাঁর সব উক্তি এই চল্লিশ বছর পরে আমার মনে থাকার কথা নয়। একবার তিনি হাঁক দেন নিম্নতম চক্র থেকে। সে হাঁক পৌঁছয় শীর্ষতম চক্রে। ইনি যখনি শুভাগমন করতেন একটি ভাঁড়ে কিছু গাওয়া ঘি আনতেন। ঘরের গোরুর দুধ থেকে তৈরি। আমি বলতুম, "ঘি না নিলে আপনি ক্ষুন্ন হবেন, কিন্তু দাম না দিয়ে আমি কারো কাছ থেকে কিছু নিইনে। আপনারও তো আর্থিক প্রয়োজন থাকতে পারে।" তিনি দাম নেন, আমি ঘি নিই। ধর্ম আর অর্থ নিয়েই চলছিল, একদিন তিনি আমাকে অবাক করে দেন ইউনিয়ন বোর্ডের নমিনেশন চেয়ে। তখনকার দিনে ন'টি আসনের ছ'টি ছিল নির্বাচিত, তিনটি মনোনীত। সার্কল অফিসারকে ডেকে বলি, "নমিনেশনের তালিকা যখন পাঠাবেন তখন ওই লোকটির কথা বিবেচনা করবেন।" শোনা গেল সন্ন্যাসীর মতো হলেও সঙ্গে আছেন প্রকৃতি। আর আছে জমিজমা গোরু বাছুর। সার্কল অফিসার সুপারিশ করেন। আমি মনোনয়ন দিই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুমোদন করেন। নাম গেজেটে ছাপা হয়। বাঙালীর মতো লাগে না। কে জানে কোথাকার লোক কোথায় এসে আস্তানা গেড়ে বসেছেন। এখন ইউনিয়ন বোর্ডের নবরত্নের অন্যতম হলেই তাঁর মোক্ষ। প্রকৃতিকে ধরলে চতুর্বর্গ।

কুষ্টিয়ায় থাকতে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। বাবা থাকতেন ঢেঙ্কানালে। আমি তাঁকে দেখতে পেলুম না। তখনকার দিনে কায়স্থদের অশৌচ ছিল একমাস। ধুতি পরে চাদর গায়ে খালিপায়ে আপিসে যেতুম, আদালতে বসতুম। সাহেবসুবো এলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতুম। শ্রাদ্ধের পর ন্যাড়ামাথা নিয়ে যখন ঢেঙ্কানাল থেকে ফিরে আসি তখন একদিন বদলির হুকুম আসে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে অস্থায়ী নিযুক্তি। কৃষ্ণনগরে গিয়ে চার্জ বুঝে নিয়েই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয় বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনে। মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার বহু অংশ জলের তলায়। লঞ্চের জন্যে কলকাতায় লিখি। লঞ্চ আসে, উঠে দেখি খাজা নাজিমউদ্দীন ও খান বাহাদুর আজিজুল হক। পরে উভয়েই 'স্যার'।

নাজিমউদ্দীন সাহেব তখন গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলার। আর আজিজুল হক সাহেব শিক্ষামন্ত্রী। একজনের বাড়ি ঢাকায়। অপরজনের নদীয়া শান্তিপুরে। হক সাহেব খাজা সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের জেলা ঘুরিয়ে দেখাতে। কিন্তু সেটা বাহ্য। ভিতরে ভিতরে শলাপরামর্শ চলছিল সামনের বছর সাধারণ নির্বাচনে কে কে দাঁড়াবেন। প্রাদেশিক অটোনমি প্রবর্তিত হলে মন্ত্রী হবেন কে কে। প্রধানমন্ত্রী হবেন কোন্ ভাগ্যবান। খাজা সাহেব তখন থেকেই নার্ভাস। বলেন, "নির্বাচনে জয়লাভ যে কেমন অনিশ্চিত তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। প্রথম যেবার নির্বাচনে দাঁড়াই সেবার হেরে যাই।" নির্বাচন যেখানে অনিশ্চিত সেখানে মন্ত্রিত্ব তো আরো অনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রিত্ব? সে যে আকাশকুসুম। তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রিত্ব বলা হতো না। প্রধানমন্ত্রিত্ব পদ কাকে দেওয়া হবে না হবে এটা নির্বাচকদের রায়ের উপর নির্ভর করবে। গভর্নরের মনোনয়নের উপর নয়। পরে জানতে পারি যে স্যার জন অ্যান্ডারসন চেয়েছিলেন খাজা সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করতে ও তার জন্যে কাঠখড়ও পুড়িয়েছিলেন। অ্যান্ডারসনের শাসনকাল ফুরিয়ে যায়, আর নির্বাচনে ফজলুল হক নাজিমউদ্দীনকে হারিয়ে দেন। মুসলিম লীগের চেয়ে কৃষক প্রজা দলেরই ভোটসংখ্যা হয় বেশী। ইউরোপীয় গোষ্ঠী খাজা সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসাতে না পারলেও হোম মিনিস্টার পদে বসায়। সুহরাবর্দী সাহেব তাঁর দুটো আসন থেকে একটা নাজিমউদ্দীনকে ছেড়ে দেন। শিক্ষামন্ত্রীর পদ নিয়ে হক সাহেবও প্রকৃত ক্ষমতা ছেড়ে দেন তাঁর হোম মিনিস্টারকে। হরেদরে ইউরোপীয় গোষ্ঠীরই জয়। নতুন গভর্নর লর্ড ব্রেবোর্ন স্যার জন অ্যান্ডারসনের মতো অভিজ্ঞ শাসক ছিলেন না। চীফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, প্রাইভেট সেক্রেটারি মিলেই শাসনচক্র চালাতেন।

নাজিমউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত অমায়িক, অত্যন্ত সহৃদয়। প্রথম দর্শনেই আমাকে বলেন, "নওগাঁয় থাকতে আপনি যে সেণ্ট্রাল স্কুলের পরিকল্পনা করেছিলেন সরকার তা গ্রহণ করেছেন।" তিন বছর সময় লাগল সফল হতে। সব ভালো যার শেষ ভালো। শিক্ষাপ্রসঙ্গে আজিজুল হক সাহেবের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। সুযোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু খাজা সাহেবের মতো নিরহংকার নন। নির্বাচনের পরে সবাই মিলে এঁকে আইনসভার সভাপতি করে দেন। আজকাল যাঁকে বলে স্পীকার। মন্ত্রী হলেই তিনি আরো সুখী হতেন। কিন্তু হবেন কী করে? ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে তো মিতালি করেননি। করেছেন ভুল ব্যক্তির সঙ্গে। যাঁর কাছে সুহরাবর্দীর কদর আরো বেশী। আজিজুল হক সাহেবকে পরে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত করে বিলেত পাঠানো হয়। সেটা রাজনৈতিক পদ নয়। রাজনীতি থেকে তিনি বিদায় নেন।

পরবর্তীকালে যিনি পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি লঞ্চ থেকে নেমে চাষী মুসলমানদের দ্বারা ঘেরাও হন। পুলিশ সাহেব সুকুমার গুপ্ত ও আমি তাঁকে উদ্ধার করি। কমিউনিস্টদের প্রেরণায় বা কৃষক প্রজা দলের ইঙ্গিতে জমায়েৎ হয়েছিল তারা কতরকম স্লোগান ও দাবী নিয়ে। খাজা সাহেবকে আমরা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই। নাগরিকদের একটি সভায় আমি তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দিতে গেলে উল্টে তিনিই আমার সিগারেট ধরিয়ে দেন। বলেন, "বুঝতেই পারছি আপনি নতুন শিক্ষার্থী।" কথাটি ঠিক। এর পরে খাজা সাহেব যা করেন ক'জন তা করে। মহকুমা হাকিম ইয়াহিয়া সিরাজীর অসুখ শুনে তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যান তাঁকে দেখতে। যতদূর মনে পড়ে সিরাজী তখনো সার্কল অফিসারের বাসা ছাড়েননি। সেইখানেই শুয়ে আছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান, হাতীর মতো শরীর, কিন্তু শিশুর মতো সরল ও দিলখোলা মানুষ। আজিজুল হক সাহেব দিনমানে কোথায় ঘুরছিলেন জানিনে, সন্ধ্যাবেলা চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে খাজা সাহেবকে ট্রেনে তুলে দেবার সময় বলেন, "খোদা হাফেজ।" উত্তরে উনি বলেন, "খোদা হাফেজ।" দুজনের সঙ্গে দু'জনে কোলাকুলি করেন।

খাজা সাহেব আমার সঙ্গে ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলেন। আমার যেমন সিগারেট খেতে শেখা ওঁরও তেমনি বাংলা বলতে শেখা। নবাব ঘরানাদের মধ্যে বাংলাভাষার চল ছিল না। শুরু প্রাদেশিক অটোনমি প্রবর্তনের দৌলতে। ফজলুল হক সাহেব যে খাজা সাহেবকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দেন এর একটা বড় কারণ বরিশালী বাংলার উপর হক সাহেবের বাজীকরের মতো দখল। শিক্ষাটা খাজা পরিবারের মনে বসে। নদীয়া থেকে ছুটি নিয়ে আমি বদলী হই রাজশাহী জেলায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সফর করতে হয় ঢাকার নবাব বাহাদুরের সঙ্গে। অতি সুপুরুষ ছিলেন রাজা হাবিবুল্লাহ। ইংরেজীও বলতেন ভালো। ততদিনে মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা দলের কোলাকুলির সময় এসেছে। আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ নামে এক কৃষক প্রজা নেতা ছিলেন ঘোর জমিদারবিদ্বেষী। অথচ সাচ্চা মুসলমান। এখন তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান। নবাব বাহাদুরের সঙ্গে তর্কবাগীশ সাহেবের কোলাকুলি আমাকে হাসির খোরাক যোগায়। আরো হাসির খোরাক যোগায় নবাব বাহাদুরের বাংলা বক্তৃতা। সে যে কী বিচিত্র বুলি তা কী করে বোঝাব। শুনলে ঘোড়া হাসবে। গ্রামের জনসভা থেকে ফেরবার পথে নবাব শুধান, অবশ্য ইংরেজীতে, "আমার বাংলা কেমন লাগল?" পড়েছি মোগলের হাতে। বলতে হলো, "চমৎকার"। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলেন, "ভাষার জন্যে আমার একটা বিশেষ ন্যাক আছে। সেইজন্যে এত শীগগির শিখে নিতে পারি।"

॥ ছয় ॥

রাজসাহী আমার চেনা জেলা। নওগাঁয় থাকতে নাটোর হয়ে সদরে আসা-যাওয়া করেছি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবনটা ছিল যেমন নতুন তেমনি সুদৃশ্য। অতিথিরূপে সে বাড়িতে থেকেছি। এবার গৃহস্থ রূপে থাকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমার গৃহপ্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় আমার প্রথমা কন্যা। প্রথম পুত্রের জন্ম নওগাঁয়। রাজশাহী জেলার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অবিস্মরণীয়।

এবার আমার কার্যকাল মাত্র আট ন'মাসের। লঞ্চে করে পদ্মায় বেড়ানোর সাধ ছিল। সে সাধ মিটিয়েছি। সেই বিরাট নদীর চরের প্রজাদের সঙ্গে খাশমহলের অধিকর্তা হিসাবে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। ওরা একজন সাহেবের নাম করল, 'মার্কিন' সাহেব। মার্টিন সাহেবকে চিনতুম। লার্কিন সাহেবকেও জানতুম। 'মার্কিন' সাহেব কি মার্টিন, না লার্কিন? যাই হোক, 'মার্কিন' সাহেব ওদের জন্যে যা করেছিলেন ওরা তা মনে রেখেছিল। প্রজাদরদী পুরুষ ছিলেন মার্টিন। আমি তাঁকেই 'মার্কিন' বলে ধরে নিই।

আর একটি কৌতুককর ঘটনা মনে পড়ে। হঠাৎ লঞ্চ গিয়ে হাজির হয় এক থানার সামনে। দারোগা কোথায়? দুপুরবেলা তিনি খালি গায়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ছুটে গিয়ে ইউনিফর্ম বার করে পরেন। এরই নাম ডিউটি। সাহেবসুবো খবর দিয়ে গেলে ওঁদের ছিমছাম বেশ। নয়তো এই গরম দেশে সাধ করে জবরজং পোশাক পরে কে?

লঞ্চ ভ্রমণের সময় আরো একটি ঘটনা ঘটে। সেটি নিছক কৌতুকের নয়। গৃহিণীর জলতেষ্টা পায়। টেবিলের উপর জলে ভরা স্কোয়াশের বোতল সাজানো ছিল। তাদের একটি থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে তিনি ঢক ঢক করে পান করেন। সঙ্গে সঙ্গে গলা বুক পেট জ্বলে যায়। না, বিষ নয়। কেরোসিন। একই রকম বোতলে ছিল কেরোসিন আর জল। লঞ্চের খানসামা তা জানত না। ভুল করে টেবিলের উপর এনে সাজিয়েছে। চিহ্নিত না করে আমরাও ভুল করেছি। সেবারকার যাত্রা অযাত্রা।

সব চেয়ে স্মরণীয় সফর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রেলপথে ভ্রমণ। একদিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম আসে। টেলিগ্রামটা তাঁর কিংবা তাঁর সেক্রেটারির। আত্রাইঘাটে অমুক দিন অমুক সময় উপস্থিত হতে পারব কি? কবি সুখী হবেন। হাতের কাজ ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ মোটরে উঠে বসি। নাটোরে উত্তরগামী ট্রেন ধরি। ট্রেন থেকে নেমে দেখি কবি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে গেছেন পতিসর থেকে জলপথে। হাউসবোট থেকে নামেননি। এইবার নামবেন। স্টেশনের

থেকে কয়েক পা হেঁটে গেলেই নদী ও হাউসবোট। ঘাটে সারি সারি প্রজা দাঁড়িয়ে। ওরা এসেছে পদব্রজে পতিসর থেকে কবিকে বিদায় দিতে। জীবনে আর তাঁর দেখা পাবে না বলে ওদের চোখে জল। দাড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো মুসলমান। আমি ওদের ভিড় কাটিয়ে হাউসবোটে গিয়ে কবিকে প্রণাম করি। তারপর তাঁকে নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি। ফিরতি ট্রেনের দেরি ছিল। স্টেশন থেকে দুটি চেয়ার চেয়ে নিয়ে আমরা পাশাপাশি বসি। কবি বলেন, "বোটের সঙ্গে সঙ্গে ওরা সারাপথ পায়ে হেঁটে এসেছে। ওরা কী বলে জানো? বলে, পয়গম্বরকে তো আমরা চোখে দেখিনি। আপনাকেই দেখেছি।" বিদায় দিতে ও নিতে তাঁর একান্ত কষ্ট হচ্ছিল। এ জীবনে এই শেষ। কিছুক্ষণ পরে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসে। আমরা একসঙ্গে নাটোর পর্যন্ত ভ্রমণ করি। কামরায় আর কেউ ছিল না। কবিকে আমি আর কখনো একা পাইনি।

বহুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিচালনার দায় থেকে অবসর গ্রহণ করে বিশ্বভারতী সংগঠনের ভার কাঁধে তুলে নেন। প্রজারা দীর্ঘকাল তাঁর দর্শন পায়নি। তাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল শেষবারের মতো চাক্ষুষ করতে। তিনিও ব্যাকুল তাদের পুরোনো পরিচিত মুখগুলি দেখতে। কী গভীর ও প্রগাঢ় ছিল জমিদার ও প্রজা উভয়পক্ষের সম্বন্ধ। রাজশাহীতে থাকতেই আমি আবার ওইদিকে যাই। এবার হাতীর পিঠে চড়ে। রঘুরামপুর রেল স্টেশন থেকে পতিসর অভিমুখে। পথে এক জায়গায় সন্ধ্যা হয়। হাতী চায় পথের ধারে পুকুরে নামতে। ওটা হলো হাতীদের স্নানের সময়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রাজার হাতীশালার হাতীরা যেত চন্দন পুকুরে অবগাহন করতে। সেসব বিরাটকায় হাতী ধরা হয়ে আসত নিবিড় জঙ্গল থেকে। ধরবার জন্যে হাতীখেদা হতো। রাজশাহী জেলার জমিদারদের হাতী তার সঙ্গে লাগে না। সম্ভবত সোনপুরে মেলায় কেনা। তবু তারা হাতী ও তাদের মর্যাদায় জমিদারের মর্যাদা। এবার যার পিঠে চড়ি সেটি রাতোয়ালের আকন্দদের হাতী। 'আকন্দ' পদবী থেকে অনুমান হয় এঁরা আফগানিস্তানের 'আখুন্দ' বংশীয় পাঠান। কিন্তু আকবর আলী আকন্দকে দেখে কে বলবে ইনি চেহারায় চালচলনে কথাবার্তায় হাবভাবে ও সংস্কৃতিতে ষোল আনা বাঙালী নন!

হাতীর পিঠ থেকে নেমে আমি গাছতলায় চেয়ার পেতে বিশ্রাম করছি এমন সময় দেবনাথ মণ্ডল বলে ঠাকুরবাবুদের এক বৃদ্ধ প্রজা আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। লোকটিকে আমি দেখেছিলুম কলেকটরের এজলাশে বসে জমিদারি নীলাম করার সময়। দেবনাথ বলেন তিনি তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতা গিয়ে মহর্ষিকে দর্শন করেছিলেন। মহর্ষির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ আসেন মহাল পরিদর্শন করতে। যখনি আসতেন থাকতেন তিনি হাউসবোটে। প্রজারা ধরে নেয় এবার তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য মহর্ষির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে

ভেট সংগ্রহ। তারা সবাই গিয়ে বাবুমশাইকে দর্শন করে ও দর্শনী দেয়। বাবুমশায় বোট থেকে নামেন না, বোটে বসেই ভেট নেন। সেদিন তিনি কিছু বলেন না। পরের দিন প্রজাদের সবাইকে ডেকে পাঠান। বলেন, "আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি, চিন্তা করেছি। আমার বাবার শ্রাদ্ধ! আমি নেব তোদের কাছ থেকে দান! আমারই তো উচিত তোদের কিছু দেওয়া। নিয়ে যা, নিয়ে যা তোদের সব নজরানা। তোদের আমি নিমন্ত্রণ করছি। ভোজ দেব। আসিস্।" প্রজারা তো স্তম্ভিত। এমন জমিদারও আছে। দেবনাথ মণ্ডলের জবানবন্দী শুনে আমিও মুগ্ধ। এমন না হলে রবীন্দ্রনাথ!

রাতোয়াল আমার পথে পড়ে। না পড়লেও একবার আমি যেতুম। আকবরকে দেখতে। ওই যুবক জমিদারকে আমার বিশেষ ভাল লাগত। ওঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ নেই। কিন্তু এবার যা দেখি তাতে আমার চক্ষু স্থির। দেউড়ির দু'ধারে দুটো সিংহ ছিল। না, না, জীবন্ত সিংহ নয়। সিংহদ্বারের সিংহ। ওদের ভেঙে ফেলা হয়েছে, ওরা একটু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে! ওদের জায়গায় কী যেন বসানো হয়েছে, কিন্তু মূর্তি নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, "সিংহদ্বারে সিংহ নেই, এ কেমন কথা?" জবাব পাই, "মৌলবী সাহেবরা আপত্তি করলেন যে ওটা নাকি পৌত্তলিকতা। ওতে গুনাহ হয়।" শুনে আমি বুঝতে পারি যে জমানা বদলেছে। তার আর একটি নিদর্শন আরো কয়েকদিন পরে পাই। নাটোরের আশরাফ আলী চৌধুরী সাহেব কেবল জমিদার নন, উপরন্তু বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার। চারবছর আগে তাঁকে দেখেছি সাহেবী পোশাক পরতে। বাঙালীর মতো নাঙ্গা শির। এবার দেখি তাঁর মাথায় এক লাল রঙের ফেজ। পরনে শেরোয়ানী পায়জামা। কুশল প্রশ্ন করি, "কেমন আছেন, মিস্টার চৌধুরী?" তিনি শশব্যস্ত হয়ে মিনতি করে বলেন, "দয়া করে আমাকে আর 'চৌধুরী' বলবেন না। ওটা আমি বর্জন করেছি। এখন থেকে আমি শুধু আশরফ আলী।" তাজ্জব ব্যাপার! 'চৌধুরী' কবে থেকে হিন্দু পদবী হলো? ওঁদের বংশপদবী খান্ চৌধুরী। উনি 'খান'কেও বর্জন করেছেন। তা হলে তো আরো জটিল ব্যাপার। আমার সিদ্ধান্ত, কৃষক প্রজা আন্দোলনের মুসলমানদের শান্ত করার জন্যে তিনি জমিদারসুলভ পদবীগুলির মায়া কাটিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে মনস্থ করেছেন। জমিদারি বাঁচাতে হলে মুসলিম প্রজাদের চোখে সাচ্চা মুসলিম হতে হয়। আবার ভোট পেতে হলেও তাই।

সাম্প্রদায়িকতা কেবল মুসলমানদের মনে জেগেছে তা নয়। হিন্দুদের মনেও ঢেউ তুলেছে। এই সেদিন যারা সত্যাগ্রহ বা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মেতেছিল এখন দেখি তারাই সাম্প্রদায়িক বিবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত। কলেজের ছাত্র, যাদের কাছে নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যায়, তাদেরই স্বভাবে অন্ধতা। সারা দেশের

নাগরিকরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে কর দেয় তারই টাকায় তৈরি হয়েছে কলেজ ও কলেজ হস্টেল। হস্টেলের উপরে কারো সাম্প্রদায়িক স্বত্ব নেই। উপরে লেখা নেই এটা হিন্দু হস্টেল, ওটা মুসলমান হস্টেল। যেখানে লেখা ছিল, পাটনা কলেজের মিণ্টো হিন্দু ও মিণ্টো মহোমেডান হস্টেল, সেখানেও আমি দুই হস্টেলে থেকেছি। হিন্দু বলে মুসলমানরা আমাকে বাধা দেয়নি। বরং স্বাগত করেছে। নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু রাজশাহীতে দেখা গেল মুসলমান ছাত্ররা কায়ক্লেশে বাস করে একটিমাত্র দালানে, এক একখানা ঘরে চার-চারজন! আর হিন্দু ছাত্ররা জুড়ে আছে পাঁচ-পাঁচটা দালান। হয়তো এককালে তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচগুণ। এখন কিন্তু তিনগুণও নয়। একটা দালান তো বেবাক খালি পড়ে রয়েছে। সেখানে কেউ থাকতে রাজি নয়। বোধহয় ভূতের ভয়ে। বাকী চারটাতে যারা থাকে তারা এক একখানা ঘরে দু'জন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন করে।

পুনর্বণ্টন ছাড়া আর কী এর সমাধান? মুসলমানদের জন্যে সরকার আরো একটা দালান গড়ে দিতে রাজী হবেন কেন? সোজা মীমাংসা হচ্ছে হিন্দুদের অব্যবহৃত বা অব্যবহার্য সেই খালি দালানটা মুসলমানদের জন্যে বরাদ্দ করা। "না, তা কিছুতেই হতে পারে না, স্যার। ওরা আমাদের সরস্বতী পূজোর বাজনার আপত্তি করবে। ওরা আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে গো কোরবানী করবে।" এটা মগের মুলুক নয়, এখানে আইন আদালত আছে। তা ছাড়া গবর্নমেণ্ট পলিসিও এসব এড়ানো। আর আমরা তো আছি। ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ। আমরা এসব হতে দেব কেন? কিন্তু কে শোনে কার কথা! বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র হস্টেল।

একদিন রাত বারোটায় বিছানায় শুয়ে আছি, তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় হঠাৎ পুলিশ এসে উপস্থিত। চিঠি লিখেছেন পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট। বড়ো সাহেব এখন ট্যুরে। তিনি একা সামলাতে পারছেন না। আমি যদি স্বয়ং না যাই দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে মুসলমান ছাত্রদের ঝগড়া। শহরের মুসলমান জনতা জড়ো হয়েছে। তাদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। কিন্তু কতক্ষণ রুখতে পারবে? লোকবল যথেষ্ট নয়। গুলী চালাতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম চাই।

তখনকার দিনে টেলিফোন ছিল না। নইলে এস ডি ও সদরকে সে ভার দিতুম। কিন্তু তা হলেও কি আমার সুখে নিদ্রা হতো? একটি মুসলমানও যদি গুলীতে মরে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হতো আমাকেই। মুসলিম আক্রমণে একটি হিন্দুও যদি প্রাণ হারায় তা হলেও আমার রেহাই নেই। বিছানা ছেড়ে তৈরী হয়ে নিলুম। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছি, নিজে চালাতে শিখিনি। সিভিল সার্জনের গাড়ী ধার করে উঠে বসি। সঙ্গে বন্দুক থাকলে ভাল হয়।

রাস্তায় এক বন্দুকধারী পাহারাওয়ালাকে দেখে গাড়ীতে তুলে নিই। আমার এই নৈশ অভিযানের কারণটা গৃহিণীকে জানাইনে। শুধু বলি একটা কাজে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে।

কলেজ হস্টেলের সদর ফটকে তখন লোকারণ্য নয়, লোকজন বিরল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন শুনেই ওরা হাওয়া হয়ে গেছে। হিন্দু ছাত্রদের দালানে গিয়ে দেখি তারাও উধাও। কেবল একটিমাত্র হিন্দু ছাত্র সমানে কাঁদছে। "আমাকে কোথাও নিয়ে যান, একরাত্রের জন্যে আশ্রয় দিন।" আমি ওকে অভয় দিয়ে বলি, "তুমি এইখানেই থাকবে। তোমাকে আমরা প্রোটেকশন দেব।" আমারও রোখ চেপে গেছে যে আমি যতজন লাগে ততজন প্রহরী মোতায়েন করব। লাইন থেকে আনিয়ে নেব রিজার্ভ পুলিশ। তারপর মুসলমান ছাত্রদের হস্টেলে গিয়ে দেখি তারাও ভয় পেয়েছে। হিন্দু জনতাকে নয়, পুলিশকে। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা হিন্দু। আমি তাদেরও অভয় দিই। পুলিশ কাউকেই ধরবে না। তবে ক্যামপাসে থাকবে। শান্তিরক্ষার জন্যে। যাতে জনতা এসে অশান্তি না ঘটায়। যার যা নালিশ আছে তা কাল শোনা যাবে।

গোলমালটা সেদিনকার মতো থেমে যায়। দাঙ্গা আর বাধে না, রাজশাহীর লোক স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু মূল কারণটা তো হস্টেলের অসম বণ্টন। পুনর্বণ্টন আমার হাতে নয়। ডি. পি. আই. মিস্টার বটমলী আসেন। তিনি রিপোর্ট পাঠান। ফলাফল কী হয় জানবার আগেই আমি বদলী হয়ে যাই। হিন্দু ছাত্রদের আমি ফিরতে দেখিনি। রাজশাহীর সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন কিশোরীমোহন চৌধুরী। তিনি বলেন হিন্দুরা আর ওখানে ফিরবে না, ওদের জন্যে তিনি অন্য ব্যবস্থা করবেন। আমি বলি যে ওটা কোনো সমাধান নয়। ওটা অভিমান। ন্যায্য পুনর্বণ্টন প্রকৃত সমাধান। হিন্দু ছাত্রদের প্রোটেকশন দিতে সরকার বাধ্য। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদেরও সংখ্যানুপাতে বাসস্থান দিতে হবে।

ওদিকে মুসলমান ছাত্ররা গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবকে বুঝিয়েছে পুলিশের উৎপাতে মুসলমান ছাত্ররা সে রাত্রে ঘুমোতে পারেনি, পরেও টিকতে পারছে না। ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দু। হয় একজন মুসলমানকে তাঁর জায়গায় পাঠানো হোক, নয় একজন ইউরোপীয়ানকে। একজন ইউরোপীয়ান এসে আমার হাত থেকে ওদের উদ্ধার করেন।

॥ সাত ॥

"রাজশাহী পায় যেই চট্টগ্রাম যায় সেই।" বচনটা আমারই বানানো। আমিই রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা থেকে চট্টগ্রামে বদলী হই একবার ১৯৩৩ সালে।

আবার রাজশাহীর জেলা শাসক পদ থেকে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে বদলী হই ১৯৩৭ সালে। বদলীর হুকুম পেয়ে খুশি হইনি। কারণ চট্টগ্রাম শুধু পদ্মাপার নয়, মেঘনাপার। কলকাতা থেকে এতদূরে যে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনরা ভুলেও সেখানে যাবেন না। আমিও কি পারব ছুটিছাটায় কলকাতা আসতে? কে জানে কতকালের জন্যে নির্বাসন! আর সন্ত্রাসবাদের জের যদি এখনো চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি পাহারার জের, তা হলে তো প্রাণ হাতে করে বাঁচতে হবে।

কিন্তু যতবারই চট্টগ্রামে গেছি চোখ জুড়িয়ে গেছে। অবিভক্ত বাংলাদেশে দার্জিলিংএর পর ওই একটি মফঃস্বল জেলা ছিল যেটি চেয়ে নেবার মতো। আমি যে না চেয়েই পেয়েছি এটার মূল্য সে সময় বুঝতে পারিনি। পরে ভেবে দেখেছি ওটা একটা সৌভাগ্য। বিশেষত দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি বদলীকে আমি জীবনদেবতার আশীর্বাদ বলে মনের আঁচলে বেঁধে রেখেছি।

সেবার যখন চট্টগ্রামে যাই তখন আমাকে সপরিবারে মিলিটারি পরিবৃত হয়ে সারকিট হাউসে বাস করতে হয়। কে জানে কখন ওদের উপর গুলী বর্ষণ বা বোমা নিক্ষেপ হবে, আর ওরাও আগুনের ফোয়ারা খুলে দেবে। মাঝখান থেকে আমার ও আমার প্রিয়জনদের দশা হবে সঙ্গীন। সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হয়, নইলে বেয়োনেটধারী গুর্খা চ্যালেঞ্জ করবে। উত্তর দিতে হবে, "ফ্রেন্ড"। এবার আমাকে সে রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো না। কাচারি পাহাড়ের সঙ্গে জোড়া আরেক পাহাড়ের উপর আমার বাংলো। সেটার নাম ছিল টেম্পেস্ট হিল, অপরটার নাম ফেয়ারি হিল। আমার বাংলো থেকে আমি দুবেলা দেখতে পাই পূব দিকে রাঙ্গামাটি অঞ্চলের শৈলমালা, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, মধ্যিখানে বহমান কর্ণফুলী নদী। নাম যেমন সুন্দর, রূপ তেমনি সুন্দর। নিসর্গ চট্টগ্রামকে ভূস্বর্গ করেনি, তবে বাংলাদেশে অদ্বিতীয় করেছে। নদী আর সমুদ্র আর পর্বতের সমাবেশ আমাদের এই সমতল প্রদেশে আর কোথায়! যতবার চোখ মেলি ততবার ধন্যতা জানাই।

আমার জানা ছিল যে তেত্রিশ বছর বয়সে রাজশাহীর জেলা শাসকপদ আমার পাওনা নয়। সাধারণত ওখানে একজন সিনিয়র ইউরোপীয় সিভিলিয়ানকে পাঠানো হয়। যিনি বড়ো বড়ো জমিদারদের বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী, অথচ দরকার হলে শায়েস্তাকারী! একজনের কাছে অভিযোগ আসে যে অমুক জমিদার রিভলভার দেখিয়ে জেলাবোর্ডের সদস্যদের ভোট আদায় করছেন। তিনি জমিদারকে আমন্ত্রণ করে আদর আপ্যায়ন করেন, তারপর কথায় কথায় রিভলভারটা একবার পরীক্ষা করতে চান। "হুঁ। রিভলভারটা দেখছি বিগড়ে গেছে। আমার কাছে রেখে যান, আমি সারিয়ে দেব।" এই বলে সাহেব সেটি দেরাজে বন্ধ করেন। নির্বাচন পর্বের পর ফেরৎ দেন। শহরের পতিতাদের

উপরেও সেই লম্পট জমিদার জোরজুলুমে করতেন বলে অভিযোগ আসে। তখন তাঁকে আবার ডেকে এনে ধমক দিতে হয় যে তিনি যেন ছ'মাসের জন্যে শহর ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বসবাস করেন।

এমনিতেই আমার বদলী হতো, গ্রীষ্মের পর যখন সিনিয়র ইউরোপীয়ানরা বিলেত থেকে ফিরতেন। আমার ওটা গ্রীষ্মকালীন নিযুক্তি। তা হলেও আমার মনে একটা খটকা ছিল। ওই টেলিগ্রামটার জন্যে নয় তো? রাজশাহী কলেজের হস্টেল-প্রাঙ্গণে দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ঝগড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাইরে থেকে 'জনতা' আমদানী হয়েছিল। আর একটু হলেই দাঙ্গা বেধে যেত। সময়ে হস্তক্ষেপ করে আমরা সেটা নিবারণ করি। স্থায়ী সমাধানের জন্যে আলাপ আলোচনা চলছে এমন সময় হঠাৎ একদিন পোস্টমাস্টার মশায় আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যিনি শিক্ষামন্ত্রীও তিনি। মুসলিম হস্টেলের একটি ছাত্রকে তিনি সরাসরি টেলিগ্রাম করে যা বলেছেন তা পক্ষপাতিত্বমূলক। তাই বলে তো সেটা আটক করবার মতো নয়। যেসব কারণে টেলিগ্রাম আটক করতে পারা যেত দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পরোক্ষ সম্পর্ক তার একটা কারণ নয়। টেলিগ্রামটা আমি ফেরৎ দিয়ে বলি যথারীতি বিলি করতে। দিন কয়েক বাদে কলকাতার কাগজ খুলে দেখি—ওমা! সেই টেলিগ্রামের ফ্যাকসিমিলি ছাপা হয়েছে। হক সাহেব তর্জনগর্জন করেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারেন না কেন ওঁর তারবার্তায় মুসলিম ছাত্রদের উদ্দেশে লিখলেন "আমাদের বালকগণ"। হিন্দু ছাত্ররা তবে কাদের? কোন্ সরকারের? না তাদের কোনো মা বাপ নেই, তারা ভেসে এসেছে? এরপরে হয়তো একজন মুসলিম মস্তানের নামে টেলিগ্রাম আসবে। তাতে থাকবে "আমাদের যুবকগণ"। সরকারকে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম করতে গেলে কী হয় তার সূচনা ১৯৩৭ সালেই। পরিণাম ১৯৪৭ সালে।

রাজশাহীতে থাকতেই প্রাক্তন বিধানসভার এক মুসলিম সদস্যের মুখে শুনেছিলুম বিদায়কালীন এক পার্টিতে সার জন অ্যান্ডারসন নাকি প্রত্যেকটি মুসলিম এম এল এ'কে শুধান, "সামনের নির্বাচনে জিতলে প্রধানমন্ত্রী করবেন কাকে?" জবাবটাও তিনিই ধরিয়ে দেন, "খাজা সার নাজিমউদ্দীনকে।" কিন্তু এই ক্যানভাসিংকে বিপর্যস্ত করে দেয় কৃষক প্রজা পার্টির আশাতীত সাফল্য। আর সার নাজিমউদ্দীনের ভোটরণে পরাজয়। শেষে একটা রফা হয়। সার জন ততদিনে চলে গেছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন লর্ড ব্রেবোর্ন। কৃষক প্রজা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ কোনো একটা দলের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য। কিন্তু তখনো ভারতের অন্যত্র কংগ্রেস

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেনি, করবে কি করবে না তাই নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর পত্রালাপ দীর্ঘদিন ধরে চলে। কৃষক প্রজা পার্টি অধৈর্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গেই কোয়ালিশন করে। ভোটে যাঁকে তিনি হারিয়ে দিয়েছিলেন সেই সার নাজিমকে হক সাহেব তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর সেরা দফতরটি ছেড়ে দিয়ে নিজে নেন শিক্ষা দফতর। সার জন অ্যাণ্ডারসন যা চেয়েছিলেন তাই হয়, প্রশাসনটা থেকে যায় তাঁরই বিশ্বাসভাজন সহযোগীর হাতে। সার নাজিমই হন ইউরোপীয় হোম মেম্বারদের মনের মতো উত্তরাধিকারী। বাইরের লেবেলটা মুসলিম লীগ, ভিতরের পদার্থটা ইউরোপীয় আই. সি. এস। ঐভাবে একপ্রকার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। সাহেবরা নিশ্চিন্ত যে আর সন্ত্রাসবাদ হবে না। হবে না কলকাতা করপোরেশনের মতো কংগ্রেস রাজত্ব। ও দুটো আপদকে রুখতেই না ম্যাক-ডোনালডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে বাংলার হিন্দুদের পাওনার চেয়ে কম আসন দেওয়া।

মিস্টার পিনেল যখন রাজশাহীর জেলা শাসক ও আমি নওগাঁর মহকুমা শাসক তখনি তাঁর মুখে শুনেছিলুম, "ক্যালকাটা করপোরেশন যারা লুটেপুটে খাচ্ছে তাদের হাতেই পড়বে বেঙ্গলের রাজত্ব। কংগ্রেস এলে পরিণাম কী হবে ভেবে দেখেছেন?" কিন্তু কংগ্রেসকে ঠেকিয়ে রাখলেও হিন্দুদের বাদ দিয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা যায় না। মন্ত্রীমণ্ডলীতে নিতে হয় কয়েকজন নির্দলীয় হিন্দুকে। অর্থ দফতর দিতে হয় নলিনীরঞ্জন সরকারকে। ততদিনে তিনি আর 'বিগ ফাইভে'র একজন নন। কংগ্রেস থেকেও পৃথক। তাঁকে দিয়ে ইউরোপীয় আই. সি. এস. ফাইনান্স মেম্বারের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় না, সেদিক থেকে সত্যিকারের পরিবর্তন। যিনি যাই বলুন, নলিনীবাবু দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তবে তাঁর অর্থনীতি ছিল রক্ষণশীল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর খেদোক্তি। রাজশাহীতে থাকতে একবার আত্রাইঘাটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সেইখানেই তার পরের বার আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা। আত্রাইঘাটে সঙ্কটত্রাণের একটি কেন্দ্র ছিল। উত্তরবঙ্গের প্লাবনের সময় তার প্রতিষ্ঠা। আচার্যদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে এসে বিশ্রাম করতেন। তাঁর কুটিরের সীলিং থেকে ঝুলন্ত শিকের হাঁড়িকুড়িতে থাকত মুড়ি মুড়কি মোয়া ইত্যাদি খাবার। সেসব তো খেতে দিতেনই, উপরন্তু খাওয়াতেন কিল চড় চাপড়। আর হাসতেন এক বিটকেল হাসি, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। তিনি ছিলেন শিশুর মতো সরল। আত্রাইঘাটে তিনি ও আমি যখন ট্রেনের প্রতীক্ষায় তখন আমার পিঠে বসিয়ে দেন আচমকা এক কিল। বলেন, "দেখলি রে! দেশের জন্যে জেল খাটল কারা আর কংগ্রেসের টিকিট পেল কারা!" হ্যাঁ, তাঁর সঙ্কটত্রাণের কর্মীরাও সত্যাগ্রহ করে জেল খেটেছিলেন। একজন তো আমারই বিচারে। কিন্তু ভোটে জিতে আইনসভায় গিয়ে তাঁরা

করতেন কী ? পার্লামেন্টারি রাজনীতি তো তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। সত্যাগ্রহীরা সৈনিক। জেলই তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধবিরতির সময় তাঁরা গঠনকর্মে নিমগ্ন। আশ্রমই তাঁদের শিবির। বিপক্ষের শিবিরে থাকলেও আমি তাঁদের বন্ধু।

চট্টগ্রামে গিয়ে দেখি সন্ত্রাসবাদের নামগন্ধ নেই। দেখেশুনে কেউ বলবে না যে বছর কয়েক আগে সেখানে একদিনের জন্যে হলেও ব্রিটিশ শাসন রহিত হয়েছিল। আর বেশ কিছুকাল ধরে চলেছিল দুপক্ষের সংঘর্ষ। আর্মি ডাকতে হয়েছিল। বিদ্রোহ দমন করা খুব সহজ হয়নি। তার ফলে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। আমিও অনুভব করি যে চট্টগ্রামের ইউরোপীয় মহলে আমি একরকম একঘরে। কমিশনার সাহেব নাকি শুনে আঁতকে ওঠেন যে সাময়িকভাবে আমাকে জেলার ভার দেওয়া যেতে পারে। তখন অফিসিয়েট করছিলেন মিলিটারি থেকে আগত মেজর হাইড। তিনজন ইউরোপীয় আই. সি. এস. ম্যাজিস্ট্রেট মেদিনীপুরে নিহত হলে শূন্যতা পূরণের জন্যে দু'জন অবসরপ্রাপ্ত ইউরোপীয় সিভিলিয়ানের সঙ্গে একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসারকেও ম্যাজিস্ট্রেট বা অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছিল। হাইড তাঁদের তৃতীয়জন। চট্টগ্রামে ট্রেন থেকে নেমে দেখি স্বয়ং জেলা শাসক হাইড এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে। নিরভিমানী, নীরবকর্মী, অতি সজ্জন এই মানুষটির মধ্যে আমি বর্ণচেতনা লক্ষ করিনি। তিনি আর্মি ছাড়তে চাননি, কিন্তু তাঁর আস্ত রেজিমেন্টটাই ভেঙে দেওয়া হয়। তাঁর কেরিয়ার ব্যর্থ হয়। সিভিল সার্ভিসে তিনি বেখাপ। এর পর তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার করা হয়।

চট্টগ্রাম ছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সদর। সেই সূত্রে উচ্চতর পর্যায়ের রেলওয়ে অফিসারদের উপনিবেশ। গ্রীষ্মকালেও তেমন গরম নয়। রেলওয়ে পাহাড়ে গেলে দেখতে পাওয়া যেত কত জাতের বিদেশী গাছপালা ফুল ফল। অফিসাররা প্রায় সকলেই সাহেব। যে দু'চারজন ভারতীয়কে উচ্চতর পদে নেওয়া হয়েছিল তাঁরা আমারই মতো একঘরে। ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও একটা ইউরোপীয় ক্লাব ছিল। চট্টগ্রামেরটা ঢাকার মতো অতটা বর্ণান্ধ নয়। কালো মানুষদের সদস্য করে, তবে খুব কম। আমি পারমানেন্ট মেম্বার হতে চেষ্টাই করিনি। ভোটের উপর ছেড়ে দিলে কেউ না কেউ হয়তো ব্ল্যাকবল করত। সাময়িক সদস্য হই। মাঝে মাঝে যাই। প্রধানত সিনেমা দেখতে। আশ্চর্যের কথা, খেলোয়াড় সর্বত্র পূজ্যতে। খেলোয়াড় হলে সাদা কালোর ব্যবধান ঘুচে যায়। লক্ষ করি সিভিল সার্জন লেফটন্যান্ট কর্নেল কাপুর আই. এম. এস. কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও ব্রিজ টেবিলে জনপ্রিয়। আর টেনিস চ্যাম্পিয়ন পি. এল. মেহতা সর্বত্র স্বাগত। ক্লাবে গিয়ে আমার আলাপীর সংখ্যা বাড়েনি। কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না। আমার মতো সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা নগণ্য।

একশো বাইশটি সোপান অতিক্রম করে আমার সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। একবার নিচে নেমে আবার উপরে উঠতে আমারও তো কম কষ্ট হতো না। সামাজিকতার খাতিরে বাইরে যাওয়া আসা যেটুকু না করলে নয়। কাচারিটা ছিল সংলগ্ন পাহাড়ে। যেতে আসতে ওঠা নামা করতে হতো না। কাচারি আর বাংলো এই নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা। কিন্তু সুযোগ পেলেই আমি ট্যুরে বেরিয়ে পড়ি। ট্যুরের পক্ষে চট্টগ্রাম তেমন সুবিধের জেলা নয়। অন্তত তখনকার দিনে ছিল না। কর্ণফুলী দিয়ে যেতে হলে সরকারী লঞ্চের বরাত দিতে হয়। সমুদ্রপথে যেতে হলে বেসরকারী স্টীমারে জায়গা পেতে হয়। তবে সমুদ্রগামী একটা লঞ্চও ছিল আমাদের ব্যবহারের জন্যে। রিকুইজিশন করতে হয়। কমিশনার, কলেকটর, জজ প্রভৃতির সঙ্গে পালা করে। চট্টগ্রামে থাকতে আমি সমুদ্রপথে কক্সেস বাজার যাই। বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি বিউটি স্পট। যাতায়াতের ও যাত্রী-নিবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ পর্যটক তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেত না। শুনেছি বাংলাদেশ সরকার দেশবিদেশের যাত্রী আকর্ষণের জন্যে ইতিমধ্যেই পরিমিত ব্যবস্থা করেছেন। পরে আরো করবেন। মোটর তখন সেখানে ছিল না। থাকলে পৃথিবীর দীর্ঘতম সৈকতপথ মোটরে করে পরিভ্রমণ করতুম।

চট্টগ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশ ও বর্মার মাঝখানে একটা হাইফেন। তার দক্ষিণ অঞ্চলটাকেই বলা হতো মগের মুলুক। রাজা ছিলেন মগ। ধর্মের দিক থেকে বৌদ্ধ। সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দু। তাঁর রাজ্যের নাম ছিল রোশঙ্গ। রোশঙ্গ ও আরাকান মোটামুটি একার্থক। সম্প্রতি আরাকান থেকে যেসব শরণার্থী এসে চট্টগ্রামের সীমান্তে শিবির করেছে তাদের বলা হচ্ছে রোহিঙ্গিয়া বা রোহঙ্গিয়া। সেটা রোশঙ্গিয়ার উচ্চারণবিকৃতি। শ স্থানে হ। এখন ওদের অধিকাংশই মুসলমান হয়েছে, কিছু কিছু বৌদ্ধ রয়ে গেছে। হিন্দুও যে নেই তা নয়। স্বস্থান থেকে তাদের চলে আসতে হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের পুরাতন স্বস্থানেই। কারণ চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশও রোশঙ্গ বলে বিদিত ছিল। ওদের সমস্যাটা ধর্মীয় সমস্যা নয়। অর্থাৎ বৌদ্ধ বনাম মুসলিম নয়। জাতিগত ও সংস্কৃতিগত। ওরা কি জাতিগতভাবে বর্মী না বাঙালী? সংস্কৃতিগতভাবে বর্মীভাষী না বাংলাভাষী? বর্মা সরকার নাকি জেদ ধরেছেন যে ওদের বর্মী নাম ধারণ করতে হবে। এটা এমন কিছু নতুন দাবী নয়। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ বর্মা সিভিল সার্ভিসে ভর্তি হবার সময় একজন বাঙালী হিন্দুকেও নিতে হয়েছিল একটা বর্মী নাম। যুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ভারতে চলে এসে আবার হয়ে যান উপেন্দ্রলাল গোস্বামী। তিনি এখন ভারতীয় নাগরিক। বর্মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এটা ধর্মের প্রশ্ন নয়, নাগরিকত্বার প্রশ্ন। নাম পরিবর্তনে যারা নারাজ তাদের স্থান আরাকান নয়, বাংলাদেশ। আরাকানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন করতে হবে। সেটা কি তারা পারে? সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বা আরো আগে থেকে রোশঙ্গ তাদের মাতৃভূমি। সেইজন্যে তাদের তরফ থেকেও দাবী উঠেছে আরাকান বা রোশঙ্গ হবে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা অঙ্গরাজ্য। কতক লোক জল ঘোলা করছে এর মধ্যে ইসলামকে টেনে এনে। মুসলমানকে কেউ বৌদ্ধ হতে বলেনি, বাঙালীকে বলেছে বর্মী হতে। ধর্মে কেউ হস্তক্ষেপ করছে না, করছে আরবী নামকরণে। আরবী যদি হয় ইসলামের সঙ্গে অভিন্ন তবে ইন্দোনেশিয়ায় 'সুকর্ণ' কেন 'সুহর্ত' কেন? আমার চাপরাসী 'সুখলাল' কেন, 'বাদল' কেন? মাহবুবউল আলম সাহেবের নাপিত 'শ্রীমন্ত' কেন? সব চেয়ে বড়ো কথা আরাকান রাজসভার অমাত্য তথা কবি 'মাগন ঠাকুর' কেন?

একদিন আমাকে উপহার দেওয়া হয় আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ও এনামুল হক সাহেবদের যুগ্ম গবেষণা গ্রন্থ 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালী কবি'। আরাকান কেন আরকান হলো জানিনে, বোধহয় সেটা চাটগেঁয়ে উচ্চারণ। তার পুরোতন নাম ছিল রোশঙ্গ। সেখানে রাজত্ব করতেন সুধর্মা বলে এক বৌদ্ধ নৃপতি। তাঁর সভাকবি ছিলেন আলাওল, মাগন ঠাকুর ও দৌলত কাজী। আলাওলের কীর্তি 'পদ্মাবতী' অর্থাৎ পদ্মিনী উপাখ্যান। দৌলত কাজীর কাব্য 'সতী ময়না'। আর মাগন ঠাকুরের রচনাগুলির নাম ভুলে গেছি। রচনার উদ্ধৃতি থেকে বোঝা গেল এঁরা আরবী ফারসী মেশাতে চান না। আবশ্যক হলে সংস্কৃত ব্যবহার করেন। সমসাময়িক হিন্দু কবিদের সঙ্গেই তাঁদের মনের মিল। বিষয়ের মিল। মূল্যবোধের মিল। এটা হলো সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। রোশঙ্গ ছিল স্বাধীন রাজ্য। পরে শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা সেখানে আশ্রয় নেন ও মারা যান। কিন্তু সেটা আমাদের গ্রন্থকারদের আলোচ্য নয়।

এই বই পড়ে বুঝতে পারি চট্টগ্রামের কতক অংশ রোশঙ্গের সামিল ছিল। তথা আরাকানের। যতদূর মনে হয় কর্ণফুলীর দক্ষিণতীর থেকেই সে রাজ্যের সীমানা শুরু। হতেও পারে শঙ্খ অর্থাৎ সঙ্ক নদীর তীর থেকে। আরো দক্ষিণে কক্সেস বাজার। সংক্ষেপে কক্স বাজার। সেখানে গেলে বেশ একটা বর্মী আমেজ পাওয়া যায়। যারা বর্মী নয় তাদের পোশাকআশাক চালচলনও কতকটা বর্মীদের মতো। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদেরও উত্তরে এক রূপ, দক্ষিণে আরেক। উত্তরের বৌদ্ধরা বাংলার হিন্দুদের জ্ঞাতি। দক্ষিণের বৌদ্ধরা বর্মার বৌদ্ধদের জ্ঞাতি। 'মগ' কথাটা বৌদ্ধদের সকলের পছন্দ নয়। উত্তর দক্ষিণ নির্বিশেষে সকলের বেলা প্রয়োগ করতে শুনেছি। সাহেব মহলে মুসলামন বাবুর্চির চেয়ে মগ বাবুর্চির আদর বেশী। মাইনেও তেমনি। আমাদের এক মগ বাবুর্চি ছিল।

রাঁধিত যেমন অমৃত। কিন্তু রেগে গেলে আর রক্ষে নেই। লোকটি উত্তরেরই বৌদ্ধ। নাম পদবী আর পাঁচজন বড়ুয়ারই মতো।

মুলুকটা এককালে এ'দেরি ছিল। এ'রা যে কেমন উদার ছিলেন তার নিদর্শন আলাওল, মাগন ঠাকুর ও দৌলত কাজীর প্রতি রাজ অনুগ্রহ। তাঁদের সেসব পুঁথি তিন শতাব্দী ধরে নিখোঁজ ছিল। আবিষ্কার করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব। অপ্রচলিত থাকার একটা কারণ বৌদ্ধ রাজ-সভার ঔদার্য মুসলিম আমলে অদৃশ্য হয়ে যায়। অপর কারণ পুঁথিগুলি আরবী লিপিতে লিখিত। বোধ হয় নকল করার সময় বাংলা থেকে আরবীতে লিপ্যন্তরিত হয়। এমনও হতে পারে যে আরবী লিপিই ছিল পারসী ভাষার মতো বহুল প্রচলিত। সেটা তো ছাপাখানার যুগ নয়। পড়তেন যাঁরা তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর লোক।

কিন্তু এটাও আমার নজরে আসে যে চট্টগ্রামে বাংলা পুঁথি লেখার রেওয়াজ ছিল আরবী লিপিতে। চল্লিশ বছর পূর্বেও কেউ কেউ আরবী লিপিতে বাংলা লিখতেন। প্রকাশও করতেন। পাকিস্তান হাসিল করার পর তাঁরা আবদার ধরেন যে আরবী লিপিই হবে বাংলাভাষার সরকারী লিপি, যেমন উর্দুভাষাই হবে বাংলাভাষী প্যাকিস্তানীদের সরকারী ভাষা। আরবীর প্রতি এই আসক্তি কেবলমাত্র কোরানের জন্যে নয়। আবরদেশের সঙ্গে ইসলাম প্রবর্তনের পূর্ব হতেই চট্টগ্রামের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। কারো কারো মতে আরব বণিকরাই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে ইসলাম বহন করে আনেন। সেটা গৌড়বিজয়ের চেয়ে পুরাতন। চট্টগ্রামের বাঙালী মুসলমানদের এক আধজনের মুখ আরবদের মতো। এর থেকে মনে হয় আরবরা বহুপূর্বে বাণিজ্য করতে এসে বিয়েসাদী করে ও পুত্রকলত্র রেখে যায়। আরবী নামের প্রতি আসক্তিই হয়তো বর্মা থেকে বিতাড়িত রোহাঙ্গিয়াদের নিয়তি নির্ধারণ করবে। তারা আরাকান ফিরে যেতে না পেরে কক্সেস বাজারে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি করবে। রোশঙ্গ বলতে একসময় এসব অঞ্চলও বোঝাত।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবের নামই শুনেছিলুম, দর্শন লাভ করিনি। একদিন তিনি নিজেই সত্তর বছর বয়সে একশো বাইশটা সোপান অতিক্রম করে আমার বাংলোয় সশরীরে পদার্পণ করেন। যতদূর মনে পড়ে অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেব তাঁর সঙ্গে। আমার একটা সাহিত্যিক পরিচয় তো ছিল, সেইসূত্রে আলাপ। আমি তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা লিখি। চট্টগ্রামেরই একটি মাসিকপত্রে বা সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেদিন তিনি এসেছিলেন অন্য একটি উপলক্ষে। সাহিত্যিক পেনসনের জন্যে আমি কি তাঁর আবেদন সুপারিশ করতে পারি? সানন্দে। সশ্রদ্ধভাবে। কতকালের সাহিত্যসাধনা! কবিবর নবীনচন্দ্রই তাঁকে সারস্বত ব্রতে ব্রতী করেন। দেশভাগের পর কয়েকজন

পাকিস্তানী লেখক তাঁর কাছে আর্জি পেশ করেন, দেশ যখন ভাগ হয়েছে তখন সাহিত্যও ভাগ হবে। তিনি তাঁদের কথা শুনে অবাক হন। বলেন, যেটা অবিভাজ্য সেটা কেমন করে ভাগ হবে? সাহিত্যবিশারদ সাহেব তাঁর স্বমতে দৃঢ় থাকেন।

আবুল ফজল সাহেবের লেখা আমি আগেই পড়েছিলুম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল ওটি একজনের ছদ্মনাম। একদিন তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁর ও আমার সাহিত্যিক বন্ধু মাহবুবউল আলম সাহেব। সত্যিই তাঁর নাম আবুল ফজল। তাঁর ছোটগল্প আমার ভালো লাগে। আমি তাঁকে বলি খাঁটি চাটগেঁয়ে উপভাষায় লিখতে। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, কিন্তু ওই একটিবার। আর নয়। কারণ সে ভাষা দুর্বোধ্য। গল্পটির নাম 'রহস্যময়ী প্রকৃতি'।

'বুলবুল' পত্রিকায় 'মোমিনের জবানবন্দী' পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। সেই থেকে মাহবুবউল আলম আমার প্রিয় লেখক। একদিন তিনি এসে আলাপ করে যান। আবার যখন আসেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী। ইনি এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকগীতি সংগ্রাহক ছিলেন। নিজেও লিখতেন ব্যালাড জাতীয় কবিতা। এঁরা দুই বন্ধুতে মিলে 'পূরবী' বলে একটি মাসিকপত্র চালাতেন। তাতেও থাকত লোকগীতি সংগ্রহ। মাহবুব সাহেব একজন সরকারী কর্মচারী, সম্পাদক হতে পারেন না। সম্পাদক তাঁর ভাই ওয়াহিদউল আলম। ইনিও একজন লেখক, এঁর দাদা দিদারুল আলমও আরেকজন। মফঃস্বলের পত্রিকা হলেও 'পূরবী'র কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা মাটির সঙ্গে যোগ। মাহবুব সাহেবের লেখার মধ্যে একটা এলিমেণ্টাল ভাব ছিল। সেটা তাঁর চরিত্রগত। পড়াশুনা শেষ না করেই তিনি বাঙালী পলটনে নাম লেখান ও মেসোপটেমিয়ায় বন্দুক ঠেলেন। আশ্চর্যের কথা বাংলা চর্চা তাঁদের বংশে কেউ করেননি, তিনিই প্রথম। আরবী ফারসী উর্দুই ছিল বংশ-ধারা। অথচ তাঁর বাংলা শৈলী বিস্ময়কর। হাতের লেখাটিও তেমনি সুন্দর।

আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল আরো সরস। মাঝে মাঝে তিনি সামাজিক প্রসঙ্গ পাড়তেন। একদিন নিজের সম্বন্ধে বলেন, "আমার বিয়ে হয়েছে বৈদ্য পরিবারে। আগে তো আমি শ্বশুরবাড়ী গেলে জামাই আদর পেতুম। ইদানীং আমার সম্বন্ধীরা ধুয়ো ধরেছে যে ওরা বৈদ্যরা নাকি উচ্চ বর্ণ। এখন আর আমাদের কায়স্থদের সঙ্গে আদান প্রদান চলবে না। গেলে আমাকে আলাদা বসায়।" আমি দুঃখ প্রকাশ করলে তিনি বলেন, "আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী কিন্তু তেমনি স্নেহ করেন।" ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে কায়স্থ বৈদ্যের বিবাহ বহুকাল থেকে চলিত। হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহের ওটি একটি প্রাচীন নিদর্শন। ওড়িশায়ও আমি ওরকম প্রথা দেখেছি। আমার কবি বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক করণ, কিন্তু তাঁর মা ক্ষত্রিয়। এঁরা কেউ সমাজ-

সংস্কারক নন! দেশাচার লোকাচারের মধ্যেই অসবর্ণ বিবাহের নজীর ছিল।

প্রবর্তক সঙ্ঘের বঙ্কিমচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে আসতেন ও তাঁদের ওখানে যেতে অনুরোধ করতেন। তাঁদের আশ্রমও অপর একটি পাহাড়ের উপর। শহরের একপ্রান্তে। সেখানে তাঁরা ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে কর্মও করতেন। খাদি প্রভৃতি বিবিধ শিল্পকর্ম। বঙ্কিমবাবু রোগা ছিপছিপে মানুষ, কিন্তু তাঁর মুখে চোখে একপ্রকার আধ্যাত্মিক দীপ্তি। তাঁর সহকর্মী বীরেন্দ্রলাল চৌধুরীকে আমার তেমন স্পষ্ট স্মরণ নেই। যতদূর মনে পড়ে তিনি ছিলেন শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষ। দু'জনেই অবিবাহিত। চট্টগ্রাম থেকে আমার চলে আসার পরে আরো তেত্রিশ বছর ধরে এঁরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানবসেবা করে যান। শত্রু এঁদের কেউ ছিল না। এঁরা রাজনীতির বাইরে। কিন্তু এমনি এঁদের কপাল যে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বেধে যায়, মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী ফৌজের তাড়া খেয়ে প্রবর্তকের পাহাড়ে আত্মগোপন করে। ফলে প্রবর্তকের হিন্দুদের উপর পড়ে সন্দেহ। বাধ্য হয়ে আশ্রম খালি করে দিয়ে আশ্রমিকদের গ্রাম অঞ্চলে সরাতে হয়। কিন্তু কী মনে করে বীরেনবাবু ফিরে আসেন, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অনুচর। বলেন, 'যে আশ্রম আমরা প্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছি সে আশ্রম ছেড়ে আমরা কাপুরুষের মতো পালাব না। মরতে হয় এইখানেই মরব।" এর পরে কেউ তাঁদের জীবিত দেখেনি। দেখেছে শুধু কয়েকটি কঙ্কাল। বঙ্কিমবাবু ধীর স্থির দায়িত্বসম্পন্ন অধ্যক্ষ। তাঁর উপরে আশ্রম-কন্যাদের প্রাণরক্ষা ও সম্মান-রক্ষার দায়। তিনি ওদের নিয়ে যান সুদূর পল্লীতে। কিন্তু হানাদারদের খর্পর এড়ালেও তাদের দালালদের নজর এড়াবেন কী করে? একদিন পাকিস্তানীরা তাঁদের খুঁজে বার করে। অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলে বঙ্কিমবাবু গীতা কোলে নিয়ে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে বন্দুকের গুলীতে প্রাণ দেন। ন হি কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী সাহেবও মাঝে মাঝে উদয় হতেন। একদা তিনি কলকাতায় সম্পাদকতা করতেন। রাজনীতিতেও অংশ নিতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয় তখন তাঁর এতিমখানা অর্থাৎ অনাথ আশ্রম নিয়েই তিনি ব্যাপৃত। কৃষক প্রজা আন্দোলনের তিনিও ছিলেন একজন নেতা। কিন্তু আন্দোলন এখন পথভ্রষ্ট। তাঁর মতে ফজলুল হক সাহেব নাকি বাংলার র্যামজে ম্যাকডোনালড! প্রধানমন্ত্রী থাকার জন্যে ম্যাকডোনালড যেমন টোরিদের সঙ্গে হক সাহেব তেমনি নবাব নাজিমদের সঙ্গে ভিড়ে গেছেন। কৃষক প্রজা আন্দোলনে তখন ভাঁটা পড়েছে। জোয়ার এসেছে মুসলিম লীগে। মওলানা এখন নিরাবলম্ব। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা প্রবর্তকের পাহাড়ে। একা একা সূর্যাস্ত দেখছি, মনটা ছেয়ে গেছে বিষাদে। মওলানা সাহেব পাশে এসে দাঁড়ান। জানতে চান কী ভাবছি। বলি চেকদের দুর্ভাগ্যের

কথা। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের হিটলার ও মুসোলিনির সঙ্গে মিউনিক চুক্তি সম্পাদন করেছেন, চেকদের সঁপে দিয়েছেন নাৎসীদের কবলে। মওলানা বলেন, "নবমীতে বলিদান।" নবমী কি অষ্টমী ঠিক মনে পড়ছে না। তিনিও বিষণ্ণ।

চট্টগ্রাম এমন এক জেলা যেখানে বড়ো বড়ো জমিদার বলতে কেউ নেই, থাকলে তাঁরা কলকাতায়। ক্ষুদে জমিদারের সংখ্যা হাজার হাজার। আমার আপিসের কেরানীদেরও জমিদারী স্বত্ব ছিল। তাঁরাও সরকারকে রেভিনিউ যোগাতেন। হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের অনুপাত কম নয়। এমন জেলায় জমিদারবিরোধী আন্দোলন জমতে পারে না। মওলানা সাহেব তাই কৃষকপ্রজাদের দ্বারা পরিত্যক্ত। তাঁর মতো অনেকেই আবার ফিরে গেছেন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিবিরে। তিনি কিন্তু আর পিছু হটেননি। পার হয়ে এসেছেন সাম্প্রদায়িক আদিপর্ব, পার হয়ে এসেছেন শ্রেণীসামরিক মধ্যপর্ব, এখন জীবনের অন্তঃপর্বে তিনি তাঁর অনাথাশ্রমের অনাথদের মতো অনাথ।

ব্যারিস্টার আনোয়ারউল আজম ছিলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। সেই-সঙ্গে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। মেজর হাইড আর আমি একদিন তাঁর গৃহে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করি। আইনসভায় জিন্না সাহেব তাঁর দলপতি। দলটির পূর্ব পরিচয় ছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি। তাতে স্যার কোয়াসজী জাহাঙ্গীরের মতো পার্সীও ছিলেন। জিন্না সাহেব নাম পালটে দিয়ে মুসলিম লীগ পার্টি রাখেন। আজম সাহেব সেই দলে যোগ দেন। আইনসভার বাইরে যে বৃহত্তর মুসলিম লীগ তার প্রেসিডেণ্ট পদ তিনি ইতিমধ্যেই অধিকার করেছিলেন। তাঁর চেয়ে প্রখ্যাত যেসব মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন তাঁদের অবর্তমানে তিনিই একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিনায়ক। কিন্তু মুসলিম লীগের বাইরেও তো মুসলমানদের আরো কয়েকটি দল ছিল। যেমন কৃষক প্রজা দল, ইউনিয়নিস্ট দল, আহরার দল, খাকসার দল। জিন্না সাহেব এক কথায় তাদের উড়িয়ে দেন। তাঁর মতে মুসলীম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক দল। এই যে পরিবর্তনটা এটা ফজলুল হক মেনে নেননি, সিকন্দর হায়াৎ খান্ মেনে নেন নি, কিন্তু তাতে কী আসে যায়! আজম সাহেবের মতো ভক্তরা তো মেনে নিয়েছেন। আজম আমাদের বোঝান, "একমাত্র জিন্না সাহেবই পারেন গুড্স ডেলিভার করতে।" অর্থাৎ তিনি যাকে জিতিয়ে দিতে চাইবেন সেই জিতবে, তিনি যাকে পাইয়ে দিতে চাইবেন সেই পাবে। আমার তো বিশ্বাস হয় না যে জিন্নার এত প্রভাব। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলি কী করে? পড়েছি লীগপন্থীর হাতে, খানা খাচ্ছি তাঁর সাথে। মুখরোচক বহুবিধ পদের সঙ্গে এই পদটিও গলাধঃকরণ করতে হয়। তখন কি ভাবতে পেরেছি যে আজম একজন ভবিষ্যদ্বক্তা?

মোগলের সাথে খানা খাওয়া সেই প্রথম নয়। নদীয়ায় যখন জেলা শাসক

ছিলুম তখন সার নাজিমউদ্দীনের সঙ্গে লণ্ড-ভ্রমণ করি। বাংলার আইনসভার নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন, কিন্তু নির্বাচনে হার-জিৎ অনিশ্চিত। তাই তিনি তখন থেকেই নার্ভাস। আগেও একবার তিনি নির্বাচনে নেমেছিলেন। কিন্তু হেরে যান। সার নাজিম যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো। হক সাহেবের কাছে পরাজয়। কিন্তু ওদিকে জিন্না রয়েছেন গুডস ডেলিভার করতে। এদিকে সার জন অ্যাণ্ডারসনের যাঁরা ডান হাত সেইসব ইংরেজ আমলা। হককেও বঞ্চিত করে নাজিমকে না-হক পাওনা পাইয়ে দেওয়া হলো। একদিন তাঁর ভাই খাজা শাহাবউদ্দীন সাহেব দলীয় ব্যাপারে চট্টগ্রামে আসেন। ঢাকায় থাকতে তাঁর বেগমের সঙ্গে আমার পত্নীর মেলামেশা ছিল। সমাজসেবায় দু'জনেরই আগ্রহ। বেগম সাহেবা পর্দা মানতেন না। দু'একটি কথা আমার সঙ্গেও বলেছিলেন। চট্টগ্রামে খাজা শাহাবউদ্দীন একশো বাইশ ধাপ পেরিয়ে আমার বাংলোয় আসেন চা-পানের আমন্ত্রণে। মুসলিম অফিসারদের মুখে শুনেছি শাহাবউদ্দীনের নাকি হিন্দু মস্তিষ্ক। চাইলে তিনিও কি মন্ত্রী হতে পারতেন না? কিন্তু একই পরিবার থেকে তিনজন মন্ত্রী হলে লোকে বলবে কী? নবাব বাহাদুরও তো একজন মন্ত্রী। নবাবের সঙ্গে আমি খানা খাইনি বটে, কিন্তু মোটরে করে একসঙ্গে ট্যুর করেছি। সভা করেছি। নবাব যেমন সরল নাজিম তেমনি বুদ্ধিমান, শাহাব তেমনি তুখোড়। তিনিই মুসলিম লীগ পার্টির তথা কোয়ালিশনের নেপথ্য সূত্রধার। কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "হক সাহেব কেন যে ঘাবড়ান বুঝতে পারিনে। আমাদের আছে আরামদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা।" ভদ্র, বিনয়ী, মৃদুভাষী এই ধুরন্ধর যে একদিন হক সাহেবকেও চালমাৎ করবেন তা কল্পনা করতে পারিনি। পরিশেষে নিজেই চালমাৎ হন সুহরাবর্দী সাহেবের হাতে। মুসলিম লীগ যে খাজা পরিবারের কুক্ষিগত হবে এটা বোধ হয় দৈবনির্দিষ্ট। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন হয় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বাহাদুরের ভবনে। সেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জমায়েৎ হয়েছিলেন মহোমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের প্রতিনিধিবর্গ। কর্মসূচীতে রাজনীতির নামগন্ধ ছিল না। সম্মেলন সমাপ্ত হলে হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসে মুসলিম লীগ নামক একটি প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা সম্মেলন যেরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সেরূপ নয়। অথচ বিলিতী পত্রিকাগুলিতে সেইরূপ বলেই প্রচারিত হয়। সম্ভবত সরকারী যোগসাজসে।

শাহাবউদ্দীন যা বলেন তার থেকে বেশ বুঝতে পারি যে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে বিশ্বাস করেন। বাংলাদেশে সেটা কৃষক প্রজা দল ও মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু বিহারে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ইতিমধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করেছিল, পরে আর একটিও তাই

করে। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে না। আইনে অবশ্য বাধ্যবাধতকা ছিল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকেও মন্ত্রী নিতে হবে, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আর মুসলিম লীগ নামক দল একার্থক নয়। সুতরাং কংগ্রেস যদি মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম মন্ত্রী না নেয় তবে সেটা আইনবিরুদ্ধ নয়। তেমনি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ও কংগ্রেস একার্থক নয়। মুসলিম লীগ সমেত কৃষক প্রজা দল যদি কংগ্রেস থেকে মন্ত্রী না নেয় সেটাও আইনবিরুদ্ধ নয়। আইনের দিক থেকে বাংলাদেশেও ভুল হয়নি, বিহারে বা যুক্তপ্রদেশেও ভুল হয়নি। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে যেটা হলো সেটা কি ঠিক? মন্ত্রীমণ্ডলকে সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক করতে হলে আইনসভায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকাংশের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মন্ত্রী করতে হয়। তা বলে কংগ্রেস তার মুসলিম সহযোদ্ধাদের বাদ দিয়ে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে পারে না। দুঃখের দিনের সাথীদের সুখের দিনে ভুলতেও পারে না।

এর থেকে জিন্না সাহেব উপলব্ধি করেন যে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন যখন প্রবর্তিত হবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কংগ্রেস একাই সরকার গঠন করবে, আইন বাঁচাবার জন্যে দু'তিন জন মুসলমানকেও মন্ত্রী করবে, কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশের যারা আস্থাভাজন প্রতিনিধি তাদের নেবে না। নিতে বাধ্য নয়। আইনে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিষম ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান যে ভারত গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়, কিন্তু তা হলে তো বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকেও বিদায় দিয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন রদ করতে হয়। এর পর তিনি জেদ ধরেন যে সংখ্যালঘুদের হাতে ভীটো নামক একটি অস্ত্র ধরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেটাও তো বাংলাদেশে কংগ্রেসীরা ব্যবহার করতে পারে। শেষে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর মোক্ষম সূত্র। মুসলিম সম্প্রদায় আর মুসলিম লীগ হচ্ছে একই জিনিস। আইনে যেখানে বলছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকে মন্ত্রী নিতে হবে সেখানে তার মানে হবে মুসলিম লীগ থেকে মন্ত্রী নেওয়া বাধ্যতামূলক। তেমনি অন্যত্র কংগ্রেস থেকে মন্ত্রী নেওয়া। কংগ্রেস কিন্তু এ সূত্র মেনে নেয় না। ব্রিটিশ সরকারও না। জিন্না উপলব্ধি করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে যখন স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে তখন তাঁকে কেউ ডাকতে বাধ্য হবে না।

রাজশাহী থাকতে কলকাতা গিয়ে চৌরঙ্গীতে একটা স্যুটের অর্ডার দিই। ফিরপো থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের উপর মোটরের জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন জিন্না ও তাঁর তরুণী কন্যা। তাঁদের কণ্ঠে সম্বর্ধনার মালা, কিছু মালা হয়তো তাদের সম্বর্ধনাকারী বম্বেওয়ালা বণিকদের করে। পাগড়ী থেকে মালুম হয় বোহরা। খোজাও হতে পারে। কারণ জিন্না স্বয়ং ইসমাইলিয়া খোজা। মুসলমান হলেও হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা শাসিত। আর তাঁর নামও জিন্না নয়,

ঝীণা। গুজরাতী ভাষার শব্দ। তার মানে, ছোট। পিতৃনাম ঝীণাভাইকে তিনি পদবীতে পরিণত করেছিলেন। খোজানী পদবীকে বর্জন করেছিলেন। অর্থাৎ ঝীণাভাই খোজানীর 'ঝীণা'টুকুই রেখেছিলেন। আর তার ইংরেজী বানানটা এমন যে সহজে মনে হবে হয়তো বা আরবী। জিন্নার পরলোকগতা পত্নী ছিলেন পার্শী ধনকুবেরকন্যা রতনপ্রিয়া পেতিত। চট্টগ্রাম থেকে ছুটি নিয়ে যখন আমি বম্বে যাই তখন শুনি জিন্না সাহেবের নয়নের মণি সেই কন্যা এক পার্শী খ্রীষ্টান ধনকুবের নন্দনকে বিবাহ করে ইংলণ্ডে চলে গেছেন।

শাহাবউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আলাপের পর একদিন আজিজ আহমদ সাহেবের আগমন। সিভিল সার্ভিসে ইনি আমার এক বছরের জুনিয়র। বহরমপুরে আমার স্থান পান। সেইসঙ্গে আমার বাসস্থান। উঠতে উঠতে এখন বাংলা সরকারের কোনো এক বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। আমার চেয়ে অনেক লম্বা, গৌরবর্ণ, গম্ভীরপ্রকৃতির পাঞ্জাবী। চা খেতে খেতে বলেন, "আপনারা বাঙালীরা এমন ক্ল্যানিশ কেন? কলকাতায় আমি বাঙালী সিভিলিয়ানদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে কল করেছি। কিন্তু তাঁদের একজনও আমার কল রিটার্ন করেননি।" আমি তাঁদের হয়ে সাফাই দেবার চেষ্টা করি। দুঃখের বিষয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ওটাও একটা নালিশ। সাহেবদের বেলা আমাদের ব্যবহার নিখুঁত। কিন্তু স্বজাতির বেলা তেমন নয়। স্বজাতি বলতে হিন্দু মুসলমান দুই বোঝায়। জাতি আর সম্প্রদায় একার্থক নয়। যদিও এই বিভ্রান্তিটার উপরেই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। জাতি কথাটাকে লীগ ইংরেজীতে তর্জমা করে নেশন। মুসলিম নেশন। কংগ্রেসও তর্জমা করে। কিন্তু হিন্দু নেশন নয়, ইণ্ডিয়ান নেশন। যদিও হিন্দু নেশন বলে বিভ্রান্তির নজীর সৃষ্টি করে ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুরাই সকলের আগে।

কথায় কথায় আজিজ আহমদ বলেন, "সুহরাবর্দী? হী ইজ এ টাইগার ফর ওয়ার্ক।" কাজের বেলায় বাঘের মতো শক্তিমান। একাই একশো। সুহরাবর্দী ছিলেন অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র। আর নাজিমউদ্দীন কেমব্রিজের। তবে কৃতী কি না জানিনে। সুহরাবর্দী তাঁর যোগ্যতার জোরে কংগ্রেসেও একদা উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে তিনি হক-নাজিমকে হটিয়ে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু ঘটনার স্রোত তখন একটা এসপার কি ওসপারের দিকে ধাবমান। হয় কোয়ালিশন, নয় পার্টিশন। নোয়াখালীর উপদ্রবের পরে পার্টিশনের জন্যে মানুষের মন অধীর। কী মুসলমানের কী হিন্দুর। ইংরেজরাও যাবার জন্যে আকুল।

বারোজ তখন গভর্নর। তাঁর কথা যথাকালে বলব। আপাতত যে সময়ের কথা বলছিলুম সেই সময়ের কথা বলি। সার জন অ্যাণ্ডারসনের পরে বাংলার

গভর্নর হয়ে আসেন লর্ড ব্রেবোর্ন। কারমাইকেল, রোনল্ডশে, লীটনের পর ইনি চতুর্থ লর্ড উপাধীধারী লাট। বম্বেতে ইতিমধ্যেই ইনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশেও সমান জনপ্রিয় হন। তাঁর সাক্ষী ব্রেবোর্ন রোড। তাঁর পত্নীও মহিলাদের হৃদয় জয় করেন। লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ তার সাক্ষ্য দেয়। চট্টগ্রাম পরিভ্রমণে এসে এঁরা আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় হয়। দু'জনের সম্বন্ধেই এক কথায় বলা যায়—চার্মিং। যেমন রূপবত্তায়, তেমনি আদবকায়দায়, তেমনি কথাবার্তায়। লর্ড ও তাঁর লেডীর সঙ্গে ভোজন আর কখনো ঘটেনি। যাঁদের সঙ্গে ঘটেছে তাঁরা নাইট। সার স্ট্যানলি জ্যাকসন, সার জন অ্যাণ্ডারসন, সার ফ্রেডারিক বারোজ। কাজেই এটা একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। দুঃখের বিষয় লর্ড ব্রেবোর্ন এক বছর কি দু'বছর বাদে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। মনে পড়ে তাঁর মুখে একপ্রকার ক্লিষ্টতার ছাপ লক্ষ করেছিলুম।

গভর্নরের ডিনারে কিংবা উদ্যান পার্টিতে কিংবা দরবারে একজন আশ্চর্য মহিলাকে দেখি। মঙ 'রাজা' নানুমা। মঙ উপজাতির প্রথা, রাজার পুত্রসন্তান না থাকলে রাজকন্যাই হন উত্তরাধিকারী। এ প্রথা তো ইংরেজদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাদের রাজকন্যা হন 'কুইন'। 'কিং ভিক্টোরিয়া' বা 'কিং এলিজাবেথ' নন। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো উপজাতিশাসিত অঞ্চলের এই রাজকন্যা রানী নন, 'রাজা'। একালের চিত্রাঙ্গদা। তবে এঁর বসনভূষণ পুরুষের মতো নয়, নারীর মতোই। গভর্নর চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাবেন না বলে ইনি নিজের রাজ্য ছেড়ে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে চলে যান। আলাপ পরিচয় হয় না। কিংবা হয়ে থাকলে ক্ষণিকের জন্যে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তো যাচ্ছিনে, কৌতূহল মিটবে কী করে আর কবে? ভাগ্যক্রমে সুযোগ জুটে যায় কর্ণফুলী নদীর তীরে মহামুনি মেলায়। মহামুনি মানে বুদ্ধ। মেলা বসে বুদ্ধপূর্ণিমায়। বৌদ্ধরা আসেন চারদিক থেকে। মঙ রাজা নানুমা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন তাঁর বাঁশের মাচানের উপর খাড়া উঁচু আস্তানায়। বাংলায় কথা বলেন। চা খেতে দেন। স্নিগ্ধপ্রকৃতির মধ্যবয়সিনী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেখিনি, কিন্তু পার্বতীকে দেখেছি। মেজর হাইড তো শুনেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার পদে ফিরে গিয়ে সেই জেলাতেই থেকে যান ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে যাবার পরেও। পাকিস্তান সরকারও তাঁকে সেই পদে থাকতে দেন। কে একজন আমাকে বলেছিলেন যে মেজর হাইড এক পার্বতীকে বিয়ে করেন। পরে হাতীর পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পদদলিত হয়ে মারা যান। খবর দুটো যাঁর বেলা সত্য তিনি মেজর হাইড নন। পরবর্তী অন্য এক ইংরেজ অফিসার।

চট্টগ্রামের জেলা শাসক পদে এসেছিলেন মিস্টার ওয়াকার। রনি ওয়াকার বলে বন্ধুমহলে পরিচিত। হাইডের মতো ইনিও চিরকুমার। কাজকর্ম সেরে দিনে একবার গলফ্ খেলা চাই। হাসিখুশি দিলখোলা মানুষ। আমরা যেদিন চট্টগ্রাম ছাড়ি সেদিন নিজেই এসে আমাদের বিদায় দেন। প্রথমদিকে মিস্টার হজ ছিলেন কমিশনার। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, জেলা জজ ডক্টর ওয়েটও এসে যোগ দেন। আই. সি. এস.-দের মধ্যে ডক্টর উপাধি তখনকার দিনে আর কারো ছিল না। ইনি অস্ট্রিয়াতে অধ্যয়ন করে ইন্সব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে হজ আর ওয়েট উভয়েই আমাকে সতর্ক করে দেন যে ভারতের সমূহ ক্ষতি করবে প্রাদেশিকতা। আমি তর্ক করি যে ভারতের এক একটা প্রদেশ তা ইংলণ্ডে যাকে প্রভিন্স বলে তা নয়। তার চেয়ে অনেক বড়ো। দেশ বললেও চলে।

তখন ওয়েট বলেন, "ইউরোপে আমাদের আদর্শ ছিল খ্রীস্টেনডম। সারা ইউরোপ জুড়ে এক রাজ্য। এককে অনেক করে আমাদের কী দশা হয়েছে দেখছেন তো? মরছি যুদ্ধ করে। সেই ভুলটা আপনারাও যেন না করেন।"

দশ বছর বাদে ঝগড়াঝাটি করে ইউরোপেরই মতো খণ্ড খণ্ড হলো দেশ ও প্রদেশ। ডক্টর ওয়েট স্বদেশে ফিরে যান। শুনেছি সেখানে গিয়ে তিনি বিশপ হন। তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ যেটুকু পেয়েছি তার থেকে মনে হয়নি যে তিনি যাজক ব্রত গ্রহণ করবেন। না, বৃত্তি নয়। ক্ষতিপূরণ ও পেনসন বাবদ তাঁর যথেষ্ট সংস্থান ছিল। তবে চট্টগ্রামে থাকতে লক্ষ করেছি তাঁর স্ত্রী হেলপিং হ্যাণ্ড নামক একটি নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ আর তিনি তাঁর সহধর্মিণীর পাশেই থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির কুটিরশিল্পের স্টলে জজ সাহেবকেও দেখেছি বোধহয়। ধোঁয়াটেভাবে মনে পড়ে তিনি ছিলেন একজন ফ্রীমেসন। ইউরোপীয়রা ভারতভঙ্গ বা বঙ্গভঙ্গের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন, কিন্তু তাঁদের সরকারের পরোক্ষ দায়িত্ব অনস্বীকার্য। তেমনি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কংগ্রেসের ও লীগের।

কোটি কোটি মানুষের উপর মুষ্টিমেয় বিদেশী যদি প্রভুত্ব করতে চায় তবে তাদের ভেদনীতির আশ্রয় নিতে হবে, কেবল দণ্ডনীতিই যথেষ্ট নয়। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল সেই রোমান সাম্রাজ্যের দিন থেকে সাম্রাজ্যমাত্রেরই অবলম্বন। কিন্তু হিন্দু মুসলমানকে ইংরেজই একজোট হতে দিচ্ছে না সত্যটা এতই সরল? জিন্না সাহেবের অন্তরে যে আগুন জ্বলছিল সে আগুন ইংরেজ জ্বালিয়ে দেয়নি। তার ইতিহাস জানতে হলে অনেকখানি উজিয়ে যেতে হয়। আমার মনে আছে ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে আমার স্ত্রী যেদিন বিদেশ থেকে ফিরে আসেন সেদিন তাঁর সঙ্গে একই ট্রেনে ফেরেন শান্তিনিকেতনের কালীমোহন ঘোষ। খড়গপুর স্টেশনে গিয়ে আমি রিসিভ করি। ভারতীয়রা যেসময় লণ্ডনে রাউণ্ড

টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে যান সেসময় কালীমোহনদাও সেখানে ছিলেন। ভিতরের খবর রাখেন। আমি যখন জানতে চাই সে বৈঠক ব্যর্থ হলো কেন, কালীমোহনদা বলেন, "একজনের জন্যেই সব মাটি হয়। নইলে ইংরেজের সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যেত।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "কে সেই একজন ?"

"জিন্না। জিন্নাই যত নষ্টের গোড়া।" কালীমোহনদা আমাকে অবাক করে দেন। কিন্তু তাঁকে জেরা করবার আগেই তাঁর ট্রেন ছেড়ে দেয়। আমরা অন্য ট্রেনে উঠি।

তখন আমার বিশ্বাস হয়নি যে দেশের স্বরাজে দেশের এত বড়ো একজন নেতা অমন বাদ সাধতে পারেন। সেটা কি ইংরেজদের প্রেরণায় ? না, সত্যটা অত সরল নয়। তার জন্যে আরো অনেকদূর উজিয়ে যেতে হয়। জিন্নাই ছিলেন ১৯১৬ সালে কংগ্রেস লীগ চুক্তির স্থপতি। সেটা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আবশ্যিক শর্ত। সেই চুক্তি অনুসারে মুসলমানরা হিন্দুপ্রধান প্রদেশে ওয়েটেজ পায় আর হিন্দুরা ওয়েটেজ পায় মুসলিমপ্রধান প্রদেশে। জিন্না সাহেবের অভীষ্ট কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্যেও তেমনি এক আবশ্যিক শর্ত, তেমনি এক কংগ্রেস লীগ চুক্তি। ইতিমধ্যেই মুসলমানগণ কেন্দ্রীয় আইন সাহায্যে ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছিল। জিন্না চান আরো বেশি ওয়েটেজ। দাবিদার তো শুধু মুসলমানরা নয়, শিখরাও, ভারতীয় খ্রীষ্টানরাও, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও। সবাইকে মুক্তহস্তে ওয়েটেজ বিতরণ করতে করতে মেজরিটিই পরিণত হবে মাইনরিটিতে। হিন্দুরা কেন এই আত্মত্যাগে রাজী হবে, কংগ্রেস কেন এমন চুক্তিতে সই করবে, গান্ধীজী কেন এমন শর্তে স্বরাজ গ্রহণ করবেন ?

জিন্না যে দ্বিতীয়বার হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধানের স্থপতি হতে পারলেন না এর জন্যে তাঁর সমস্তটা ক্রোধ পড়ে গান্ধীজীর উপরে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, যখন মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট নির্বাচককেন্দ্রে কংগ্রেসও টিকিট দিয়ে প্রার্থী খাড়া করে ও বহুক্ষেত্রে মুসলিম লীগকে হারিয়ে দেয়। মুসলিমপ্রধান একটি প্রদেশে তো সরকার গঠন করে সবাইকে জানিয়ে দেয় যে একদিন না একদিন বাংলায়, পাঞ্জাবে ও সিন্ধুতেও কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারে। পরিশেষে কেন্দ্রেও। এর পেছনে ইংরেজের ভেদনীতি কোথায় ? বরঞ্চ বলা যেতে পারে কংগ্রেসের অভেদনীতি।

রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা জামাতা খাস্তগীর দম্পতী তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ করতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতেও আমরা গেছি ও সমাদর পেয়েছি। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যেমন সুশিক্ষিতা তেমনি সাহসিকা। শহরের পথেঘাটে নির্ভয়ে বেড়াত।

তখনকার দিনে সেটা কম কথা নয়। নারীপ্রগতির ঢেউ মুসলিম সমাজেও লেগেছিল। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের পর্দার বাইরে আসতে দেখা যেত না। ব্যতিক্রম হিসাবে দুটি পরিবারের কথা মনে আছে। সদর মহকুমা হাকিম ক্যাপটেন মোহসিন আলী বাঙালী। তাঁর স্ত্রী লখনউয়ের কন্যা, উর্দুভাষিণী। আমাদের সঙ্গে অসংকোচে মিশতেন। রেলওয়ে অফিসার মিস্টার সাকী পাঞ্জাবী। তাঁর স্ত্রী বাঙালী। জমিদারবংশীয়া, স্বয়ং জমিদার। ভয়ে ভয়ে মিশতেন। ভয়টা বোধ হয় সমাজের, স্বামীর ভয়েও হতে পারে।

চট্টগ্রাম থেকে ছুটি নিয়ে বিদায় নেবার সময় আমাদের পোষা হরিণটিকে নিয়ে ভাবনায় পড়ি। বার্কিং ডিয়ার। কে যেন বন থেকে এনে দেয়। ঘরের ভিতরে খুশিমতো ঘুরে বেড়ায়, আদর খায়। ছেলেমেয়েরা ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই ওকে? আমাদের গন্তব্য বম্বে মাদ্রাজ কলম্বো। তা হলে কি বনের প্রাণীকে বনে ফিরিয়ে দেব? দিলে কিন্তু নির্ঘাত মারা যাবে। নন্দনকাননে আমার সাহিত্যিক বন্ধু আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ি। তাঁর ছেলেদের সঙ্গে হরিণটির ভাব হয়ে যায়। তখন একদিন ওকে ওই বাড়িতেই দিয়ে আসি। এই অঙ্গীকারে যে, কেউ ওকে বধ করবে না। তিনি ওকে যত্ন করে রেখেছিলেন।

সেদিন ঢাকা থেকে বাংলাদেশের একজন অফিসার কলকাতা এসেছিলেন। বললেন উনিও চট্টগ্রামে এ. ডি. এম. ছিলেন ও সেই বাংলায় বাস করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, সেই তক্ষকটা কি এখনো আছে সেখানে? তিনি বলেন, "আছে। কিন্তু তক্ষক না ভূত তা কে জানে?" আমার স্ত্রী তা শুনে বলেন, "তক্ষক চট্টগ্রামে ছিল না, ছিল কুমিল্লায়।

॥ আট ॥

ছুটির পরে আবার বদলী। এবার চট্টগ্রাম-ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে। নামে দুই জেলার। কার্যত ত্রিপুরার। কুমিল্লায় স্থিতি।

আমার ধারণা ছিল শাসন বিভাগেই আমাকে রাখবে, তাই বিচার বিভাগে পাঠিয়েছে জেনে আঘাত পাই! কিন্তু এ আঘাত তো কিছুই নয়। দিনকয়েক পরে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু। পথের মাঝখানে ওকে বিসর্জন দিয়ে আমরা বাকী চারজন কুমিল্লায় যাই।

কুমিল্লাকে বলত সিটি অব ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ট্যাঙ্কস। একটি মফঃস্বল শহরে এতগুলি বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক আর বড়ো বড়ো পুকুর দেখা যায় না। ব্যাঙ্কগুলির সদর পরে কলকাতায় উঠে আসে। ঐক্যবন্ধ ব্যাঙ্ক ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্কদের অন্যতম হয়। কুমিল্লার লোকের বাহাদুরির তারিফ না করে পারিনে।

শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় দিন কাটে। বাড়ি থেকে আদালত পাঁচ মিনিটের পথ। আর একটু দূরে ক্লাব। সেখানে যেতে হয় টেনিস খেলতে। টেনিসের পরেই ফিরে আসি। অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্যে শাশ্বতের চিন্তা করি। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করি। সামাজিক জীবন বলতে যেটুকু না হলে নয়।

উকীল সরকার ছিলেন ভূধর হালদার। তাঁর সঙ্গে কথা বলে খানিকটা সান্ত্বনা পাই। আমারই মতো ভুক্তভোগী। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন, "এতদিন জানতুম যে মুসলমানরাই কমিউনাল। এখন দেখছি হিন্দুরাও তাই। দুই পক্ষই যদি সমান কমিউনাল হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে, মিস্টার রায়?" আমি ভয়ে শিউরে উঠি।

ইতিমধ্যেই হিন্দু মহাসভা ত্রিপুরা নোয়াখালী অঞ্চলে সক্রিয় হয়েছিল। একদিন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আসেন সেই সুবাদে। সিভিল সার্জন ক্যাপটেন নরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁকে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। আমাকেও। পাশাপাশি আসনে তিনি ও আমি মেঝের উপর বসি। আমার পুত্রবিয়োগের কথা শুনে শ্যামাপ্রসাদ ব্যথিত হন। মানুষটি পরদুঃখকাতর। তাঁর দরদের দ্বারা তিনি আমার হৃদয় জয় করেন।

কিন্তু এমন হৃদয়বান মানুষ কি শুধু হিন্দুদেরই ব্যথার ব্যথী হবেন? মুসলমানদের জন্যে কি তাঁর অন্তরে স্থান থাকবে না? আমি তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিলেন কেন?"

শ্যামাপ্রসাদ অকপটে স্বীকার করেন, "কংগ্রেসে আগে থেকে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কি আমাকে এত সহজে এত উচ্চে উঠতে দিতেন?" হিন্দু মহাসভায় গিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দলপতি হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতারা তাঁকে রাতারাতি উপরে উঠতে দিতেন না। তবে পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতে তাঁর যেমন যোগ্যতা, একবার কংগ্রেস টিকিটে আইনসভায় যেতে পারলেই তিনি নিজ-গুণে নিজের স্থান করে নিতেন। কিন্তু কংগ্রেস তো যে-কোনো দিন জেলযাত্রা করতে পারে। কে জানে কতকাল জেলে গিয়ে পচতে হবে। জেলে না গেলে কেউ কংগ্রেস নেতা হয় না। হিন্দু মহাসভাই সেদিক থেকে শ্রেয়। মুসলিম লীগও। কংগ্রেসের এ দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল অন্য পন্থা বেছে নিয়েছে।

মুসলমানদের আরো একটি দল ছিল। খাকসার। এরা পার্লামেণ্টারি রাজনীতির ধার ধারত না। সশস্ত্র সংঘর্ষই এদের মার্গ। কিন্তু কার সঙ্গে সংঘর্ষ? ইংরেজের সঙ্গে, না হিন্দুর সঙ্গে? এটা তখনো স্পষ্ট হয়নি। এরা বেলচা দিয়ে বন্দুকের সাধ মেটাত, আবার গঠনের কাজও করত।

অন্যতম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আখতার হামিদ খান্ ছিলেন খাকসার। বেলচা তাঁর হাতে দেখিনি। তা নইলে আর সব খাকসারের মতো। খাকসার অধিনায়ক ইনায়তুল্লা খান ওরফে আল্লামা মাশরকী ছিলেন এঁর শ্বশুর।

চাকরিতে ঢুকে যাঁরা চাকুরে হন ইনি তাঁদের একজন ছিলেন না। শরীরকে বলিষ্ঠ ও মেদহীন রাখার জন্যে নিত্য ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান, এক একদিন আমার বাড়িতে এসে ঘোড়াসমেত বারান্দায় ওঠেন। কী জানি কেন আমার উপর তাঁর বিশেষ টান ছিল। উনিও চরকা কাটতেন, খদ্দর পরতেন। স্ত্রীকে বলতেন চরকা কাটতে। ভিক্ষা চাইতে গেলে ভিক্ষা দেবার আগে চরকা কাটিয়ে নিতেন। জীবনযাত্রা গান্ধীজীর মতো।

"গান্ধী বলছেন কেন ? বলুন মহাত্মা গান্ধী !" তিনি আমার ভুল শুধরে দেন। গীতা পড়তে হলে একটি শ্লোক ভালো করে বুঝে হজম করে তারপরে আরেকটি শ্লোক যেন পড়ি। গড়গড় করে পড়ে গেলে শিক্ষা হয় না।

জোর দেন মেধার উপরে নয়, বিত্তের উপরে তো নয়ই, চরিত্রের উপরে। খাঁটি মানুষকে শ্রদ্ধা করেন, কে কোন্ সম্প্রদায়ের তা বিচার করেন না। আমাকে তো একদিন খুলেই বলেন, "আমরা আপনাকে ভালোবাসি।"

এমন যে আখতার তাঁর সঙ্গে আমার তর্কের বিরাম ছিল না দুটি বিষয়ে। প্রথমত, তিনি অহিংসা মানেন না। তাঁর পূর্বপুরুষরা দুর্ধর্ষ রোহিলা পাঠান। যুদ্ধবিগ্রহেই তাঁদের পৌরুষের পরীক্ষা। জেলে যাওয়া-টাওয়া কি তার বিকল্প হতে পারে ? নেতাদের মধ্যে তাঁর যাঁকে পছন্দ তিনি 'বোসবাবু'। মানে সুভাষচন্দ্র।

তারপর ন্যাশনালিজমেও তাঁর অবিশ্বাস। "আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন আমরা আপনাদের সঙ্গে একজাতি গঠন করব ? কী করে তা সম্ভব ? আমাদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য। আমাদের কবি হাফিজ, রুমী, সাদী। আমাদের বীর মাহদী। দেশ আমাদের কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা নয়, ধর্ম তার চেয়েও বড়ো কথা। আপনাদের কাছে ন্যাশনালিজম নতুন একটা ধর্ম। আমাদের কাছে তা নয়।"

তিনি যে সত্যিকার ধার্মিক এর পরিচয় তাঁর মতবাদে নয়, ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে। কেমব্রিজে যখন তিনি আই. সি. এস. শিক্ষানবিশ তখন হঠাৎ একদিন পনেরো মিনিটের নোটিশে তাঁকে অপারেশনের টেবিলে শোওয়ানো হয়। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। অপারেশনের পরে ডাক্তার তাঁকে বলেন, "আপনার তো বাঁচবার আশা ছিল না। আপনি বাঁচলেন কী করে !"

তিনি বলেন, "আল্লার কাছে আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি। প্রাণের মায়া রাখিনে। আমার শরীর যেন আমার নয়।" প্রতিরোধ নয়, অপ্রতিরোধ—তাঁর বিশ্বাস এটাই তাঁর প্রাণরক্ষার হেতু। এক ফকিরনী আমাকে গেয়ে শুনিয়েছিল, "তুমি রাখো মারো, আল্লা, তুমি রাখো মারো।" আল্লাই আখতারকে বাঁচান।

আখতার বলেন, "সেদিন থেকে আমি জানি যে আমার বাকী জীবনটা বাড়তি জীবন। নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যেই বাঁচা।"

পত্নীবিয়োগের পর আমার অন্তর্জীবনেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলছিল। নিজের জন্যে নয়, একটা কোনো ব্রতের জন্যে বাঁচা। যেমন দেশের স্বাধীনতা, শোষিতের শোষণমুক্তি। গান্ধীজীর সঙ্গেই আমার সবচেয়ে মিল, অথচ সব বিষয়ে নয়। আমি শিল্পী, আমি সারস্বত, আমি নিজের মতো করেই বাঁচতে চাই। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আমার আদর্শ। আবার তিনিও পুরোপুরি নন। টলস্টয় আমার অপর গুরু।

খান্ একদিন আমাকে বলেন, "আচ্ছা, আমাদের নেতা জিন্নাকে আপনাদের কাগজগুলো এত গালাগাল দেয় কেন? এটা কি ভালো হচ্ছে।"

"না, ভালো হচ্ছে না। সেই যে একটা কথা আছে, ফ্রম ওয়ার্ডস দে কেম টু ব্লোজ। গালাগালি থেকে তারা এল মারামারিতে।" আমি জিন্নার পক্ষেও কিছু বলি।

জিন্নাকে তিনি দেখতে পারতেন না, তবু নেতা বলে মানতেন। "মহাত্মা গান্ধী একজন ইন্সপায়ার্ড লীডার। জিন্না তেমন নন। নেহাৎ একজন পলিটিসিয়ান।"

ফজলে আহমদ করিম সেখানে অতিরিক্ত জেলাশাসক হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গেও আমার জমে ওঠে। তিনিও বলেন, "জিন্না আমাদের নেতা হবার যোগ্য নন। ওঁর উপরে আমরা সন্তুষ্ট নই। কিন্তু আর কেই বা আছে?" উত্তরের মুসলমানরা বম্বেওয়ালা মুসলমানকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন না। তবু নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের দলপতি জিন্না ব্যতীত আর কে হতে পারতেন?

গান্ধীজীর উপরে করিমের শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু শ্রদ্ধা এক কথা, আস্থা আরেক। ততদিনে কংগ্রেসের উপর থেকে, গান্ধীজীর উপর থেকে মুসলিম অফিসার শ্রেণীর আস্থা চলে গেছে। তাঁরা যেসব গুডস চান সেসব ডেলিভার করতে পারেন একমাত্র জিন্না।

করিমের পিতামহ ছিলেন উত্তর ভারতের একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। একদিন তিনি সবাইকে ডেকে বলেন, "আমি যদি সারাজীবন সত্যিই আল্লার অনুশাসন মেনে সৎপথে চলে থাকি তবে এই আমি তাঁকে প্রার্থনা করছি তিনি আমাকে গ্রহণ করুন।" এই বলে শুয়ে পড়ে চাদর মুড়ি দেন। কিছুক্ষণ পরে চাদর তুলে নিয়ে দেখা গেল তিনি কখন একসময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, কেউ টের পায়নি।

কংগ্রেসে তখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। 'বামপন্থী'দের মতে মন্ত্রীদের মতিগতি সুবিধের নয়। তাঁরা সরকারের সঙ্গে আপস করবেন। আরেক দফা

লড়বেন না। হাই কমান্ডও না বদলালে নয়। তার জন্যে চাই সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার সভাপতিত্ব। 'দক্ষিণপন্থী'দের মতে যা করবার তা করবেন গান্ধীজী। তাঁকে ডিঙিয়ে কে কী করতে পারে? কংগ্রেস সভাপতি তো গান্ধীজীর উপরে নন। আর হাই কমান্ড তো মহাত্মারই হাতে গড়া।

গান্ধীজীর অনিচ্ছাসত্ত্বে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হন। সেটা যে কেবল সীতারামাইয়ার নয়, মহাত্মারও পরাজয়, একথা শোনার পর বামপন্থীমহলের টনক নড়ে। কুমিল্লার পথে আমি যখন কটকে আমার এক বামপন্থী বন্ধু আমাকে বলেন, "এই বছরই যুদ্ধ বাধতে যাচ্ছে। কংগ্রেসের ঐক্য জরুরি। গান্ধীজীর নেতৃত্ব না হলেই নয়। সুভাষকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে।"

সুভাষচন্দ্রকে শুধু সভাপতি পদ নয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও ছাড়তে হয়। এতে কংগ্রেস আরো দুর্বল হয়। বাংলার কংগ্রেস তো মূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়েই যায়। ওদিকে লীগ বাংলায় শক্তি সঞ্চয় করছে। কৃষক প্রজা দলের সমর্থকরা লীগের দিকে ঝুঁকছে।

একদিন শোনা গেল ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। কিন্তু ওদেশে যুদ্ধ বেধে গেছে বলে যে এদেশের লোক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত তা নয়। পাঞ্জাবের সামরিক জাতির যুবকরাও যুদ্ধে নাম লেখাতে উৎসুক নয়। আবার যুদ্ধ বেধে গেছে বলে যে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা গণসত্যাগ্রহের জন্যে জনতা প্রস্তুত তাও নয়। "ইংলন্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ" এ ধ্বনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি তোলে না।

"তোমরা যুদ্ধে নেমেছ বেশ করেছ। কিন্তু আমাদেরও জড়াচ্ছ কেন? তোমরা জিতলেই বা আমাদের কী লাভ? তোমরা হারলেই বা আমাদের কী ক্ষতি? ভারত এ যুদ্ধে নেই।" সাধারণের মনের কথাটা হলো এইরকম। তবে সেটা মুখ ফুটে বলতে দিচ্ছে কে? ঢাক ঢোল পিটিয়ে জাহির করা হচ্ছে ভারতও এ যুদ্ধের শরিক, যেন সে স্বাধীনভাবে এত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কংগ্রেসের ভিতরেই দু'তিনরকম মত। একভাগের মত হলো, ভারতের সঙ্গে এইসময় একটা বোঝাপড়া করলেই ভারত স্বেচ্ছায় যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। জান, মাল, ধন উৎসর্গ করবে। বোঝাপড়া মানে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠন। তা যদি না হয় তবে কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা তো করবেই না, অসহযোগকে ধাপে ধাপে তুঙ্গে নিয়ে যাবে।

আরেকভাগের মত, আগে তো ওরা আমাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়া না দেওয়ার সিদ্ধান্তটা স্বাধীনভাবে নিতে দিক। যোগ দেবই এমন একটা কমিটমেন্ট এখন থেকেই করা কেন? তাই যদি করলুম তো যোগদানের স্বাধীনতাটা নামেই।

প্রকৃত স্বাধীনতা হচ্ছে যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার স্বাধীনতা। শর্তাধীন জাতীয় সরকার নিয়ে কী হবে? চাই বিনা শর্তে জাতীয় সরকার।

জবাহরলালজী ইউরোপে গিয়ে এখানে ওখানে কমিটমেণ্ট করে এসেছিলেন যে ভারত হিটলারের বিরুদ্ধে অসিধারণ করবেই। মানবজাতির মহাশত্রু নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট। তবে ভারত নিজেই তো তখন সাম্রাজ্যবাদের কবলে। তাকে যেন কবল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আর হাই কমাণ্ডের ছিল আরেক রকম কমিটমেণ্ট। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে মন্ত্রীদের অগণ্য শত্রু। তাঁদের টিকিয়ে রাখতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারেও মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের সুযোগ লাভ করতে হয়। নয়তো সেই ইস্যুতে মন্ত্রীদের পদত্যাগই প্রশস্ত। কেন্দ্রে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে দিতে ইংরেজ রাজী হবে কেন, কংগ্রেস যদি যুদ্ধে সহযোগিতার অঙ্গীকার না দেয়? ইংরেজ রাজী হলে কংগ্রেসও কমিটেড।

গান্ধীজীর মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধ জিনিসটাই তিনি সমর্থন করেন না, এই যুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। ইংরেজকে তিনি সহানুভূতি দেবেন, সে যদি স্বেচ্ছায় ভারতের ভার ভারতীয়দের উপর ছেড়ে দেয় তা হলে তাকে নৈতিক সমর্থন দেবেন, কিন্তু মানুষ, মাল, ধন তিনি দেবেন না। জোর করে নিলে প্রতিরোধ করবেন। সোজা কথায়, ভারত এ যুদ্ধে নেই। স্বাধীনতা পেলেও সহযোগিতা করবে না। বরং চেষ্টা করবে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। যুদ্ধ নয়, শান্তিই ভারতের লক্ষ্য। স্বাধীনতা চাই শান্তির জন্যে।

গান্ধীজী এমন কোনো নির্দেশ দেননি যে কেন্দ্রে কংগ্রেসকে স্থান না দিলে কংগ্রেস তার মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলবে। কংগ্রেস সে সিদ্ধান্ত নিজের দায়িত্বেই গ্রহণ করে। তখন গান্ধীজী বলেন, "একটা দিনও দেরি হয়নি।"

ওদিকে জিন্না সাহেব যা চেয়েছিলেন তা কংগ্রেস মন্ত্রীদের বিদায় নয়, কংগ্রেস মুসলিমদের বিদায়, কংগ্রেসের হিন্দু মূর্তিধারণ ও যুদ্ধে সহযোগ। কংগ্রেস মুসলিম মন্ত্রীদের শূন্যতা লীগ মন্ত্রীরা পূরণ করতেন। আর বড়লাটের শাসন-পরিষদের আমূল পরিবর্তন? সেটা হলে তো ভালোই হয়, কিন্তু সেখানে যেন কোনো কংগ্রেস মুসলিমের ঠাঁই না হয়। নইলে অসহযোগ। তার মানে মুসলমানরা রংরুট হবে না। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে ভারতীয় সৈন্যদের শতকরা চল্লিশজনই মুসলমান।

রংরুট করার ভারটা পড়েছিল প্রধানত পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট সরকারের উপরে। তাঁরা বিনাশর্তে সহযোগী। তাঁরা জমিদারশ্রেণীর বড়লোক। তাঁদের প্রজারা যুদ্ধে গিয়ে দেশে টাকা পাঠালে সে টাকায় তাঁরাও লাভ হবেন। তাঁদের দালালরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মুসলমানদের বলে, "পাকিস্তান কি অমনি পাবে? হিন্দুদের সঙ্গে শিখদের সঙ্গে লড়তে হবে না? লড়তে হলে হাতিয়ার চাই।

কোথায় পাবে হাতিয়ার? যুদ্ধে নাম লেখাও, হাতিয়ার হাতে আসবে।" শিখদের বলে, "দেখছ কী, সরদার ভাই, মুসলমানরা তো রংরুট হয়ে হাতিয়ার হাতে নিতে চলল। শেষে তাই দিয়ে পাকিস্তান হাসিল করবে। শিখ রাজত্ব ফিরে পেতে চাও তো যুদ্ধে নাম লেখাও।" হিন্দুদের বলে, "তোমরা কি মুসলমানদের সঙ্গে, শিখদের সঙ্গে খালি হাতে লড়বে? হাতিয়ার হাতে পেলে ওরাই একদিন লড়কে নেবে পাকিস্তান। লড়কে নেবে পাঞ্জাব। রাজ্য চাও তো যুদ্ধে যাও।"

ব্রিটিশ রাজ্যের অস্ত্রের অভাব ছিল না। রংরুটের অভাব হলো না। অভাব হবে মালের আর ধনের। ধন আসবে মুদ্রাস্ফীতি করে। আর মাল আসবে ভারতীয় শিল্পপতিদের মোটা মুনাফার অর্ডার দিয়ে। তাঁরা সবাই বিনাশর্তে সহযোগী। কংগ্রেস বা লীগ যদি সহযোগিতা না করে তা হলে এমন কী অসুবিধে দেখা দেবে যে তারই ভয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে? বড়লাট জানিয়ে দেন যে আমূল পরিবর্তনের সময় আসবে যুদ্ধের পরে, আপাতত যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটবে।

ছুটিতে আমি বম্বে ও মাদ্রাজের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলুম। তাঁদের সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁদের জনহিতকর পলিসি তাঁরা ভিন্ন আর কারা রূপায়িত করবেন? এই যেমন মাদকবর্জন। লাটসাহেবরা ও তাঁদের পরামর্শদাতারা কেন কংগ্রেসী নীতি রূপায়ন করতে গিয়ে রাজস্ব খোয়াবেন? বিশেষত যুদ্ধের সময়, যখন টাকার টানাটানি। কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে বামপন্থীরা পুলকিত হন। জিন্না সাহেব তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে 'নিষ্কৃতি দিবস' ঘোষণা করেন। হিটলারের হাত থেকে নয়, ইংরেজের হাত থেকে নয়, হিন্দু রাজত্বের হাত থেকে। এর পরে শাসাতে থাকেন যে কংগ্রেসকে তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসতে দেবেন না, যদি না সে তাঁর সঙ্গে মিটমাট করে। যেন তিনিই মালিক, বড়লাট কেউ নন।

"আপনারা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন?" মুচকি হেসে প্রশ্ন করেন আখতার। "আমাদের সঙ্গে মিটমাট করে থেকে গেলেই পারতেন।"

"আপনারা" এখানে "কংগ্রেসওয়ালারা"। "আমরা" লীগওয়ালারা। আখতার যদিও মুসলিম লীগের নন, খাকসার সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম।

"লীগের সঙ্গে মিটমাট করতে হলে কংগ্রেসকে হিন্দু মহাসভায় পরিণত করতে হয়। কংগ্রেস ভারতীয় স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামশীল, হিন্দু রাজত্বের জন্যে নয়। লীগ যদি এটা মেনে না নেয় তো কংগ্রেসকে একক দায়িত্বে যা করবার তা করতে হবে। কখনো মন্ত্রিত্বগ্রহণ, কখনো মন্ত্রিত্বত্যাগ, কখনো জেলযাত্রা। লীগের সঙ্গে মিটমাট করলে পরে লীগ কি কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে মন্ত্রিত্ব-ত্যাগ করবে, পায়ে পা মিলিয়ে জেলে যাবে? দেশের স্বাধীনতার জন্যে

কতবার যে এর দরকার হবে কে জানে ! জিন্না সাহেব হয়তো মনে করেন না যে দরকার হবে। কিন্তু মওলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আবদুল গফফার খান্—এঁরা তো মনে করেন। এঁরা কি মুসলমান নন ? লীগ একাই সব মুসলমানের প্রতিনিধি এটা মেনে নিলে এঁদের মতো সহযোদ্ধাদের হারাতে হয়। তাতে ব্রিটিশ রাজ্যের মুঠো শক্ত হতে পারে। ভারতীয় প্রজাদের নয়।" আমি বুঝিয়ে বলি।

মুসলমানদের মনের ভিতরে একটা মন্থন চলছিল। ব্রিটিশ রাজ কি যুদ্ধের চাপ সামলাতে পারবে ? তার উপরে যদি চাপ দেয়, কংগ্রেসের সংগ্রাম তো কেন্দ্রীয় সরকারে আমূল পরিবর্তন অনিবার্য। মুসলিম লীগ যদি বাধা দিতে যায় তো নিজেই ভেসে যাবে। হয় তাকে কংগ্রেসের শর্তে রাজী হয়ে কোয়ালিশন করতে হবে, নয় তাকে অপোজিশনে থাকতে হবে কংগ্রেস যতদিন প্রবল। তার চেয়ে দুই কেন্দ্র ভালো নয় কি ? হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামে দুই রাষ্ট্র ! ব্রিটিশ রাজ্যের দুই উত্তরাধিকারী ! দুই শরিকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা !

ওদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট গড়ে উঠছে। তাতে যাঁরা যোগ দিচ্ছেন তাঁরা ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়। ইণ্ডিয়ান আর্মিতেও দরাজভাবে ইণ্ডিয়ান নেওয়া হচ্ছে। কারা সামরিক জাতি, কারা নয় এ ভেদ মুছে যাচ্ছে। রণক্ষেত্রের মতো ইংরেজে ভারতীয়ে হিন্দুতে মুসলমানে পাঞ্জাবীতে বাঙালীতে কোলাকুলির শ্রীক্ষেত্র আর কোথায় ? গোলাগুলির কোলাহলেই নানা বর্ণের নানা ধর্মের কনসার্ট জমে ওঠে। অনায়াসেই কমিশন পাওয়া যাচ্ছে দেখে বহু যুবক যুদ্ধে নাম লেখায়। কার নামে ? নেশনের নামে। কোন্ নেশন ? ইণ্ডিয়ান নেশন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে যুদ্ধের প্রয়োজনে আমরা যে ঐতিহাসিক লগ্নে এক নেশন রূপে ইংরেজ ফরাসীদের দ্বারা স্বীকৃত হচ্ছি, এমন কি জার্মান ইটালিয়ানদের দ্বারাও, ঠিক সেই লগ্নেই মিলনের সানাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজছে বিচ্ছেদের বাদ্য। জিন্না সাহেব স্বীকার করেন না যে আমরা এক নেশন। তিনি বলেন দুই নেশন। মুসলিম লীগও সেই গৎ ধরেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট ছিল না। যুদ্ধে যারা যেত তাঁরা রাজার নামে যেত, দেশের নামে নয়। সেই কারণে বাঙালী পলটন গঠনের সময় বাংলার নেতাদের কারো কারো আপত্তি ছিল। একদল যদি বলেন, রণশিক্ষার এই সুযোগ হেলায় হারাতে নেই, আরেক দল বলেন, রাজার জন্যে প্রাণ দেব কেন, দিলে দেশের জন্যে দেব। ইংরেজ তার রাজার জন্যে দিতে পারে, তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার যিনি রাজা তিনি আমাদের সম্রাট, আমাদের বিজেতা। তিনি হলেন সাম্রাজ্যের প্রতীক, স্বরাজ্যের নয়।

সিভিল সার্জন ক্যাপটেন ঘোষ ছিলেন সেবারকার যুদ্ধফের্তা। একদিন

কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "ফ্রন্টে যাবার সময় ভয়ে আমার সারারাত ঘুম হয়নি। কিন্তু একবার যখন ফ্রন্টে গিয়ে পড়ি তখন দেখি ভয় বলে কোনো পদার্থই নেই। কয়েক হাত দূরেই শেল ফাটছে, মানুষ মরছে, আমি কিন্তু অকুতোভয়। কোথা থেকে এল এ সাহস? আমার স্বভাব থেকে নয়। পরিস্থিতি থেকেই। যুদ্ধক্ষেত্র এমন এক জায়গা যেখানে কাপুরুষও বীরপুরুষ বনে যায়। যন্ত্রচালিতের মতো বিপজ্জনক কাজ করে। অন্য জায়গায় কিন্তু তেমনি ভীরু।"

আমারও খেয়াল চাপে যুদ্ধে গেলে কেমন হয়। সৈনিক হয়ে নয়, সাংবাদিক হয়ে। অর্জুন হয়ে নয়, সঞ্জয় হয়ে। যুদ্ধ দেখেছিলেন বলেই না টলস্টয় 'সমর ও শান্তি' লিখতে পেরেছিলেন? আমি যদি তেমন কিছু লিখতে চাই তো আমাকেও যুদ্ধ দেখতে হবে। কিন্তু মনের খেয়াল মনেই মিলিয়ে যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে কর্তব্যরত সিভিলিয়ানদের অনেকেই স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। কেউ কেউ প্রাণও দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারত, কিন্তু বড়লাট লিনলিথগাউ একখানি চিঠি লিখে লাটসাহেবদের মারফৎ সবাইকে জানান যে তিনি জঙ্গীলাটের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছেন এবার যুদ্ধক্ষেত্রে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতেই অবস্থান আবশ্যক। ইউরোপীয় অফিসারদের ছুটি নিয়ে দেশে যাওয়াও বন্ধ। আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে এসব হচ্ছে গান্ধী বা সুভাষের সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে পূর্বব্যবস্থা। হিটলারের সঙ্গে লড়বার জন্যে জবাহরলাল কোমর বাঁধছেন আর জবাহরলালের সঙ্গে লড়বার জন্যে ভারত সরকার অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স জারী করছেন। আর কী ভয়াবহ সেসব অর্ডিনান্স! সহিংস হোক অহিংস হোক যে কোনো আন্দোলনকে নির্মমহস্তে দমন করতে সাতটা দিনও লাগবে না। ভারতে কোনোদিন তেমন অধিকসংখ্যায় গোরা সৈনিক মোতায়েন হয়নি, যেমনটি হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। পাছে কালা সিপাহীরা হুকুমের অবাধ্য হয় সেই আশঙ্কায় এই ইনসিয়োরান্স।

যাঁরা মনে করেছিলেন কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবামাত্রই গান্ধীজী গণসত্যাগ্রহ শুরু করে দেবেন, নয়তো সুভাষচন্দ্র আপসহীন বিরামবিহান সংগ্রামের ডাক দেবেন তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন। জবাহরলালের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। ঝাঁপ দেবার জন্যে তিনি পাগল। কিন্তু ঝাঁপ দেবেন কিসে? যুদ্ধে না বিপ্লবে? বেলা বয়ে যায়। গান্ধীজী তো বড়লাটের চেয়েও নির্দয়। নির্দেশ দেন, যে যার চারকায় তেল দাও। দেখাও তো আগে কত বেশী সুতো উৎপন্ন হলো। ছ'লাখ গ্রামে গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র পত্তন করাও দরকার। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আপাতত শিকেয় তোলা থাকে।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চালাতে গেলে মুসলিম লীগকে বখরা দিতে হবে,

ক্ষমতার বখরা না দিলে সে ভূখণ্ডের বখরা চাইবে, কখনো কি এসব কথা ভেবেছি আমরা? একদিন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট জাকির হোসেন সাহেবকে বলি, "ফেডারেশন হলেই সমস্যা মেটে। আশা করি এইবার সেটা হবে।" তিনি দিল্লী ঘুরে এসেছেন। বলেন, "ফেডারেশন চুলোয় গেছে। তার বদলে হবে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান।" আমার বিশ্বাস হয় না। জানতে চাই, কেন তাঁর মতো সুশিক্ষিত সুবিবেচক মুসলমানদের এমন অযৌক্তিক পরিকল্পনা। তিনি বলেন, "তা নইলে আপনারা আমাদের উপর বন্দেমাতরম্ চাপিয়ে দেবেন।" বন্দেমাতরমের প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি রেখে আর সব তো বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতেও তাঁর আপত্তি খণ্ডন হয়নি।

"কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভা একই মলের এপিঠ আর ওপিঠ।" এই তাঁর ধারণা।

জাকির হোসেনগৃহিণী চট্টগ্রামের আজম সাহেবের ভগ্নী। আমাদের সঙ্গে এঁদের বেশ হৃদ্যতা ছিল। মিসেস হোসেনের মনের সাধ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলী আশগরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। আশগর পাঞ্জাবের ছেলে। গৌরবর্ণ সুপুরুষ, চেহারা দেখলে মনে হয় গ্রীক বংশধর। আর জাকির হোসেনের জন্মস্থান পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী রাঙ্গুনিয়া থানা। চেহারায় মঙ্গোলীয় ধাঁচ। কৃষ্ণবর্ণ বাঙালী। কিন্তু হলে কী হয়, ধর্মে মুসলমান তো। সব মুসলমান একজাতি। মিসেস হোসেন তাই স্বপ্ন দেখেন যে আশগর এ বিয়েতে রাজী হবেন। আশগর মাথা খাটিয়ে এর একটি চমৎকার উত্তর খাড়া করেন, "আমাদের ওদিকে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে সাদী হয় না। গুরুজনরাই ঠিক করে দেন। আমার হাত নেই।"

পাঞ্জাবী মুসমানের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের একজাতিত্ব একদিন সত্যি সত্যিই পাকিস্তান ডেকে আনে। জাকির হোসেন হন পূর্ব পাকিস্তানের ইনস্পেক্টর জেনারেল অভ পুলিশ, তারপরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, আরো পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন তিনি চট্টগ্রামের অবসর ভোগ করছেন তখন দুই পক্ষ থেকেই হেনস্তা হন বলে শুনি। সব মুসলমান একজাতি নয়, ভাষা অনুসারে জাতি।

কুমিল্লায় থাকতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন মোতাহার হোসেন চৌধুরী। অসাধারণ সংস্কৃতিবান পুরুষ। জানতুম না যে তিনি ছিলেন ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একজন প্রবক্তা। আবুল ফজল সাহেবের সমবয়স্ক। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের মতো সংস্কারমুক্ত। মনেপ্রাণে বাঙালী। আলোচনার সময় আমার লেখার প্রসঙ্গই তুলেছিলেন, নিজের লেখার কথা বলেননি। লিখতেনও না তেমন বেশী যে নজরে পড়বে। পাকিস্তানী

আমলে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রকাশিত হয়। অপূর্ব গদ্যশৈলী। উদারতম চিন্তাধারা। এঁকে নিয়ে আমার একবার এক বিপদ হয়েছিল। ঢাকার একুশে ফেব্রুআরির প্রথম বার্ষিকীর দিন শান্তিনিকেতনে যে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঁচজন সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করি। তাঁদের একজনের নাম কাজী মোতাহার হোসেন। বিখ্যাত অধ্যাপক। কিন্তু চিঠিখানা যিনি পাঠান তিনি পদবীর সঙ্গে 'চৌধুরী' জুড়ে দেন। ফলে জবাব পাই কাজীর কাছ থেকে নয়, চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় তিনি রসিয়ে রসিয়ে লেখেন যে তিনি এখন 'বর্বর' হয়ে গেছেন। কী করে আসবেন? তারপর তাঁর রসিকতার ব্যাখ্যা দেন এই বলে যে তিনি আগে একবার বর হয়েছিলেন, এখন আবার বর হয়েছেন। তাই 'বর্বর'। আমরা বেঁচে যাই। কাজীকে লিখি।

কুমিল্লার অভয় আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী কুমিল্লার বাইরে থাকলেও মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন ও আমাদের সঙ্গে তাঁর পুরাতন বন্ধুতা ঝালিয়ে নিতেন। একদিন তাঁর কাছে শুনি যে গান্ধীজী মালিকান্দা আসছেন, আমি যদি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই তো তিনি ব্যবস্থা করবেন। কুমিল্লায় কর্তব্যরত বিচারকের পক্ষে মালিকান্দায় গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সরকারের নজরে পড়বে বইকি। কিন্তু আমি তখন চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। ভয় ভেঙে গেছে। কংগ্রেসীদের সঙ্গে সমানে মিশি। একদিন মধ্যরাত্রে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর যাই ট্রেনে, চাঁদপুর থেকে স্টীমারে মালিকান্দা। অন্নদাবাবু অপেক্ষা করছিলেন, নিয়ে যান মহাত্মার কুটিরে।

নিচু ডেসকের একপাশে উনি, আরেক পাশে আমি। মুখোমুখি আলাপ। আমার পুত্রশোকে আমি ভুলতে পারছিলুম না, যদিও ইতিমধ্যে আবার পুত্রলাভ হয়েছে। মহাত্মাজী আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকান। বলেন, "মৃত্যুর উপরে কি কারো হাত আছে?" কিন্তু কোনোরূপ সান্ত্বনাবাণী শোনান না। যার জন্যে আমার যাওয়া। আমি চেয়েছিলুম এই নিশ্চিতি যে আমার ছেলে আমার চোখের আড়ালে রয়েছে। মৃত্যু তো একটা পর্দা। তাঁর সঙ্গে আমার আরো কথা ছিল। বলি, "যুদ্ধের জন্যে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ফরাসীদের লাভ কী হলো?" তা শুনে তাঁর চোখের মণি জ্বলে ওঠে। ভারী সুন্দর দেখায় তাঁকে। "তাই তো, লাভ কী হলো?" আমি তখন ভাবছিলুম যুদ্ধে নেমে ভারতের সত্যি কী লাভ হবে? সে কি পারবে হিংসা দিয়ে হিংসাকে রুখতে?

অন্নদাবাবু তাঁকে জানান যে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছি। কিন্তু তাঁর দিক থেকে তেমন কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ লক্ষিত হলো না। কথায় কথায় অন্নদাবাবু বলেন, "এঁর স্ত্রী আমেরিকান, কিন্তু আপনার ভক্ত।" তা শুনে তিনি

কৌতুকের হাসি হাসেন। "দেন আই অ্যাম সেভড।" তিনি আমাকে পনেরো মিনিট সময় দিয়েছিলেন, আমি তার আগেই উঠি। বিদায় নেবার সময় প্রণাম করে বলি, "মহাত্মাজী, আপনি আরো অনেকদিন বাঁচুন। ফেডারেশনটা পাইয়ে দিয়ে যান।" তিনি যুক্তকরে নমস্কার করেন। কিন্তু একটি কথাও বলেন না। বকবক তো আমরা দু'জনেই যা করবার করেছি। তিনি সবসুদ্ধ ক'টি কথা বলেছেন? তিনটি কি চারটি।

মহাত্মাকে মনে হলো যৎপরোনাস্তি গম্ভীর। মন্ত্রীদের পদত্যাগের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তাই নিয়ে বোধহয় চিন্তিত। তার আগে আরো কতকগুলি করণীয় কাজ ছিল। সেগুলি একে একে সেরে নিচ্ছেন। মালিকান্দায় তাঁর কাজ গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদান। জানতুম না যে যোগদান করতে এসে তিনি ওটিকে লিকুইডেশনে দিয়ে যাচ্ছেন। ওটা নাকি বামপন্থীদের মতে দক্ষিণপন্থীদের সংগঠন। অথচ লোকের ধারণা ওটা গান্ধীবাদীদের প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজীর নিজের তো একটা মতবাদ ছিল। সেটার ধারক ও বাহক হবে কে? কংগ্রেস গান্ধীকে চায়, কিন্তু গান্ধীবাদকে চায় না। মহাত্মার মনে এ নিয়ে গভীর ব্যথা ছিল, কিন্তু তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান দিয়ে যাঁরা তাঁর ব্যথা দূর করতে চেয়েছিলেন তাঁরা তাতে ব্যর্থ হলেন। কারণ রাজনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল। স্থির হলো যে গান্ধী সেবাসঙ্ঘ হবে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। খাঁটি অহিংসাবাদী জনা পাঁচেক অনুগামী অহিংসা নিয়ে গবেষণা করবেন।

তেল মেখে গামছা কাঁধে দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছিলেন সর্দার বল্লভভাই। অন্নদাবাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মানুষটি একখানি তেলচুকচুকে লাঠির মতো শক্ত। কিন্তু কথাবার্তায় সহজ ও সরল। এই অহিংস লাঠিখানি না হলে গান্ধীজীর চলে না। লাটসাহেবদের উপর সর্দারি করা কি যার তার কাজ? সাত আটটা প্রদেশ শাসন কি মুখের কথা? অনভিজ্ঞ মন্ত্রীরা সেটা পারবেন কেন? বল্লভভাইয়ের গুরুত্ব সেইখানে। গোটা পার্লামেন্টারি সংগঠনটা তাঁর মুঠোর মধ্যে। এটাও একপ্রকার কনসেনট্রেশন অব পাওয়ার। এর প্রতিকার পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু দেশ কি তার জন্যে প্রস্তুত? বাইরের ও ভিতরের চাপে বল্লভভাইকে সরাতে গিয়ে সাত-আটটা প্রদেশের মন্ত্রীদেরও সরানো হলো। কংগ্রেসের বাইরের ও ভিতরের কোন্দল মিটলে পরে মন্ত্রীরাও ফিরবেন। লেঠেলও ফিরবেন।

আমাদের জেলাশাসক মিস্টার পোর্টার যে সাত বছর পরে ভারত সরকারের হোম মেম্বার বল্লভভাই প্যাটেলের অধীনে হোম সেক্রেটারি হবেন তা কে কল্পনা করেছিল? কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর পোর্টার বিরক্ত হয়ে আমাকে বলেন, "হুঁ! ওঁরা জেলে যাবেন বলেই দু'বছর ধরে জেলখানার রিফর্ম করেছেন। এবার আরামে থাকবেন।" গান্ধীজীর জন্যে রেলের থার্ড ক্লাস কামরার

সমস্তটাই রিজার্ভ করা হয় শুনে বলেন, "বাঃ! তাহলে আরামের কমতি হলো কোথায়?" দুঁদে সিভিলিয়ান। প্রথম মহাযুদ্ধে গোলন্দাজ ছিলেন। শুনেছিলেন যে আমি একজন সাহিত্যিক। খাতির করতেন।

মিস্টার পোর্টারকে যখন বলি যে, মনে হয় জাতীয় সরকার গঠিত হবে, তিনি অবিশ্বাসের স্বরে বলেন, "তা হলে এঁদের কী হবে?" তার মানে তৎকালীন হোম মেম্বার, ফাইনান্স মেম্বার প্রভৃতি বড়লাটের শাসন পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যদের। দেখা গেল তাঁর অনুমানই সত্য। বড়লাট এঁদের ক'জনকে রেখে বাকী পদগুলি কংগ্রেসকে ও লীগকে দিতে রাজী, পরিষদ সম্প্রসারণেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু যুদ্ধকালে এই পর্যন্ত পরিবর্তন। এর বেশী নয়। পুরো একটা বছর পায়চারি করার পর কংগ্রেস হাল ছেড়ে দেয়। গান্ধীজী নিশ্চিত হন যে কংগ্রেসের আর পিছুটান নেই। সে অল্পে সন্তুষ্ট হবে না। তখন সংগ্রাম হয় সিভিল লিবার্টির ইস্যুতে। যুদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ।

ততদিনে আমি কুমিল্লা থেকে ছুটি নিয়ে বিদায় হয়েছি। বিদায়ের পূর্বে আসবাব যা ছিল তার অধিকাংশই জলের দরে বিক্রী করে দিয়েছি। চাকরি ছেড়ে দেবার মতলব তখনো মাথায় ঘুরছে। শান্তিনিকেতনে বসে মাথা ঠান্ডা করে আরো কিছুকাল থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পোর্টারের উক্তি। আমাকে লক্ষ্য করে আমার এক সহকর্মীকে বলেন, "ও'র হাত চেপে ধরুন।'

সিমসন ছিলেন জেলা ও দায়রা জজ। যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে ইংলন্ডের বিপাকে সহানুভূতি জানাই। আমি ভালো করেই জানতুম যে ইংরেজরা যুদ্ধের জন্যে তৈরি ছিল না, মিউনিক চুক্তির আসল কারণ একবছর সময় কিনে নেওয়া। সিমসন বলেন, "যুদ্ধটা একদিন না একদিন বাধতই। আরো কয়েক বছর পরে বাধলে আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে যেত। এখনি যে ধরে নিয়ে যাবে না এতেই আমি সুখী।" তাঁর মুখ পুত্রস্নেহে স্নিগ্ধ। তিনিও তাঁর বয়সে যুদ্ধে গেছেন। তাই ছেলেকে যতদিন সম্ভব তার থেকে দূরে রাখতে চান। ছেলেটি ইংলন্ডে পড়ছে। থাকে তার মায়ের কাছে। মার সঙ্গে বাপের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সিমসন দিনের বেলা আইন আদালত করেন, রাতের বেলা দূরবীন দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। মনে পড়ে আমাদেরও দেখতে দেন শনি-গ্রহের চন্দ্রবলয়। কখন যে তিনি সময় পেলেন প্রেমে পড়ার, কবে যে কুমিল্লার এক ফরাসী জমিদারের ডিভোর্সপ্রাপ্ত অস্ট্রেলীয় পত্নীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো, কিছুই জানতুম না। ময়মনসিংহে তাঁদেরি বাসভবনের উত্তরাধিকারী হই। তখন শুনি তাঁরা ইউরোপীয় সমাজে একঘরে হয়ে বাস করতেন। কিন্তু তাতে তাঁর পদোন্নতির ব্যত্যয় হয়নি। তিনি

জুডিসিয়াল সেক্রেটারি পদে থাকার সময় ভারত স্বাধীন হয়, তাঁর ভাষায় 'সেলফ গভর্নমেণ্ট' পায়। তিনি সস্ত্রীক ও সকন্যা অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান।

যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপে। অথচ সৈন্য চলাচল করছে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর অভিমুখে। তখনো জাপান নামেনি। কবে নামবে, আদৌ নামবে কিনা কে জানে! তবু একদিন দেখি কুমিল্লায় এক কোম্পানী সৈন্য এসে ছাউনী ফেলেছে। অফিসাররা ইউরোপীয়, জওয়ানরা ভারতীয়। কমাণ্ডাণ্ট আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেন এক সান্ধ্য পার্টিতে। অফিসারদের মেসে। ব্যবহারে বর্ণবৈষম্য ছিল না। হৃদ্যতার পরিবেশ। আমরা ওঁদের মিত্র, ওঁরাও আমাদের মিত্র। আসন্ন বিপদের মুখে পরস্পরের উপর নির্ভরতাই উদ্ধারের উপায়।

মনে হলো মুখ শুকিয়ে গেছে। ব্রিটিশ শ্রেষ্ঠতায় সেই চিরাচরিত আত্ম-বিশ্বাস যেন বল দিচ্ছে না। নিজের দেশের জন্যে প্রাণ দিয়ে লড়া এক জিনিস, চারিদিকে ছড়ানো সাম্রাজ্যের জন্যে প্রাণ দেওয়া আরেক জিনিস। ভারতীয় জওয়ানরাও যে একথা ভাবছে না তা নয়। তাদের ভিতরে শিক্ষিত লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তা ছাড়া দেশের জন্যে যারা লড়ছে তাদের বেলাও দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডের মতো দেশেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষমাত্রেরই কনস্ক্রিপশন। স্বেচ্ছায় লড়তে তৈরি আর ক'জন!

এক মেজরের সঙ্গে আলাপ হয়। মেজর না লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল! বছর চল্লিশ বয়স। বলেন, "আগেকার দিনে যুদ্ধ ছিল একটা অ্যাডভেঞ্চার। অজানার অভিমুখে অভিযান। সঙ্গে থাকত না অত লটবহর। অতরকম ব্যবস্থা। এখন তো প্রত্যেকটি জওয়ানের প্রতিদিন দাঁত পরীক্ষা করতে হয়, চোখ পরীক্ষা করতে হয়। এই নিয়ে আমার কত সময় যায়! তাকে বোঝাতে হয় যে তার জন্যে সব কিছু করা হচ্ছে। সেই যে অ্যাডভেঞ্চারের প্রেরণা সে আজ কোথায়! তার জন্যে আমি অনেক কিছু ছাড়তে রাজী। একদল বেপরোয়া জওয়ান পেলে তাদেরি নিয়ে অসাধ্যসাধন করতে পারি।"

ওঁরা কুমিল্লা থেকে অন্য কোথাও চলে যান। সম্ভবত চট্টগ্রামে। একদিন এক মিলিটারি ইনফরমেশন অফিসার এসে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত। তিনি বিদেশী নাগরিকদের তালিকা তৈরি করছেন। আমার স্ত্রীর ন্যাশনালিটি লিখে নিতে চান। অবাক হন যখন দেখেন যে মহিলাটির পাশপোর্ট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান। তবু একবার সতর্ক করে দিতে ছাড়েন না। যুদ্ধকালে সীমান্ত এলাকায় না থেকে আরো নিরাপদ জায়গায় গিয়ে থাকা উচিত। সেজন্যে নয়, অন্য কারণে ঘটেও তাই।

॥ নয় ॥

কুমিল্লা থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে। যদি নিশ্চিত জানতুম যে সরকারী চাকরিতে আর ফিরে যেতে হবে না, অন্য পন্থা খুঁজে নিতে হবে তা হলে আমি সেই প্রচণ্ড গরমের সময় শান্তিনিকেতনে যেতুম না। তার বদলে যেতুম পাহাড়ে পর্বতে। সম্ভবত লছমনঝোলায়। যেখানে রেখে এসেছিলুম আমার ফিরে যাবার বাসনা। তার পরে বদলীর জায়গায় যেতুম। যদি বদলী করে। কোথায় পাঠাত তার যখন স্থিরতা নেই তখন মালপত্তর কুমিল্লায় রাখার ব্যবস্থাও করতুম। জজ আদালতের নাজীরই সে ভার নিতেন। পরে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পদত্যাগ করে চলে এলে আমাকেই মালপত্তর সরাতে হতো। কোথায় সরাব তা কি আমি জানতুম? জানতুম শুধু এইটুকুই যে, পদত্যাগের সিদ্ধান্তটা শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করব। সেখানে যদি পা রাখবার মতো মাটি পাই তা হলে সেইখান থেকেই পদত্যাগপত্র পাঠাব। করবার মতো কাজ হয়তো জুটবে না, কিন্তু মাথা গোঁজবার মতো ঠাঁই হয়তো মিলবে। বড় ছেলেকে সেখানকার আশ্রম বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়ে পরিবারকে আশ্রমের ভিতরে রেখে আমি যেখানে ইচ্ছা যাব ভাগ্য অন্বেষণে।

ইতিমধ্যে অধিকাংশ আসবাব আমি কুমিল্লায় থাকতেই বিক্রী করে দিই। জলের দরে। তখন যদি জানতুম যে ছুটির পরে ফিরে আসব ও বদলী হব তা হলে এটা না করলেও চলত। তবে একদিন না একদিন করতে হতোই। কারণ আই. সি. এস. ছাড়ার পর আমাকে আর আই. সি. এসের জীবনযাত্রার ঠাট বজায় রাখতে হতো না। সাধ্যেও কুলোতো না। অত বড় বাসা পেতুম কোথায়! পরে যখন আরো কিছুকাল থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই তখন দেখি সরকারী বাসস্থানে ঘরের পর ঘর খালি পড়ে আছে। আসবাব থাকলে তো ভরবে? নতুন আসবাব কিনতেও পারিনে। পদত্যাগ যখন করবই।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বাগত করেন। আমার স্ত্রীকে বলেন, "শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠ মেয়ে। তোমার ইচ্ছামতো কাজ বেছে নাও। এখানে কত রকম বিভাগ। কত রকম কাজ।" আর আমাকে যা বলেন তার মধ্যে কাজের ইঙ্গিত নেই, যেন লেখাই আমার একমাত্র কাজ ও তাতেই সংসার চলবে। দিনকয়েক পরে কথাবার্তা হতো, কিন্তু তার আগেই বিশ্বভারতীর গ্রীষ্মাবকাশ ও কবির কালিম্পং প্রস্থান। রথীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন নিচু বাংলোর কাছাকাছি একটি বাসা। সেখানে মালপত্তর আঁটে না, তাই বিশ্বভারতীর গুদামে জায়গা

দেন। ছেলেমেয়েদের স্কুলিং কষ্ট হয়েছিল কুমিল্লাতেই, তা নিয়ে ভাবনায় পড়েছি দেখে প্রতিমা দেবী বলেন শ্রীনিকেতনের প্রধান ভবনের তিনতলার অতিথিশালায় বাস করতে। শান্তিনিকেতন তথা শ্রীনিকেতনের কর্মীদের কাছ থেকেও সৌজন্য আর সহানুভূতিই পাই। যাঁদের প্রতিবেশী হই তাঁরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সবাই চান যে আমরা থেকে যাই।

কিন্তু একটি জায়গায় আটকে যায়। আমার বড়ো ছেলে পুণ্যশ্লোকের বয়স জুলাই মাসে আট বছর পূর্ণ হবে। তার সমবয়সীরা যে শ্রেণীতে পড়ে আমরা তাকে সেই শ্রেণীতে ভর্তি করে দিতে অনুরোধ করি। এতদিন সে বাড়িতেই পড়েছে ও বাংলা মাধ্যমে সব কিছুই পড়েছে। বাদ কেবল ইংরেজী। ইচ্ছে করেই আমরা ইংরেজী শেখাইনি, যদিও ওর মার ভাষা ইংরেজী। ওকে বাংলা ভাষায় মানুষ করার জন্যে ওর মাকেই বাংলা শিখতে হয়েছে। বাড়িতে আমরা সকলেই বাংলায় কথা বলি। ইংরেজী যথাসম্ভব পরিহার করি। গুরুদেব নিশ্চয়ই এটা অনুমোদন করতেন। তাঁর লেখা থেকেই আমরা এর প্রেরণা পাই। কিন্তু তখন তিনি কালিম্পংএ। তাঁর অসাক্ষাতেই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে পুণ্যকে সব চেয়ে নিচের শ্রেণীতেই ভর্তি হতে হবে ও গোড়া থেকেই ইংরেজী শিখতে হবে। বাড়িতে পড়ে নিলে চলবে না। 'তাসের দেশে'র মতো 'নিয়ম'। যুক্তি নয়, তর্ক নয়, অনুশাসন। কেন একটি ছেলে একটু অন্যরকম হবে? পাঠভবনের অধ্যক্ষ তখন কৃষ্ণ কৃপালানী। 'কৃপালনী' নয়। তিনি স্বয়ং চেষ্টা করেন পুণ্যর বেলা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে। কিন্তু নাট্যকার জীবিত থাকতেই 'তাসের দেশ' তখন জীবন্ত। আমরা স্থির করি তাঁর কাছে প্রতিকার চাইব না। বাড়িতেই ছেলেকে ইংরেজী পড়াব ও পরে তার সমবয়সীদের শ্রেণীতে ভর্তি করে দেব। কিন্তু সেইজন্যেই তো শান্তিনিকেতনে বসিয়ে রাখা চলে না। ছেলের মনের উপর খুবই কুফল হবে, যদি তার সমবয়সীরা সবাই স্কুলে যায়, সে যেতে না পায়। অন্যথা দু'বছর নষ্ট।

চাকরিতে ফিরে যাবার অন্য কারণও ছিল। আমি আঁচ করতে পেরেছিলুম যে সামাজিক সম্পর্ক যতই মধুর হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথের মর্জিনির্ভর হয়ে আমি কাজ করতে পারতুম না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মর্জিও ছিল জমিদারী মর্জি। যাকে পছন্দ করতেন না সে তুচ্ছ কারণে বিদায় হতো। শেষে কি আমি একূল ওকূল দু'কূল হারাব। মনে মনে স্থির করি যে আরো কিছুকাল সরকারী চাকরিতে থেকে যাব, পরে উপযুক্ত সময়ে পদত্যাগ করব। কেউ তো আমাকে অসম্মান করেনি, বিচারকের পদে আমি স্বাধীন। এই তো সেদিন মালিকান্দায় গিয়ে আমি মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি, কেউ কি এর জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেছে? যেখানে আমার বাধছে সেটা সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠতার অভাব। বেশীর ভাগ সময়ই অপচয় হচ্ছে মামলার শুনানীতে ও রায় লেখায়। বাকী

সময়টাতেও আমি শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। শান্তিনিকেতনে কাজ নিলেও বেশীর ভাগ সময় যেত জীবিকার পেছনে। সাহিত্য-সৃষ্টি কি আমার সব সময়ের কাজ হতো? হতে পারত, যদি পেনসন পেতুম ও সে পেনসন জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট হতো। সেটা তখন সুদূরপরাহত। মাত্র দশ বছরের চাকরি। ইউরোপীয় হলে আনুপাতিক পেনসন মিলত, নই বলে তাও মিলবে না। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে পরিবারের মুখ চেয়ে।

মেদিনীপুরের জেলা জজ নিযুক্ত হয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর রথীবাবুর কাছ থেকে একখানি সুন্দর চিঠি পাই। অনবদ্য বাংলায় লেখা। পরিপাটি হস্তাক্ষর। তিনি সবিনয়ে লেখেন যে আমাকে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যের চেয়ার দিতে চান, কিন্তু সসঙ্কোচে যোগ করেন, মাসিক বেতন দেড় শত। বিশ্বভারতীর পক্ষে তার চেয়ে বেশী দেওয়া সম্ভব নয়। আমার পক্ষে কি সেই বেতনে কাজ করা সম্ভব? আমি তখন তার আটগুণ বেতন পাই, খরচ যতই কম করি না কেন, যুদ্ধের বাজারে অত কমে চালানো যাবে না। মাফ চাই।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন আমাদের সার্ভিসের নিয়াজ মোহম্মদ খান। তাঁর মুখে শুনি পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি দেখেন কোথাও এক টুকরো লোহা পাওয়া যায় না। কারণ? কারণ সেখানকার লোকের বিশ্বাস ইংরেজরা এবারকার যুদ্ধে হেরে যাবে, তখন রাজা হবে কে? মুসলমানদের মতে মুসলমানরা। শিখদের মতে শিখরা। হিন্দুদের মতে হিন্দুরা। পরস্পরের সঙ্গে লড়বার জন্যে প্রত্যেকেই হাতিয়ার তৈরি করবে। খান প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারিনে। ভাবনায় পড়ি। ইংরেজ না হয় হারবে ও হাতীর পিঠ থেকে নামবে। কিন্তু সে হাতীর পিঠে সওয়ার হবে কে?

সার সিকন্দর হায়াৎ খান তখন পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তখনকার দিনে বলা হতো না। তাঁর কাজ ছিল যুদ্ধের জন্যে রংরুট সংগ্রহ করা। তাঁর পদ্ধতি ছিল শিখদের বলা, "মুসলমানদের সঙ্গে লড়বে যে হাতিয়ার পাবে কোথায়? যুদ্ধে যোগ দাও, তা হলে হাতিয়ার হাতে আসবে।" তেমনি মুসলমানদের বলা, "শিখদের সঙ্গে লড়বে যে হাতিয়ার পাবে কোথায়? যুদ্ধে নাম লেখাও, তা হলে হাতিয়ার হাতে আসবে।" তেমনি হিন্দুদের বলা, "দেখছ তো, যুদ্ধে নাম লিখিয়ে মুসলমান আর শিখরা কেমন হাতিয়ার হস্তগত করছে! তুমিও তাই করো।"

গোড়ার দিকে কেউ রংরুট হতে চায়নি। পরে দেখা গেল দলে দলে রংরুট হচ্ছে। কোন সুদূর বিদেশে জার্মানদের সঙ্গে বা ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়তে যাবার সময় শিখরা হাঁক ছাড়ছে, "সৎ শ্রী অকাল" আর মুসলমানরা "আল্লা হো আকবর" আর হিন্দুরা "দুর্গা মাইকী জয়"। কোথায় ভারতীয় জাতীয়তা-বাদী ধ্বনি বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আওয়াজ! যে যার নিজের

সম্প্রদায়টিকেই চেনে। হিন্দুরাও বলবে না, "ভারতমাতা কী জয়" বা "বন্দেমাতরম্"। যাদের হাতে অস্ত্র তাদের লক্ষ আপাতত জার্মান বা ইটালিয়ান, পরে হিন্দু বা মুসলমান বা শিখ। না, ইংরেজ তাদের লক্ষ নয়। এইটেই আশ্চর্য।

মেদিনীপুর থেকে কিছুদিন পরে আমি বদলী হয়ে যাই বাঁকুড়ায়। সেটা আমার পুরোনো স্টেশন। একদা সেখানে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম। এবার জেলা জজ। অনেকের সঙ্গে চেনা ছিল। কাজকর্মও কম। সাহিত্যের জন্যে সময় পাই যথেষ্ট। আমার ছয়খণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস 'সত্যাসত্য'-র শেষ খণ্ড 'অপসরণ' সেইখানেই লেখা হয়। তার পরে যদি কোনো বড় মাপের বই না লিখে থাকি তবে সেটা অবসরের অভাবে নয়। আমার জীবনদর্শনে তখন একটা ওলটপালট চলছিল। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব ইত্যাদি প্রশ্ন আমাকে আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছিল। তার চেয়েও গভীরতর জিজ্ঞাসা, আত্মা পরমাত্মা ও অমরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতি কোথায়? কী বিশ্বাস করি, কী বিশ্বাসে করিনে এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব আমাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিল।

ওদিকে বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকা যোগ দেওয়ায় মানব জাতিও দুই শিবিরে বিভক্ত হয়েছিল। তাতে মহাত্মা গান্ধীর আন্তরিক অসম্মতি। কতক লোককে যুদ্ধবিগ্রহের বাইরে দাঁড়াতে হবে, নইলে মধ্যস্থ হবে কারা, শান্তি স্থাপন করবে কারা? তিনি স্বয়ং সেইরূপ একজন ব্যক্তি। কিন্তু কংগ্রেস কি সেইরূপ একটি দল? ভারত কি সেইরূপ একটি দেশ? কংগ্রেস নেতারা যদিও ব্যক্তিসত্যাগ্রহ বরণ করে কারাবাসী, তবু তাঁদের শর্ত মেনে নিলে যুদ্ধে অংশ নিতে তাঁরাও রাজী। তাঁরা যদি অংশ নেন তবে ভারতের জনগণও অংশ নেয়। গান্ধীজীর তা হলে স্থিতি কোথায়? সকলেই বুঝবে যে তিনিও যুদ্ধের অংশীদার। দুই শিবিরের এক শিবিরে যুক্ত। মধ্যস্থতা বা শান্তিস্থাপনের জন্যে কেউ তাঁর দিকে তাকাবে না। জয় হবে প্রবলতর হিংসার। অহিংসার নয়। তাঁর তা হলে বেঁচে কাজ কী? তিনি তো রাজক্ষমতা চান না।

প্রশ্নটা তখনও জরুরী হয়ে ওঠেনি। হয় বছরখানেক বাদে, যখন জাপানীরা ভারতের দুয়ারে এসে হাজির। তখন কংগ্রেসী সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিয়ে আহ্বান করা হয় ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে। ওর চেয়ে উদার শর্ত শাসকরা শাসিতদের কোথাও যুদ্ধকালে দেয়নি। ইংরেজরা মিলিটারি পাওয়ার নিজেদের হাতে রেখে সিভিল পাওয়ার হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিল। এতে গান্ধীজীর আপত্তি রাজনীতিগত নয়, নীতিগত। কোনো শর্তেই তিনি যুদ্ধে শিবিরভুক্ত হতেন না, তবে কংগ্রেস হতে পারত, যদি মিলিটারি পাওয়ারও হস্তান্তরিত হতো। চার্চিল নাছোড়বান্দা, ক্রিপস ব্যর্থ, কংগ্রেস কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন সময় গান্ধীজী কংগ্রেস নেতাদের সাহায্যে অগাস্ট প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন।

ভেবেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে আরো একদফা আলোচনা হবে, বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই বড়লাট তাঁকে সদলবলে গ্রেপ্তার করেন। আমি তো স্তম্ভিত।

ওদিকে সরকার থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছিল জাপানীরা এসে পড়লে আমাদের কী ভাবে পিছু হটতে হবে। তার আগে মূল্যবান রেকর্ড সরাতে হবে। ওরা যে কাঁথির সমুদ্রকূলে নামতে পারে এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল। মেদিনীপুরের নথিপত্র বাঁকুড়ায় সরানো হলে আমরা তার জন্যে জায়গা করে দিতুম। এ সময় একজন কি দু'জন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁরা ইংরেজ। আমি জানতে চাই পিছু হটতে হটতে তাঁরা যাবেন কতদূর, কোনখানে জাপানীদের রুখবেন। তাঁরা বলেন, "আমরা রাঁচীর কাছে লাইন টানছি। সেই লাইনটা রক্ষা করব।" তার মানে, কলকাতা ছেড়ে দেব। বাংলা আসাম ছেড়ে দেব। আমার এক বন্ধু তখন বিহারের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি নাকি বিহার সরকার থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীদের আশ্রয় দেবার জন্যে তৈরি থাকতে। যথাকালে তাঁকে বার্তা পাঠানো হতো "বেঙ্গল কামিং"। অর্থাৎ বাংলা সরকার বাংলাদেশ ছেড়ে বিহারের আশ্রয়প্রার্থী। আমার বন্ধু পরে আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের জন্যে আমরা ঘর খালি রেখেছিলুম।"

সংকট যে ঘনিয়ে আসছিল এ বিষয়ে ইংরেজ ভারতীয় একমত। তাই যৌথ যুদ্ধপ্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। শর্তে বনলে যৌথ যুদ্ধপ্রয়াসই হতো। যুদ্ধে নিরপেক্ষতার ইস্যুতে সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ তখন কারো মাথায় ছিল না, স্বয়ং মহাত্মাও সরে দাঁড়াতেন যদি মিলিটারি পাওয়ার হস্তান্তরিত হতো। তখন তিনি বলতেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে নেই, কিন্তু বাধাও দেব না। লড়তে চাও লড়ো।" কিন্তু দেশের তখন যে অবস্থা তাতে ইংরেজদেরও সাধ্য নেই যে হিন্দু মুসলমানের গৃহযুদ্ধ ঠেকায়। জিন্না সাহেব জেদ ধরে বসেছিলেন তাঁকে ক্ষমতার অংশ দিতে হবে, কেবল কেন্দ্রে নয়, প্রত্যেকটি প্রদেশে, নয়তো দিতে হবে দেশের একাংশ, যার নাম পাকিস্তান। তাঁর প্রভাব যে কতদূর ব্যাপ্ত ও কত গভীরে প্রবিষ্ট সে বিষয়ে কারো কোনো ধারণা ছিল না। সকলের ধারণা ওটা একটা দরাদরির কৌশল। শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়া হলে ওঁরাই জিন্নাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করবেন।

আমাদের সার্ভিসের ফজলে আহমদ করিম বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে আমি কুমিল্লায় কাজ করেছি। অন্তরঙ্গতা ছিল। কংগ্রেস এতগুলো প্রদেশের যুদ্ধকালীন লাভের লোভ জয় করে মরণপণ সংগ্রাম করছে এতে নিশ্চয়ই মুসলিম জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, লীগ তা করছে না, সুতরাং লীগের জনপ্রিয়তা কমছে, অমনি করে লীগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে,

আমার মুখে একথা শুনে করিম বলেন, "মুসলমানরা কংগ্রেসকে নিত্য অভিশাপ দিচ্ছে। লীগ ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গের অমুক নির্বাচন কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে। ওটাই ভবিষ্যতের ইশারা!"

আমি তো অবাক। যারা ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম করল না, জেলে গেল না, প্রাণ দিল না, গদী আঁকড়ে থাকল, তারাই নির্বাচনে জিতল ও জিতবে! কথায় কথায় জানতে পাই যে করিমও পাকিস্তানের পক্ষপাতী। তাঁর মতে সেটাই হিন্দু মুসলিম সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু তিনি তো এলাহাবাদের মুসলমান। তাঁর এলাকা তো পাকিস্তানে পড়বে না। তাঁর কী লাভ? কিন্তু ক্রমেই উপলব্ধি করি যে বিহারের মুসলমানদেরও পাকিস্তান ভরসা। তা হলে কি সবাই চলে যাবে প্যাকিস্তানে? পারছে না যখন ফিরে যেতে পূর্বপুরুষের বাসভূমি আরবে, ইরানে, আফগানিস্তানে, মধ্য এশিয়ায়, তখন পাকিস্তানই কি হবে সবাইকার বাসভূমি? তখন আমরা কি হব নিজ বাসভূমে পরবাসী? বাংলাদেশে এলিয়েন?

পাঁচদিন একটানা উপবাস জীবনে কোনোদিন করিনি। করি আমরা স্বামী-স্ত্রী গান্ধীজীর অনশনের খবর পেয়ে তাঁকে নৈতিক শক্তি যোগাতে। তার চেয়ে বেশী আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা চরকাও কাটতুম, খাদিও পরতুম, কিন্তু আমাদের অনশন সেই প্রথম ও সেই শেষ। একদিন করিম আমাকে বলেন, "শুনে দুঃখিত হবেন, গান্ধীজীকে আর বাঁচানো গেল না। আমরা নির্দেশ পেয়েছি তাঁর মৃত্যুর পরে যে পরিস্থিতি দেখা দেবে তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে। আপনাকে জানাব।"

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদ দিলে সাধারণভাবে ভারতের মুসলমানরা অগাস্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। ব্যতিক্রম কেবল মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী মুসলমান। করিম বলেন, "ইংরেজরা রাজত্ব করুক মুসলমানরাও এটা পছন্দ করে না। কিন্তু ওরা চলে গেলে পরে মুসলমানদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?"

"ওরাও হবে স্বাধীন দেশের নাগরিক। পরাধীনতার গ্লানি বহন করতে হবে না। মাথা উঁচু হবে আপনাদের ও আমাদের সমানভাবে।" আমি তাঁকে বোঝাই।

তিনি বলেন, "সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশ হলো মুসলমানদেরই। তাদের জমিদারি তালুকদারি কিনে নিল হিন্দুরা, ইনাম পেল হিন্দুরা। সেই থেকে মুসলমানরা ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তে নারাজ। ওতে লাভ যদি হয় ওদেরি হবে। সেইজন্যেই তো মুসলমানরা এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েনি। ওদের দাবী পাকিস্তান।"

"পাকিস্তান হলে আপনাদের লাভটা কী হবে? ওইটুকু দেশের সব ক'টা

চাকরির চেয়ে অখণ্ড ভারতের শতকরা তেত্রিশটা চাকরির সংখ্যা বেশী। দেশ চালাবার মতো অর্থই বা আপনারা পাবেন কোথায় ?" আমি তর্ক করি।

"অর্থের জন্যে কি কোথাও কিছু আটকায়! আর চাকরি-বাকরিই কি মানুষের একমাত্র কাম্য! পাকিস্তান হলে মুসলমানরাই হবে নিজেদের প্রভু। আর কারো কাছে খাটো হতে হবে না।" তিনি সে বিষয়ে সুনিশ্চিত।

হিন্দুপ্রাধান্যের ভয়ই তাঁর মনে ও তাঁর মতো উচ্চপদস্থ মুসলমানদের মনে বাসা বেঁধেছিল। সে বাসা ইংরেজরা বেঁধে দেয়নি। ইংরেজরা শুধু তার সুযোগ নিয়েছিল। ইংরেজদের বাদ দিলে সর্বঘটেই হিন্দুপ্রাধান্য। যেমন সরকারী চাকরিতে, তেমনি বেসরকারী চাকরিতে, তেমনি জমিদারি তালুকদারিতে, তেমনি মহাজনী তেজারতিতে, তেমনি ব্যবসাবাণিজ্যে, তেমনি ডাক্তারি ওকালতি বা সাংবাদিকতায়, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে, তেমনি শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো কথাই নেই। একমাত্র সৈন্যবিভাগেই নাকি মুসলমানদের ডবল ওজন ছিল। ওরা নাকি সেখানে শতকরা চল্লিশ ভাগ। অথচ জনসংখ্যার নিরিখে সেখানে ওদের পাওনা শতকরা বাইশের বেশী নয়।

"ইংরেজদের জায়গায় হিন্দুরা যদি প্রভু হয়, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার তো মুসলমানদের থাকবেই। ক্ষমতাও থাকবে। দুই সম্প্রদায়ে মিটমাট একটা হবেই। কিন্তু পাকিস্তান হলে কি সেটা হবে ? যৌথ পরিবার ভেঙে গেলে কি আর জোড়া লাগে ?" আমি বলি।

কে কার যুক্তি শোনে! মুসলিম লীগ ততদিনে পাকিস্তানকেই তার পুঁজি করে নির্বাচনের আসরে নেমেছে ও অন্যান্য মুসলিম দলগুলিকে কোণঠাসা করছে। তাকে প্রতিপন্ন করতেই হবে যে সে-ই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক দল! আর তার অধিনায়ক জিন্না সাহেবই মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলার একমাত্র অধিকারী। মিটমাট যদি কখনো হয় তো লীগের সঙ্গে তথা জিন্নার সঙ্গেই হবে। নয়তো কারো সঙ্গে না। মিটমাট না হলে লড়তেই হবে যখন তখন তার উপযুক্ত লগ্ন জিন্না সাহেবই স্থির করবেন। তিনি তাঁর এক অধীর অনুগামীকে বলেন যে উপযুক্ত সময় আসবে তখনি, যখন ইংরেজে কংগ্রেসে মিটমাটের উপক্রম হবে।

বাঁকুড়া থেকে ছুটি নিয়ে আমরা যাই আলমোড়ায়। পরে নদীয়ার জেলা জজ পদে বদলী হয়ে দেখি মন্বন্তর চরমে উঠেছে, অথচ শাসকরা হালে পানি পাচ্ছেন না। এমন সব কথা তাঁদের মুখে শুনি যা শুনে অবাক হই। রেশন প্রথা নাকি লণ্ডনে চলতে পারে, কলকাতায় চলতে পারে না। এক বছর পরে না হয়ে এক বছর আগে যদি রেশন প্রথা চালু হতো তা হলে কলকাতার লোক যে যত পারে চাল কিনে মজুত করত না, যখন যেটুকু দরকার তখন সেটুকু নির্দিষ্ট দামে পেতো। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে চালও আসত না কলকাতায়,

ভুখা মানুষও আসত না তার খোঁজে।

কৃষ্ণনগর থেকে কী একটা উপলক্ষে কলকাতা এসেছিলুম। পথের মাঝখানে মোলাকাৎ দুই খাকসারের সঙ্গে ; তাঁদের একজন আমাদের সার্ভিসের আখতার হামিদ খান। কুমিল্লায় আমাদের ঘনিষ্ঠতা। জিজ্ঞাসা করি তিনি এখন কোথায় ও কী পদে ? তিনি উত্তর দেন, "নেত্রকোণার মহকুমা হাকিম ছিলুম, আজ থেকে আর নই। এইমাত্র আমি চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইস্তফা দিয়ে এলুম। হ্যাঁ, চাকরি থেকেই ইস্তফা। বদলী বা ছুটি এই সমস্যার সমাধান নয়। চোখের সামনে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আমার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা ছিল, তা দিয়ে আমি নেত্রকোণার মানুষকে বাঁচিয়েছি। অথচ সরকার থেকে এক পয়সাও নিইনি। কেন আমার পরিকল্পনা আমি ছাড়ব !"

তিনি মন্ত্রী সুহরাবর্দীকে দোষ দেন খাদ্যনীতির জন্যে।

আমি তাঁকে অনেক করে বোঝাই যে বিবাহিত পুরুষ তিনি, অমন হঠকারিতা তাঁর পক্ষে অনুচিত। তিনি উল্টে আমাকেই বোঝান যে আমারই উচিত চাকরি ছেড়ে দেওয়া। মানুষ যে দেশে দুর্ভিক্ষে মরছে, যে দেশের সরকার মজুতদার আর মুনাফাখোরদের স্বার্থে মানুষকে মরতে দিচ্ছে সে দেশে সবাই এই মহাপাপের ভাগী, আমি জজ হলেও আমার বিবেক নির্মল নয়।

নিয়তির পরিহাস ! খান চলে যান আলীগড়। সেখান থেকে বার করেন এক ইংরেজী সাপ্তাহিক। তাতে পাকিস্তানের পক্ষে প্রবন্ধ পড়ে আমি চমকে উঠি। তাঁকে লিখি, পাকিস্তান হলে আমার দেশে আমিও হব এলিয়েন, তাঁর দেশে তিনিও হবেন এলিয়েন। যাঁর জন্যে তাঁর চাকরি গেল তিনি মন্ত্রীপদের সুযোগ নিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন ও তাই দিয়ে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে জিতিয়ে দেন। নিজে প্রধানমন্ত্রী হন তা ঠিক, কিন্তু দেড়বছর বাদে যখন সত্যি সত্যি পাকিস্তান হাসিল হয় তখন তাঁকে কেউ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করে না। তিনি ভারতেই থেকে যান, কোথাও ঠাঁই পান না, পরে অবশ্য পাকিস্তানে যান ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আবার গদীচ্যুত হন। ওদিকে আখতার হামিদ খান দেশভাগের পর ভারতেই অধ্যাপকের কাজ খুঁজে নেন, কেউ তাঁকে এলিয়েন ভাবে না। পরে তাঁকে ডেকে নিয়ে কুমিল্লার কলেজের অধ্যক্ষপদে বসানো হয়। সে পদ ছেড়ে তিনি আশ্চর্য এক পরিকল্পনায় চাষের ও চাষীদের উন্নতিবিধান করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান যখন বাংলাদেশ হয় তখন তিনি সেখানেও এলিয়েন হন। শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রা করেন।

কৃষ্ণনগরের মশা আমাকে দেশান্তরী না করুক জেলান্তরী করে। বার বার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় ভুগে আমার স্বর্গে যাবার দশা হতো, যদি না থাকতেন ডাক্তার জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, কলকাতা করপোরেশনের ভ্যাকসিন

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, যুদ্ধকালে যিনি কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত ছিলেন। অবশেষে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন ছুটি নিয়ে বদলী হতে। আমি ছুটিও নিই, বদলীও হই, এবার বীরভূমের জেলা জজ পদে। সিউড়ি শহরটি স্বাস্থ্যকর, তবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থেকে মুক্ত নয়। পুণ্যে তো অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। ইতিমধ্যে ওর স্কুল-সমস্যার মীমাংসা হয়েছিল। পাদ্রীরা ওকে কৃষ্ণনগরের স্কুলে ভর্তি করে, ভাষা নিয়ে কোনো বিভ্রাট হয় না। সিউড়ির সরকারী হাইস্কুলেও ওর অনায়াসে স্থান হয়। আর সব ছাত্রের সঙ্গে ও সমান পাল্লা দেয়।

স্টালিনগ্রাডে রাশিয়ার জয়লাভের পর মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। তখন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আর কোন মানে হয় না। ইম্ফলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্যর্থ হয়। এমন সময় অসুস্থ হয়ে গান্ধীজী ছাড়া পান। অবিলম্বে জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার সফল হলে ভারতের অন্তর্বিবাদের মোড়ও ঘুরে যেত। কংগ্রেস বা লীগ কেউ ততদূর যেতে চায়নি যতদূর গেলে গৃহযুদ্ধ বাধে। ইংরেজরাও বাধাতে চায় নি। তিন পক্ষেরই ইচ্ছা মিটমাট। অথচ এমন কোনো ফরমুলা পাওয়া যায় না যেটা তিন পক্ষই মেনে নিতে পারেন। গান্ধী-জিন্না একমত হলেও বড়লাট যুদ্ধকালে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী হতেন না। অপেক্ষা করতে হতোই। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সেই সময়টা কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা কী করতেন? যুদ্ধে সহযোগিতা? আবার সত্যাগ্রহ?

যুদ্ধ শেষ হলো। আবার আলাপ আলোচনা শুরু হলো। ইতিমধ্যে একটা গুজব আমার কানে আসে। বাংলাদেশ নাকি ভাগ হয়ে যাবে। কলকাতা শহর ও বর্ধমান বিভাগ নাকি জুড়ে দেওয়া হবে বিহারের সঙ্গে। আমি তো ভেবেই পাইনে তাতে কার কী লাভ হবে! জিন্না সাহেব মুসলিম ভারতকে হিন্দু ভারতের সমকক্ষ করবার জন্যে সারা বাংলা, সারা আসাম, সারা পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর দাবী করছেন। এতে যদি কংগ্রেসের আপত্তি থাকে তবে কংগ্রেসীরা তাঁকে অখণ্ড ভারতের অর্ধেক সিংহাসন দিক। সেখানে মেজরিটি রুল তিনি স্বীকার করবেন না। মুসলমানরা মাইনরিটি নয়, তারা আলাদা একটা নেশন, দুই নেশনের এক নেশন, সংখ্যায় না হোক বাহুবলে সমকক্ষ। ব্যালান্স রক্ষা করতে হলে অর্ধেক ক্ষমতাই তাঁর চাই। তাতেও যদি কংগ্রেসের আপত্তি থাকে তবে মন্দের ভালো ইংরেজ রাজত্ব। কেন্দ্রে থাকবে এ পক্ষও নয়, ও পক্ষও নয়, তৃতীয় পক্ষ।

কংগ্রেস নেতারা মুক্ত হবার পর আর ওরকম গুজব শোনা যায় না। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান নৈব নৈব চ। আমরাও আশ্বস্ত হই যে দরকার হলে তাঁরা আবার সংগ্রাম চালাবেন। গান্ধীজী তো বলেন তিনি

একশো বছর বাঁচতে চান, তার মানে আরো পঁচিশ বছর লড়তে চান। এখন কথা হচ্ছে, ইংরেজরা ততদিন ভারতের হাল ধরে রাখতে রাজী কি না। ইংরেজ মহলের কথাবার্তাও কানে আসছিল। তাঁরা নাকি মিশর প্রভৃতি কয়েকটা দেশ থেকে কাগজপত্র আনিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিলেন ক্ষতিপূরণের হার কত হলে তাঁরা ক্ষতিপূরণের শর্তে ভারত ত্যাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তরে সম্মত হবেন। তাঁরাও চান শুভস্য শীঘ্রম্। কারণ ঘটনার স্রোত তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রয়োজনই হবে না।

এর পরে আসে একটা সার্কুলার। এতকাল ইউরোপীয় আই. সি. এস. অফিসাররাই আনুপাতিক পেনসনে অকালে অবসর নিতে পারতেন। এবার থেকে ভারতীয় অফিসাররাও তা পারবেন। আমার ব্যক্তিগত সমস্যার এই তো সমাধান। আমি তাহলে আর অপেক্ষা করি কেন? করি এইজন্যে যে মুদ্রা-স্ফীতির দরুন আনুপাতিক পেনসনের পরিমাণ নামে যত আসলে তত নয়। অন্তত একটা আস্তানা থাকা চাই, যেখানে মাথা গুঁজতে পারি। ক্ষতিপূরণের টাকা ভারতীয়দের কি পাওনা নয়? ওঁরা তা হলে যাবেন কোথায়, নতুন সরকার যদি ওঁদের না রাখেন বা রাখলেও চাকরের মতো খাটান? আত্মসম্মানের প্রশ্ন ওঁদেরও তো আছে।

বীরভূমে দেড় বছর থাকতে না থাকতেই বদলীর হুকুম পাই। এবার ময়মনসিংহের জেলা জজ। আবার পূর্ববঙ্গ। আমার একটুও অভিরুচি ছিল না। বীরভূম থেকেই আমি অকালে অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলুম। তা হলে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস করতে পারা যেত। সেখানে একটুকরো জমিও ছিল। সিউড়ি থেকে শান্তিনিকেতন যেন এঘর থেকে ওঘর। ময়মনসিংহ থেকে বহুদূর। তা সত্ত্বেও আমি ওই পদটা মাথা পেতে নিই। ওটা আমার বয়সী অফিসারদের প্রত্যাশাতীত। ইউরোপীয়ান বা সিনিয়র ভারতীয় জজদেরই পাওনা। তখন জানতুম না যে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কিছুদিন পরেই আমাদের জাতীয়সম্পর্ক ছিন্ন হবে। ইউরোপীয়দের মতো আমরাও সেখানে হব বিদেশী, বিধর্মী ও বিজাতীয়। শেষ দেখার জন্যে একবার পদ্মাপারে যাবার প্রয়োজন ছিল।

সিউড়িতে আমার প্রতিবেশী ছিলেন পুলিশ সাহেব মজফ্‌ফর আলী খান। তিনি তো প্রায়ই ট্যুর করে বেড়াতেন। তাঁর স্ত্রী একাকিনী শিশুসন্তান নিয়ে বিব্রত। সে সময় আমার স্ত্রী গিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিতেন। যখন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন তো আমার স্ত্রীই তাঁর ভরসা। এইসূত্রে আমাদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা। ভদ্রমহিলা না বোঝেন ইংরেজী, না বাংলা। এমন কি উর্দুও তাঁর কাছে পরভাষা। আমরাই চেষ্টা করি পাঞ্জাবী বুঝতে। উর্দুর চেয়ে বাংলার সঙ্গে মিল বেশী। দুই নেশন তত্ত্ব বাঙালীকে বাঙালীর থেকে, পাঞ্জাবীকে পাঞ্জাবীর থেকে, উর্দুভাষীকে উর্দুভাষীর থেকে পৃথক করে যে

বিভক্তি সৃষ্টি করেছে সেটা একটা অনাসৃষ্টি। অথচ ধর্ম অনুসারে লোক ভাগ করলে প্রথমে আসে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী, তার পরে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। কংগ্রেস যখন প্রথমটাকে মেনে নিয়েছে তখন দ্বিতীয়টাকেও মেনে নিতে বাধ্য। নয়তো সেই ইস্যুতে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। সৈনিকে সৈনিকে লড়াই।

সিউড়িতে আবদুল মজিদ বলে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বসবাস করতেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুর সঙ্গে। ছেলেটির নাম ভুলে গেছি, পদবী ঘোষাল। শ্বশুরবাড়িতেই থাকত। সে একদিন কী একটা কাজে আমার খাস কামরায় দেখা করতে আসে। জানতে ইচ্ছা করে বৌমাকে ঘোষালের গুরুজন গ্রহণ করেছেন কিনা। সে বলে, "হ্যাঁ, ও কলকাতা গেলে আমাদের বাড়িতেই ওঠে। কেউ কিছু মনে করেন না।" আমি শুনে সুখী হই। এর পরে একদিন মজিদ সাহেব মারা যান। শুনি সুখ মুসলমানরা তাঁর সৎকারে যোগ দেবে না। তাঁর পরিবার অসহায়। প্রভাবশালী হিন্দু ও উদারমতি মুসলমানদের চেষ্টায় মৃতদেহ একদিন বাদে কবর দেওয়া হয়।

সিউড়িতে আগে কলেজ ছিল না। যুদ্ধকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপকরা কলকাতা থেকে এসে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আমার আদালতে একজন মুসলমান কর্মচারী আমাকে বলেন যে তাঁর ছেলেটিকে কলেজে পড়াতে চান, কিন্তু মুসলমান বলেই ওকে ভর্তি করা হচ্ছে না। সে কী কথা! আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পাই যে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজেও মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল থেকেই কলেজের নিয়মাবলীতে ধর্ম নিয়ে বাছবিচার আছে। তা হলে জে. আর. ব্যানার্জি অধ্যক্ষ হলেন কী করে? বোধ হয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। হিন্দু কলেজেও ছাত্রদের বেলা বাছবিচার করা হোত। সেই কারণেই প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও তাতে খ্রীষ্টান মুসলমান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদেরও ভর্তি হতে দেওয়া হয়। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ থাকলে তারা হিন্দুদের চেয়ে পেছিয়ে থাকত না। পেছিয়ে না থাকলে বিশেষ সুবিধা দাবী করত না। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমদর্শিতার অভাব সূচিত হয়।

আমার পাশের বাড়িতে বাস করতেন এক পরিবার। আমি জানতুমই না যে তাঁরা খ্রীষ্টান। প্রতিবেশী আমাকে বলেন, "দীর্ঘকাল সাঁওতাল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে কাটিয়েছি। ধর্ম এক হলে কী হবে, ওদের সংস্কৃতি আর আমাদের সংস্কৃতি ভিন্ন। ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতি কী হবে তাই ভেবে ওদের সঙ্গ ছেড়েছি।" দেখি তাঁরা বাঙালীদের সঙ্গে বাঙালী হবার সাধনায় রত। ধর্ম অবশ্য যথাপূর্ব। সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। তিনি ও আমি দুজনেই বাঙালী। বদলীর হুকুম না পেলে ওঁদের সঙ্গে আরো

মেলামেশার অবকাশ হতো। নবজাত কন্যাকে নিয়ে তার মা অন্দরে যেতে পারবেন না বলেই মাসখানেক সময় চাই।

॥ দশ ॥

এমন সময় শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর পদার্পণ। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করেন। আশ্রমের যেখানে যেখানে যান পায়ে হেঁটেই যান। কার মধ্যস্থতায় মনে পড়ছে না, বোধ হয় অন্নদাবাবুরই মধ্যস্থতায় আমার জন্যে পনেরো মিনিট সময় বরাদ্দ করেন, কিন্তু বিনয় ভবন থেকে পায়ে হেঁটে আসতে গিয়ে দিব্যি লেট। যেটা আর কখনো ঘটেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে রসিকতা, এক ফাঁকে একটু আড়ালে দুটি কথা। ময়মনসিংহের পথে কলকাতায় দেখা করতে বলেন, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয় না।

প্রায় ছ'বছর পরে পূর্ববঙ্গে ফেরা। পদ্মা মেঘনা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। যুদ্ধে মানুষ মরেনি, কিন্তু পোড়ামাটি নীতির অপপ্রয়োগে মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে। এত প্রাণ ইংরেজরাও দেয়নি, ফরাসীরা তো নয়ই, মার্কিনরাও না। যুদ্ধে না হলেও যুদ্ধের দরুন এই বিপুল প্রাণদান কি ব্যর্থ যাবে? দেশ স্বাধীন হবে না?

হবে যে তার আভাস পাওয়া যায় নৌসেনা বিদ্রোহে। সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে ক্যাবিনেট মিশন এসে হাজির। যে প্রস্তাব এঁরা নিয়ে আসেন সেটা স্বাধীনতারই প্রস্তাব। যদি কংগ্রেস ও লীগ নেতারা একমত হন। কিন্তু দ্বিমত হলে কী হবে? অনির্দিষ্টকাল বড়লাটের শাসন? তাঁর শাসন পরিষদে ইউরোপীয় সদস্যদের অবস্থান? প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীদের প্রত্যাবর্তন? তা দেখে জিন্না সাহেবের উষ্মা। তবে ইতিমধ্যে তিনি বাংলা ও সিন্ধু এই দুটি প্রদেশ শাসনের উপযোগী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। আর পাঞ্জাবেও তাঁর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি। কেন্দ্রেও লীগ বহির্ভূত মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা কমতে কমতে একটি কি দুটিতে ঠেকেছে। কংগ্রেস শাসিত হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতেও মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদে। সেখানে খান আবদুল গফ্ফার খান চিরউন্নত শির।

কিন্তু এটা হলো সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী অবস্থা। আমি যখন ময়মনসিংহে যাই তখন সেটা ১৯৪৬ সালের জানুআরি মাস। সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। একদিন আমাদের বাড়ির মালী এসে আমার স্ত্রীকে বলে, "আচ্ছা মা,

পাকিস্তান কী জিনিস ?"

মা যতটুকু জানতেন সে ততটুকুও জানত না। পরে একদিন বলে, "আমাকে ওরা ভয় দেখাচ্ছে। মরে গেলে মাটি দেবে না। কী করব, মা, খাতায় টিপসই দেব কি দেব না ? পাকিস্তানের জন্যে মৌলবীরা সভা ডেকেছে।"

মুসলমান চাকরবাকর আমাদের বাড়িতে পাঁচ-ছয়জন ছিল। সবাইকে যেতে হলো টিপসই দিতে। মৌলবী সাহেবদের কাছে। ধর্মকে মুসলিম লীগ রাজনীতির সেবায় লাগিয়ে আর সব মুসলিম প্রার্থীদের পরাস্ত করে। পাকিস্তান মুসলিম সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দাবী নয়। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল দেখে সেকথা বলবে কে ?

নির্বাচনে কিছুদিন আগে খবর পাই যে, স্বয়ং কায়দে আজম জিন্না মাঝরাতের ট্রেনে ময়মনসিংহ হয়ে ভৈরবের দিকে গেছেন। মুসলমান দর্শনার্থীরা স্টেশনে গিয়ে তাঁর দর্শন পায়নি। কামরার দরজা বন্ধ। বার বার "কায়দে আজম জিন্দাবাদ" জিগীর দিয়েও তাঁর বন্ধ দরজা খোলাতে পারেনি। জিন্না আর যাই হোন, জনতার কাছে নতজানু রাজনীতিক নন। জনতাই নতজানু।

ইতিমধ্যে কবে একদিন তিনি "কায়দে আজম" হয়েছেন ? যতদূর মনে পড়ে, সম্বোধনটা গুলবর্গার মুসলমানদের। সম্বোধন থেকে সেটা অভিধায় দাঁড়ায়। পাকিস্তান গোড়ায় তিনি চাননি, কিন্তু ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব তাঁরই সভাপতিত্বে গৃহীত হয়। প্রস্তাব করেন দলান্তরিত নেতা ফজলুল হক সাহেব। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলতে তখন এই পর্যন্ত বোঝাত যে দেশ দু'ভাগ হবে, কিন্তু যাদের মধ্যে দু'ভাগ হবে তারা কি এক নেশন না দুই নেশন এ প্রশ্নের উত্তর তখন কেউ জানত না। জিন্না সাহেব এর উত্তর দেন ১৯৪৪ সালে, গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারের সময়। ততদিনে তাঁর প্রত্যয় হয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান শুধু ধর্মে পৃথক নয়, সর্বপ্রকারে পৃথক। তারা দুই নেশন। দেশ ভাগ হবে দুই নেশনের মধ্যে। পাকিস্তান হবে মুসলিম নেশনের হোমল্যান্ড। ভারত ভাগের বেলা এই যুক্তি। অথচ বঙ্গভঙ্গের বেলা অন্য যুক্তি। "না, না, বাঙালীরা দুই নেশন নয়, এক নেশন।" লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করেন তখন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেই একদল বলেন, "বঙ্গভঙ্গ ভালো নয়, কারণ বাঙালীরা এক নেশন।" জিন্না সাহেবও লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ১৯৪৭ সালে তাই বলেন।

জিন্না সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের আজম সাহেব যা বলেছিলেন—গুডস ডেলিভার করা। মুসলিম লীগের টিকিটধারীদের তিনি ভোটে জিতিয়ে দেন। জিতিয়ে দেন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, বম্বেতে, মাদ্রাজে, যেসব প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা নয়। পাকিস্তান হাসিল হলে তাঁদের কী লাভ ? তাঁরা কি তাঁদের ভোটারদের সেদেশে নিয়ে যাবেন ও ঘরবাড়ি জায়গাজমি বিষয়-

আশ্রয় পাইয়ে দেবেন? লাভ যদি কারো হয় তো বাঙালী বা পাঞ্জাবী মুসলমানদের। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় জিন্না সাহেবের পেছনে মুসলিম লীগ সদস্যদের সারিবন্ধ সমর্থন আবশ্যক ছিল। কংগ্রেস লীগ মিলিত সরকার গঠিত হলে কংগ্রেসের গোষ্ঠীতে যেন একজনও মুসলমান না থাকেন। থাকলে তো দেখা গেল যে কংগ্রেস গুডস ডেলিভার করতে পারে। পুরোপুরি সফল না হলেও জিন্না সাহেব সেক্ষেত্রে মোটামুটি সফল হন।

এদিকে প্রাদেশিক স্তরে যেসব সরকার গঠিত হয় তাদের গঠনের নিয়ম কিন্তু ১৯৩৭ সালের মতো পালিত হয় না। নিয়মটা এই যে, মন্ত্রিমণ্ডলে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদেরও স্থান থাকা চাই। বম্বেতে মুসলমানদের, বাংলায় হিন্দুদের। কার্যত সেটা হলো না। কারণ বম্বেতে সব মুসলমানই লীগ মুসলমান। লীগের অনুমতি না পেলে কেউ কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দেবেন না। বাংলাদেশে সুহরাবর্দি সাহেব কোনো বর্ণহিন্দুকেই নিলেন না বা নিতে পারলেন না। নিলেন একজন কি দু'জন তফশীলী হিন্দুকে। বিহারে, যুক্তপ্রদেশে আগের মতো কংগ্রেস মুসলমান নেওয়া হলো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আগের মতো কংগ্রেস হিন্দু। লাটসাহেবরা সেবারে যেটুকু-বা হস্তক্ষেপ করতেন এবার সেটুকুও না। তা হলে গুডস ডেলিভার করা মন্ত্রীপদপ্রার্থী লীগ সদস্যদের বেলা হলো কোথায়? কেবল বাংলাদেশে ও সিন্ধুপ্রদেশে। পাঞ্জাবে যে ক'জন ইউনিয়নিস্ট মুসলমান নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা গদী বাঁচাবার জন্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ও শিখদের সঙ্গে হাত মেলান। কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

জিন্না সাহেব আপাতত সংবিধান সভা বয়কট করেন। বড়লাট তাঁর ইউরোপীয় পরিষদদের বিদায় দিয়ে ভারতীয় নিতে রাজী। ভারতীয়রা হবেন কংগ্রেসের, লীগের, শিখদের ও আরো দু'একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। নির্বাচিত না হলেও চলে। কারণ এটা হবে ইনটারিম গভর্নমেণ্ট। স্থায়ী সরকার গঠিত হবে সংবিধান রচনার পরে। আর সংবিধান রচনা হবে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার চৌহদ্দির ভিতরে। অর্থাৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করে গোটা তিনেক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখতে হবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ। বাদ-বাকী কেন্দ্রীয় বিষয় বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে তিনটি প্রদেশপুঞ্জের উপরে বর্তাবে। দুটিতে মুসলিম প্রাধান্য. একটিতে হিন্দু প্রাধান্য। প্রদেশগুলির ক্ষমতা যেমনকে তেমন থাকবে। তবে সংবিধান সভা ইচ্ছা করলে কম বেশী করতে পারবে। এই ব্যবস্থায় আসামের হিন্দুদেরকে বঙ্গাসামের মুসলিমদের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ওরা প্রতিবাদ করে। গান্ধীজী ওদের পক্ষ নেন। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতা যত খর্বই হোক না কেন, সৈন্যসামন্ত তার হাতেই থাকবে। আর কেন্দ্রের আয়তন যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, ভোটের জোরে অধিকাংশ মন্ত্রী হবেন হিন্দু। মুসলিমদের ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের মর্জির উপর। মন্ত্রীসংখ্যা

যদি সমান সমান না হয় বা ম্সলিমদের হাতে যদি ভীটো না থাকে তবে ম্সলিমদের অভয় দেবে কে ? অভয় দেবার মতো সেফগার্ড কোথায় ?

যাক, ঐসব প্রশ্ন অপেক্ষা করতে পারে। যেটা অপেক্ষা করবে না সেটা বড়লাটের পরিষদের আমূল পরিবর্তন। পুরাতন আইনের চৌহদ্দির ভিতরে। লিনলিথগাউ ততদিনে বিদায় নিয়েছেন। ওয়েভেল সহানুভূতিশীল। কিন্তু গোড়াতেই বেধে যায় তর্ক। কংগ্রেস বলে সে তার জন্যে বরাদ্দ আসনগুলোর থেকে একটি আসনে একজন ম্সলমানকে নেবে। তিনি আসবেন ম্সলমান হিসাবে নয়, ভারতীয় হিসাবে। আসফ আলী সাহেব নির্বাচিত হয়েছিলেন যে নির্বাচকমণ্ডলী থেকে সেটি হিন্দু-ম্সলমানের যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী। স্বতন্ত্র ম্সলিম নির্বাচকমণ্ডলী নয়। কিন্তু লীগ বলে কংগ্রেসের সে অধিকার নেই, সে অধিকার একমাত্র লীগের। ভারতীয় ম্সলমানদের সেই হচ্ছে একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। বড়লাট কোনো পক্ষকেই আপসে রাজী করাতে পারেন না। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন স্থগিত রাখেন। ক্যাবিনেট মিশন ফিরে যান।

শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন যে ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট করতেই হবে, আর অপেক্ষা করা চলবে না। কংগ্রেসকেই আহ্বান করা হোক বড়লাটের শাসন পরিষদ মন্ত্রিমণ্ডলের ছাঁচে গঠন করতে। কংগ্রেস লীগকে রাজী করানোর ভার নেবে। অ্যাটলী অবশ্য আশা করেন যে লীগ রাজী হবে, কিন্তু জিন্নার উল্টো বিচার। তিনি লীগের কর্মকর্তাদের ডেকে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন যে লীগ সংবিধান সভা কিংবা বড়লাটের শাসন পরিষদ কোনোটাতেই যোগ দেবে না। সে নেবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ। একটা দিনও ধার্য করেন, নাম রাখেন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিবস। খেতাবধারী ম্সলমানদের বলা হয় খেতাব ফিরিয়ে দিতে।

ইতিমধ্যে জবাহরলালজী গিয়ে জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সহযোগিতা চেয়েছিলেন। জিন্না জবাহরলালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে নারাজ হন। তা ছাড়া তাঁর ওই এক কথা। প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে ম্সলিম লীগই ম্সলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এর ত্রিশ বছর আগে ১৯১৬ সালে যে কংগ্রেস লীগ চুক্তি হয়েছিল সেটাও তো এই ভিত্তিতেই হয়েছিল যে ম্সলিম লীগই ম্সলিম পক্ষের প্রবক্তা আর কংগ্রেস হিন্দু পক্ষের। এবারেও সে রকম একটা চুক্তি হওয়া অত্যাবশ্যক, নয়তো কেন্দ্রীয় সরকার কিসের উপর দাঁড়াবে ? নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মর্জির উপর ? জিন্না দরজা বন্ধ করে দেন। জবাহরলাল অন্যান্য ম্সলিম দল থেকে সহযোগী সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হন। যাতে কেউ না বলতে পারে যে ভারতের কংগ্রেস সরকার হচ্ছে আসলে হিন্দু সরকার।

জুলাই মাসের শেষের দিকে যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাব গৃহীত হয় তার তাৎপর্য যে কী তা সহজবোধ্য নয়। খেতাব ত্যাগ থেকে মনে হয় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ। তার পরের ধাপটা বোধ হয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। আরো পরের ধাপ জেলযাত্রা। অর্থাৎ ডাইরেক্ট অ্যাকশন মানে সত্যাগ্রহ। লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে, লীগ কর্মীরা কারাবরণ করলে বড়লাট নিশ্চয়ই বিব্রত হতেন, হতেন ইউরোপীয় অফিসারশ্রেণী, কংগ্রেস মন্ত্রীরাও যে বিব্রত না হতেন তা নয়, যদি মুসলিম জনতা উদ্বেল হয়ে আইন ভঙ্গ করত। সেরকম একটা সম্ভাবনার নোটিশ জিন্না সাহেব বছর কয়েক আগেই দিয়েছিলেন। তার জন্যে আমি মনে মনে তৈরীই ছিলুম।

কিন্তু এ কী কথা শুনি আজ জিন্না সাহেবের মুখে! "এখন আমার হাতেও একটা পিস্তল এসেছে!" পিস্তল দিয়ে তিনি কী করবেন? শ্বেতাঙ্গ নিধন? নাজিমউদ্দীন সাহেব খোলসা করে বলেন, "এইবার দেখা যাবে আতসবাজী।" তার মানে কি গুলীবর্ষণ? বোমা বিস্ফোরণ? ইংরেজদের উপরে কি তাঁর দলের এত আক্রোশ? ডাইরেক্ট অ্যাকশন কি তবে অহিংস থাকবে না? পরিণত হবে সরকারবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে? একজনের এক প্রশ্নের উত্তরে জিন্না সাহেব ভেঙে বলেন যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন হবে দ্বিমুখী। তার এক মুখ কংগ্রেসের দিকে। আরেক মুখ ইংরেজের দিকে। তখন বোঝা গেল পিস্তল আর আতসবাজীর লক্ষ্য ইংরেজ নয়, কংগ্রেস। ইংরেজের উপরে অভিমান করে কয়েকজন নাইট ও নবাব খেতাব ত্যাগ করলেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ একজনও না, কারাবরণ তো বহুৎ দূরের কথা। শেষ পর্যন্ত যেটা ঘটে সেটা আমাদের চিরপরিচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু এবার এর গোটাকয়েক বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমত, যে-ই রক্ষক সে-ই ভক্ষক! যাঁর হাতে পুলিশ তাঁর হাতেই গুণ্ডা। প্রদেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী, গুণ্ডাদেরও তিনি প্রধান মন্ত্রণাদাতা। আমি এর নাম রাখি গুণ্ডার্কি। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তিনি শপথ নিয়েছেন, অথচ মুসলিম লীগ দলপতির নির্দেশে ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসও পালন করেছেন। তাঁর উচিত ছিল আগে পদত্যাগ করা, তার পরে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামা।

দ্বিতীয়ত, কলকাতার হিন্দুরা দশ বছর একটানা মুসলিম শাসনে বাস করে বারুদ হয়ে রয়েছিল। সামান্য একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। পিস্তল দেখাতে চাও? এই দ্যাখ পিস্তল। আতসবাজী দেখতে চাও? এই দ্যাখ আতসবাজী। বরাবরের মাইল্ড হিন্দু একদিনে ওয়াইল্ড হিন্দু বনে যায়। কাপুরুষতা ও বর্বরতার মাঝামাঝি কিছু কি নেই? সশস্ত্র মুসলমানদের সঙ্গে সশস্ত্র হিন্দুর সম্মুখ সমর হোক, কিন্তু নিরস্ত্র নাগরিকের উপর সশস্ত্র জনতার আক্রমণ বা প্রতিশোধ গ্রহণ যে বর্বরতা।

তৃতীয়ত, এতে জিন্না সাহেবের থীসিসই প্রমাণিত হয়। হিন্দুপ্রধান এলাকায়

মুসলমানদের ধন প্রাণ মান নিরাপদ নয়। তাকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে মুসলিমপ্রধান এলাকায় জড়ো হতে হবে। সেইভাবে এক একটি পাকিস্তান গড়ে উঠবে! যেমন পার্ক সার্কাস। কলকাতাই তো ভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কলকাতা আজ যেটা ভাবে ভারত কাল সেটা ভাবে। সারা দেশটাই হয়ে উঠবে একটা দাবাখেলার ছক। যেখানে চিরদিন হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করে এসেছে, কেউ কাউকে অবিশ্বাস করেনি, সেখান থেকে হয় হিন্দুরা পালিয়েছে নয় মুসলমানরা পালিয়েছে। বীরপুরুষরা গড়ে তুলেছেন পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান। ষোলই অগাস্ট যা কলকাতায় শুরু হয়, পনেরোই অগাস্ট তাই দেশভাগে ও প্রদেশভাবে সারা হয়। মাঝে একটি বছর।

চতুর্থত, ইংরেজ গভর্নর ও তাঁর ইংরেজ অফিসারগণ এমন ব্যবহার করেন যেন তাঁরা পদে ইস্তফা দিয়েছেন, মাইনে নিচ্ছেন না, নিরপেক্ষ দর্শকরূপেই তাঁদের অবস্থান। চোখের সামনে নিরীহ হিন্দু বা নিরীহ মুসলমান খুন হয়ে যাচ্ছে, তবু তাঁরা হাত পা নাড়বেন না। তাঁরা যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরিত করেছেন! হস্তক্ষেপ করলে যদি মুসলিম লীগ চটে যায়! খেতাব ত্যাগ থেকে যদি আরেক কদম এগিয়ে সাহেব লোকের বাবুর্চি খানসামা বন্ধ করে!

ময়মনসিংহে বদলীর আগেই খবর পেয়েছিলুম যে ইউরোপীয়রা পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পেলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে রাজী আছেন। আরো আগে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক একজন বাঙালী ভদ্রলোককে বলেছিলেন, "বিশ্বাস করুন, আর আমরা এদেশে থাকতে চাইনে, কিন্তু যাই কী করে? আমাদের যে কতকগুলো দায়িত্ব আছে।" সেই জাপানী যুদ্ধের সময় থেকেই তাঁদের প্রেস্টিজ কমে গেছে। সরকারী কর্মচারীদের বাড়িতেই গাওয়া হয়, "কদম কদম বঢ়ায়ে যা।" সরকার শুনেও শোনেন না। লোকের রাজভয় ভেঙে গেছে। ইংরেজদেরও আর শাসনকার্যে মন নেই। জানেন যে যুদ্ধের পরে ভারতের স্বায়ত্তশাসন অনিবার্য। ভারতীয়দের শায়েস্তা করে কী হবে? আর হিন্দু মুসলমান যদি মারামারি করতে চায় তো করুক। বাধা দিয়ে ইংরেজরা অপ্রিয় হতে যাবে কেন?

বাংলাদেশে গভর্নরের শাসন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেও ছিল, কিন্তু সেটার কারণ মুসলিম লীগের গৃহবিভেদ। হক, নাজিম, সুহরাবর্দী সাহেবদের ঘরোয়া দলাদলি। মাস পাঁচেক যেতে না যেতে আবার যদি গভর্নরের শাসন হয় তো ইংরেজরাই কায়েম হবে। তাঁদের যে কতগুলো দায়িত্ব আছে। আমরা যারা ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হতে চাই তারা গভর্নরের শাসন চেয়ে নিতে পারিনে। এতে মিছিমিছি মুসলিম লীগকে চটিয়ে দেওয়া হয়। একে তো ওদের হাতে মাত্র দুটি প্রদেশের শাসনভার। তার একটি গেলে বাকী থাকে সিন্ধুপ্রদেশ।

অথচ ওদিকে চলেছে বড়লাটের শাসন পরিষদে কংগ্রেসের অভিষেকের উদ্যোগ। যার অর্থ মুসলমানদের অনেকের মতে হিন্দুরাজ। আমার সহকর্মীরা এতে খুব খুশি নন। এতকাল পরে দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে এর যা আনন্দ তার চেয়েও প্রবল মুসলিম অফিসারদের ভবিষ্যৎ কী হবে তাই ভেবে নিরানন্দ। কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়ে লীগও যদি থাকত তা হলেই তাঁরা উদ্বেগমুক্ত হতেন। পার্টিশন তাঁরা চান না। তাঁরা চান কোয়ালিশন। সর্ব স্তরে কোয়ালিশন। সর্বত্র কোয়ালিশন। ওটা শুধু ওদের নয়, আমাদেরও কাম্য। বাংলাদেশে কোয়ালিশন অপরিহার্য। গভর্নর কি স্বহস্তে চিরকাল শাসন করবেন? আবার যখন মন্ত্রীমণ্ডলের উপর শাসনভার পড়বে তখন আবার কি সেই মুসলিম লীগই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসন চালাবে? আরেকবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কি আর কোনো পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে? যথা, কংগ্রেস? না, কংগ্রেস যদি কখনো ক্ষমতায় আসে তো শরিকহিসাবে আসবে। এককভাবে নয়। আমাদের একমাত্র ভরসা কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস শক্ত হয়ে বসলে উপর থেকে নিচে চাপ পড়বে।

সেপ্টেম্বর মাসে বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। সেই ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলের পরে এই প্রথম পুনর্গঠন। ভারতীয়রা সমস্ত দফতরে। মাথার উপরে ইংরেজ, কিন্তু তিনি এখন ইংলণ্ডের রাজার মতো শাসনক্ষমতা-শূন্য। সেই ১৮৮৫ সাল থেকে কংগ্রেস যে স্বপ্ন দেখে এসেছে সে আজ সফল। মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত অভিভূত। স্বাধীনতার যা অন্তঃসার তা তো হাতে এসে গেল। বাকী রইল সংবিধান। সেটাও কি বছর দুয়েকের মধ্যে সম্ভব হবে না? না হলে আবার পদত্যাগ। আবার অসহযোগ। আবার সত্যাগ্রহ। ইতিমধ্যে চেষ্টা চালাও, যাতে হিন্দু-মুসলমানে মিটমাট হয়।

কিন্তু কী করে মিটমাট হবে, যদি মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ না দেয়? আর হিন্দু-মুসলমানে মিটমাট না হলে ইংরেজরাই বা বিদায় নিচ্ছে কী করে? ভারতের ভার সঁপে দিয়ে যাবে কার হাতে? কেবলমাত্র কংগ্রেসের হাতে? না, সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের একটা দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া পেনসন ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্নেরও একটা বহুদলীয় মীমাংসা চাই। একটিমাত্র দলের মর্জির উপর ছেড়ে দিলে সে যা খুশি দর হাঁকবে। দরাদরির জন্যে চাই আরেকটা দল। দূরদর্শী ইংরেজ দরাদরির সুবিধার জন্যেই মুসলিম লীগের পত্তনে প্রশ্রয় দিয়েছিল। নইলে কংগ্রেসের হাঁক হতো আকাশছোঁয়া।

বড়লাট কংগ্রেসকে খানার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে মুসলিম লীগকে ডেকে নিয়ে আসেন। ওদের অবস্থাটা তখন 'ডাকিলেই খাইব'। জিন্না সাহেব আসেন না, তিনি অভিমানী পুরুষ। আরো চারজনকে নিয়ে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান আসেন। কিন্তু সেই চারজনের একজন তফশীলী হিন্দু।

মুসলিম লীগের যুক্তিটা হলো এই যে কংগ্রেস যদি তার ভাগের একটা আসন একজন মুসলমানকে দিতে পারে তবে লীগও তার আসনের একটা একজন তফশীলী হিন্দুকে দিতে পারে। কংগ্রেসের মনে রাগ, কিন্তু মুখে তখন বাদশাহী ভোগ। ছেড়ে দেয় তার কয়েকটা ডিশ। কংগ্রেস শক্ত হয়ে বসার পূর্বেই লীগপন্থীরা জাঁকিয়ে বসেন। কংগ্রেসের তখন ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা।

আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে এইবার আসছে প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। তা হলে আমরা হিন্দু মুসলমান অফিসার নিরুদ্বেগে কাজ করতে পারব। আর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে না। ইংরেজরা যখন বিদায় নেবে তখন আমরা একজোট হয়ে শান্তিরক্ষা করতে পারব, নিজেরাই দুভাগ হয়ে যাব না। আমার মুসলিম সহকর্মীরা হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করতেন দাঙ্গা নিবারণ করতে। পুলিশ সাহেব মজফ্‌ফর আলী খানকে শহরে পাওয়া যেত না, তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন ছদ্মবেশে। আর জেলা শাসক নূরন্নবী চৌধুরী সাহেব তো জেলা বোর্ডের একজন পদস্থ অফিসারের আস্তানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে শহরকে বাঁচান। এসব উপরওয়ালাদের নির্দেশে নয়, কর্তব্যের অনুরোধে। এঁরা যদি নিষ্ক্রিয় হতেন, তা হলে নোয়াখালীর পুনরাবৃত্তি ময়মনসিংহেও ঘটতে পারত। একা গান্ধী ক'টা জেলা সামলাতে পারেন?

নোয়াখালী যাবার পথে গান্ধীজী কলকাতার মুসলিম লীগের সাক্ষাৎকারীদের বলেন তিনি কোয়ালিশনে বিশ্বাস করেন না। কথাটা আমার মনে ধরেনি। কোয়ালিশন ছাড়া আর কী হতে পারে বাংলাদেশে? মুসলিম লীগের একক শাসন কি অনন্তকাল চলবে? না ইংরেজ গভর্নরকেই আমরা বলব শাসনভার হাতে নিতে ও হাতে রাখতে? গান্ধীজী যখন নোয়াখালী যান তখন লোকের ধারণা ছিল যে তিনি নতুন এক প্রকার সংগ্রামের পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন। সংগ্রামটা ইংরেজের সঙ্গে নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গেও নয়, দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের সঙ্গে। কিন্তু পরে দেখা গেল বিহারী হিন্দুরাও দাঙ্গার দ্বারা দাঙ্গার শোধ তুলছে। নোয়াখালীর সঙ্গে হিংস্রতার কোনো তফাৎ নেই। বরং তফাৎ আছে মাত্রার। বিহারে মরেছে আরো বেশী লোক। কলকাতার চেয়েও নোয়াখালী আর বিহার আরো উদ্বেগজনক। কলকাতায় এক সম্প্রদায়ের লোক যেমন মরেছে তেমনি আর এক সম্প্রদায়ের লোককেও মেরেছে। দুপক্ষই এই বলে সান্ত্বনা পেতে পারে যে "আমরাও মেরেছি"। কিন্তু নোয়াখালীতে বা বিহারে যারা মরেছে তারা মারেনি, যারা মেরেছে তারা মরেনি। কোনো সান্ত্বনাই নেই নোয়াখালীর হিন্দুর বা বিহারের মুসলমানদের। অবশ্য ওরা যদি অহিংসার বিশ্বাস করত তাহলে হিংসার উত্তর দিত অহিংসায়। সেটাই হোত

মহৎ প্রতিশোধ। কিন্তু তা নয়। হিংসার সামর্থ্য নেই বলে প্রতিশোধের বরাত দিচ্ছে ভিন্ন প্রদেশের হিন্দুকে বা মুসলমানকে। এর নাম কাপুরুষতা। শুধু তাই নয়, এতে বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের, বিহারী হিন্দুদের সঙ্গে বিহারী মুসলমানদের ভ্রাতৃসম্পর্ক বা প্রতিবেশী সম্পর্ক কেটে যায়। অথচ বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে বিহারী হিন্দুদের বা বিহারী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের যে ভ্রাতৃসম্পর্ক বা প্রতিবেশী সম্পর্ক জন্মায় তা নয়। সেটা মায়া।

শান্তিস্থাপন তো আমরা সরকারী কর্মচারীরাও যথাসাধ্য করছিলুম, সেটাই কি সেদিন যথেষ্ট? না, আরেকটা জিনিসের দরকার ছিল, সেটা রাজনৈতিক সমাধান। একদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের, আরেকদিকে ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের রাজনৈতিক সন্ধিস্থাপন। শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে বড়লাটের ক্ষমতার হস্তান্তরঘটিত আলাপ আলোচনা। ইংরেজরা এ দেশের শাসনভার ছেড়ে দিলে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা হবে কী ভাবে? সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা যদিও ইংরেজদের মাথাব্যথার কারণ নয়, তা হলেও ভারতকে তো তারা তাদের শত্রুপক্ষের কবলে পড়তে দিতে পারে না, দিলে বিশ্বরণাঙ্গণে শত্রুপক্ষই প্রবলতর হবে। ইউরোপীয় তথা ভারতীয় অফিসারদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও ছিল। ভারতীয়দের অনেকে বিভিন্ন আন্দোলন দমন করতে গিয়ে নেতাদের অপ্রিয় হয়েছিলেন। নেতারা কি তাঁদের বিশ্বাস করতে পারবেন? তাঁরাও কি পারবেন নেতাদের বিশ্বাস করতে? তাঁরা যদি পেনসন ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে অবসর নিতে চান, তা হলে কি তাতে আপত্তির কিছু আছে? এখানে বল্লভভাই একেবারে অনড়। তিনি ভারতীয়দের পেনসন দিতে রাজী, কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে নারাজ। তিনি অবশ্য অভয় দেন যে সকলের প্রতি তিনি সমদর্শী হবেন, ব্রিটিশ আমলের কৃতকর্মের দরুন কারো ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে না। কিসের জন্যে ক্ষতিপূরণ? একই সুযোগ সুবিধা তো নতুন আমলেও মিলবে। বরং পদোন্নতি আরো সহজ হবে।

আর সব জট একে একে খুলে যায়, কিন্তু একটা জট কোনো মতেই খোলে না। কংগ্রেস ও লীগ সরাসরি কথা বলবে না, বাক্যালাপ বন্ধ। কথাবার্তা যেটুকু চলে সেটুকু বড়লাটের মধ্যস্থতায়। অচল অবস্থা দেখে বড়লাট মনে মনে স্থির করেন যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় যেমন সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে অপসরণ করতে হয় সেইরকম কিছু করবেন। কংগ্রেস বা লীগ কারো হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করবেন না, কারো সঙ্গে সন্ধি করবেন না। তখন হয় ওরা পরস্পরের সঙ্গে লড়বে, নয় ওরা পরস্পরের সঙ্গে মিটমাট করবে। অচল অবস্থার অবসান হবে সেইভাবে। আর কোনো পথ নেই। তাঁর এই পরিকল্পনা তিনি যেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন অমনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। তাঁর পলিসি না-মঞ্জুর হয়। মিস্টার অ্যাটলী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮

সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করবে। ভারতের নেতারা যদি একমত হন তবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে যৌথ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে। নতুবা ব্রিটিশ সরকার ভেবে দেখবেন আর কোন বন্দোবস্ত করা যায় কিনা। তাঁর ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারির ঘোষণা পাকিস্তানের নাম করে না, কিন্তু ইঙ্গিত দেয়।

তার আগেই জানুয়ারি মাসে গভর্নর সার ফ্রেডরিক বারোজ ময়মনসিংহ পরিদর্শনে আসেন। একদিন ডিনারে ডাকেন আমাদের। বলেন, "হিন্দু মুসলমান যদি লড়তে চায় লড়ুক, তা বলে আমরা কেন রিং ধরে বসে থাকব? আমরা যাচ্ছি। শাসন করতে আর আমাদের ইচ্ছা নেই। সাম্রাজ্য চলে গেলেও বাণিজ্য থাকবে। আয়ারল্যান্ডে তাই হয়েছে। স্পেনে আর আরজেনটিনায় তো আমাদের সাম্রাজ্য নেই, কিন্তু বাণিজ্য দিন দিন বাড়ছে। বাণিজ্যের খাতিরে সাম্রাজ্য রাখতে হবে কেন?"

ইংরেজরা যে যাচ্ছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। এখন একমাত্র প্রশ্ন, কংগ্রেস আর লীগ মিলেমিশে ব্রিটিশ শক্তির শূন্যতা পূরণ করতে পারবে কিনা! শূন্যতা পূরণ কি এককভাবে কংগ্রেস বা লীগ করতে পারে না? না, কলকাতা, নোয়াখালী আর বিহারের পর আর সেকথা বলা চলে না। কোয়ালিশন সরকার চাইই চাই। তা সে যত ক্ষুদ্র কেন্দ্রেই হোক। হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সৈন্য মিলেমিশে কাজ করতে না পারলে সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রও অচল হবে। সিভিল অফিসারদের সম্বন্ধেও একই কথা। মিলেমিশে কাজ করতে না পারলে দেশময় অনর্থ বাধতে পারে। যার পরিণতি গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ কে চায়?

কিন্তু কোয়ালিশন সম্ভব হলে তো? যেটা সম্ভব হয়েছিল পাঞ্জাবে সেটাও ভেঙে যায়। গভর্নর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। হিন্দু আর শিখ নেতারা বলেন মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁদের কোয়ালিশন হবার নয়, মুসলিম লীগও যে আর কারো সঙ্গে কোয়ালিশন করতে পারে তাও নয়। প্রদেশ ভাগই একমাত্র সমাধান। এর পিছনে ছিল একচোট দাঙ্গাহাঙ্গামার তিক্ত অভিজ্ঞতা। প্রধানত মুসলিম বনাম শিখ। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু প্রদেশ ভাগ করলেই কি দাঙ্গাহাঙ্গামা থামবে? না আরো বাড়বে? এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। হিন্দু ও শিখ নেতারা চান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে। সারা পাঞ্জাবে যখন সম্ভব নয় তখন পূর্ব পাঞ্জাবে। তার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবে যে মুসলিম লীগ একক মন্ত্রিত্ব গঠন করবে এটা তাঁদের কাছে অনিষ্টকর মনে হয়নি। পাঞ্জাব অবিভক্ত থাকলে মুসলিম লীগ কিছুতেই এককভাবে মন্ত্রিত্ব করতে পারত না, তাকে কংগ্রেসের সঙ্গে বা শিখদের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হতোই। পুনর্বার নির্বাচনেও তার লাভ হতো না, কারণ আইনসভার আসনগুলিতে ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছিল শিখদের, মুসলমানদের নয়। পশ্চিম পাঞ্জাব সৃষ্টি করে মুসলিম লীগকে তার উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব করতে দিলে সেখানকার হিন্দু ও শিখরা যে

আরো অসহায় হবে এটা কারো মাথায় আসেনি। লীগ থেকে যদি অমন প্রস্তাব উঠত তা হলেও কথা ছিল। দুই পক্ষের সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে যদি তেমন প্রস্তাব গৃহীত হতো তা হলেও কথা ছিল। কিন্তু যেমন করে হোক গভর্নরের শাসন রোধ করার জন্যে কংগ্রেস কর্তারাও হয়ে ওঠেন ব্যাকুল। যেন সেটাই সব চেয়ে মন্দ। যেন পশ্চিম পাঞ্জাবে লীগ শাসন তার চেয়েও মন্দ নয়। লীগ যেটা কোনোদিনই একার জোরে পেত না, হয়তো চাইতও না, ঠিক সেই জিনিসটা তার মুখে যুগিয়ে দেওয়া যেন খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। মুসলিম লীগ যে বিনা চেষ্টায় অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে কৃতার্থ বা কৃতজ্ঞ হলো তা নয়। তার দাবী আধখানা নয়, গোটা পাঞ্জাব। যদিও আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তার কিংবা তার সম্প্রদায়ের। দাবীটাকে গায়ের জোরে হাসিল করতে গেলে সে দেখত গায়ের জোর তার প্রতিপক্ষেরও কম নয়। সত্যিকার সমাধান যেটা সেটা হতো সরাসরি কথাবার্তার ভিতর দিয়ে। সেটা কোয়ালিশনও হতে পারত, পার্টিশনও হতে পারত। কিন্তু সেটা না হয়ে যেটা হলো সেটা একতরফা। সেটা হিন্দু শিখের তথাকথিত স্বার্থে। আসলে লীগপন্থী মুসলমানেরই স্বার্থে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে দশ বছর কেটে গেছে, বাংলাদেশে ক্ষমতার মুখ দেখেনি কংগ্রেস। তার বিপুল ত্যাগ সত্ত্বেও সে আইনসভায় সংখ্যালঘু। তার একমাত্র আশা মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন। কিন্তু কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গাহাঙ্গামার পর সে আশাও সুদূরপরাহত। তা হলে কি পাঞ্জাবের পথই বাংলার পথ? প্রদেশকে দু'ভাগ করে একভাগ পাবে কংগ্রেস, আরেকভাগ মুসলিম লীগ? মুসলিম লীগ কি এতে কৃতার্থ বা কৃতজ্ঞ হবে? না, তার দাবী বাংলাদেশের ষোল আনা। কী করে সেটা সে পাবে? গায়ের জোরে। গায়ের জোর কি হিন্দুরও কিছু কম? সে কি আর সেই মাইলড হিন্দু? সে এখন ওয়াইলড হিন্দু। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন ছিল সরাসরি কথাবার্তার। একসঙ্গে বসে স্থির করা হতো কোনটা গ্রহণীয়? কোয়ালিশন না পার্টিশন? একতরফা সিদ্ধান্তে অপরপক্ষের আপত্তি। তাতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নিষ্কণ্টক হতে পারে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু আরো অসহায়। পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতারা বহুদিন থেকেই কলকাতাবাসী। কলকাতার স্বার্থই তাঁদের কাছে পরমার্থ। পূর্ববঙ্গ সফর করে তাঁরা হিন্দুদের বোঝান যে প্রদেশ ভাগ হলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একটা ঠাঁই থাকবে। যেখানে তাঁরাই বলবান।

ময়মনসিংহে থাকতে কলকাতা থেকে একটি পুস্তিকা পাই। লেখক একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। প্রদেশ ভাগের পক্ষে তিনি ওকালতি করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভাগেরও। একটার সঙ্গে অপরটা জড়িত। দুটোই তাঁর মতে মন্দের

ভালো। নয়তো হিন্দু-মুসলমানের মারামারি কোনোদিন থামবে না, ইংরেজও তার সুযোগ নিয়ে কায়েম হবে। পুস্তিকাটা কোনো একজন লীগ নেতার লেখা নয়, হলে আশ্চর্য হতুম না। বিস্মিত হই কংগ্রেস নেতার নাম দেখে। হেসে উড়িয়ে দিই। মাথার উপরে গান্ধীজী রয়েছেন। তাঁকে ডিঙিয়ে কে কী করতে পারেন? কিন্তু নোয়াখালীতে তিনি যার অন্বেষণে পদযাত্রা করছিলেন তা শান্তিস্থাপন, তা রাজনৈতিক সমাধান নয়। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা তখন একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে অধীর। কারণ ইংরেজরা সত্যিই চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুই পার্টিতে কোয়ালিশন যদি না হয় তবে পার্টিশনই হচ্ছে মন্দের ভালো। নয়তো আর যেটা হবে সেটা কুইট ইণ্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি। কংগ্রেস যুদ্ধকালে তার ঝুঁকি নিয়েছিল, কারণ বিকল্প যেটা ছিল সেটা আরো ভয়ানক। ইংরেজ আমাদের জাপানীদের হাতে সঁপে দিয়ে সরে যেত, বর্মায় যেমন করেছিল। এখন আর সে ঝুঁকি নেওয়া যায় না, সামনে নির্ঘাত গৃহযুদ্ধ।

মাউণ্টব্যাটেন যখন বড়লাট হয়ে আসেন তখন কথাবার্তা নতুন করে শুরু হয়। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লাটের। তারপর বড়লাটের সঙ্গে লীগের। তারপর বড়লাটের সঙ্গে কংগ্রেসের। তারপর বড়লাটের সঙ্গে লীগের। পদ্ধতিটা ঘোরালো। ভিত্তিটাও ক্যাবিনেট মিশনের থেকে পৃথক। এবারকার এটা দাবাখেলার ছক। এই ঘরটা কংগ্রেসের, ওই ঘরটা লীগের, কোথাও এমন একটা ঘর নেই যেটা অবিভক্ত বা অবিভাজ্য। র‍্যামজে ম্যাকডোনালড তবু একটা আসন ছেড়ে দিয়েছেন, যেটা দিল্লীর হিন্দু মুসলমান ধর্মনির্বিশেষে পূরণ করতে পারতেন। এবার মাউণ্টব্যাটেন যে রোয়েদাদ গ্রহণ বা বর্জন করতে বলেন তার মর্ম, মুসলমানরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশ বা প্রদেশাঙ্গ মিলে পাকিস্তান। তেমনি হিন্দুরা যেখান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশ এবং প্রদেশাঙ্গ মিলে হিন্দুস্থান। কংগ্রেসের নীতি এবার 'না গ্রহণ না বর্জন' নয়। এবার গ্রহণ। তবে হিন্দুস্থান কথাটা তার পছন্দ নয়। সে তার স্থানের নাম রাখে ইণ্ডিয়া। সেইভাবে অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। লীগ কিন্তু ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে।

মহাত্মা গান্ধী এসব কথাবার্তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন না। ওই দাবার ছক তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। কে কত বেশী পেল না পেল সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথাটা এই যে ভারত এক ও অবিভাজ্য। তেমনি বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য। তেমনি পাঞ্জাব এক ও অবিভাজ্য। তা হলে কি তিনি বর্জন করবেন? না, অধিকাংশ হিন্দু আর অধিকাংশ মুসলমান যা গ্রহণ করছে তা তিনি বর্জন করবেন না। তা হলে কি তিনি গ্রহণ করবেন? না, তাঁর কাছে এটা একটা ব্লাণ্ডার, একটা প্রমাদ। তিনি গ্রহণও করবেন না। পনেরোই অগাস্ট যখন সবাই আনন্দ

করছে তখন তিনি করছেন উপবাস। তবে তিনি কার্যত গ্রহণই করেন, যেমন করেছিলেন ম্যাকডোনালডের রোয়েদাদ।

কংগ্রেসের ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল সে কখনো তার মুসলিম সদস্যদের পথে বসাবে না। বড়লাটের শাসন পরিষদে কংগ্রেসের কোটায় আসফ আলী সাহেবকে আঁকড়ে ধরার ফলেই মুসলিম লীগের সঙ্গে বিচ্ছেদ, তার থেকে ডাইরেকট অ্যাকশন, তার থেকে মারদাঙ্গা, তার থেকে দেশ ভাগ ও প্রদেশ ভাগ। অথচ এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যে স্বাধীনতার পূণ্যলগ্নে খান আবদুল গফফার খানকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হলো। তাঁর চেয়ে বড়ো কংগ্রেস মুসলিম কে? তাঁর মতো ত্যাগের তুলনাই বা ক'জন ভারতীয়ের?

ময়মনসিংহের হিন্দুরা সভা করেন তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে। সেই সভায় যোগ দিতে আসেন কিরণশঙ্কর রায়। আমি তাঁকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করি। তিনি আসেন বেশ রাত করে। সভার কাজ যেন শেষ হতে চায় না। লোকের জিজ্ঞাসার যেন অন্ত নেই। কথাবার্তা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যায়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নামে তিনি জ্বলে ওঠেন। বলেন, "ওঁরা আমাদের অ্যাসেটস নন, ওঁরা আমাদের লায়াবিলিটি। ওঁদের জন্যেই আমাদের এত দাম দিতে হয়েছে।"

হতভাগ্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান! দুই পক্ষই তাঁদের সন্দেহ করে। তবু ভালো যে তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন। গৃহযুদ্ধ হলে হিন্দুরা ওঁদের কোপাত মুসলমান বলে, আর মুসলমানরা কাটত হিন্দুঘেঁষা বলে। কী করে ওঁদের অভয় দেওয়া যায় সেই ভাবনা থেকেই আসে সেকুলার স্টেট। কে হিন্দু আর কে মুসলমান সেটা আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য কে ভারতীয় আর কে পাকিস্তানী। সব অফিসারকে অপশন দেওয়া হয়। কতক মুসলমান ভারতের পক্ষে অপশন দেন। কতক হিন্দু অপশন দেন পাকিস্তানের পক্ষে। পাকিস্তান তখনো ইসল্যামিক স্টেট বনবার আভাস দেয়নি। জিন্না সাহেব তো খোলাখুলি বলেন যে এখন থেকে কেউ মুসলমান নয়, কেউ হিন্দু নয়, সকলেই পাকিস্তানী। নাজিমউদ্দীন, নুরুল আমিন, এঁরাও তেমনি উদার। ময়মনসিংহে আসার কিছুদিন পরেই আমি নুরুল আমিন সাহেবের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তাঁর গৃহে নৈশভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম।

ক্লাবে একদিন ইণ্ডিয়ান পুলিশের এক মুসলিম অফিসার আমাকে বলেন, "আপনারা দেশকে ভালোবাসতেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন না। ভালোবাসলে ভালোবাসা পেতেন।" অপ্রিয় হলেও সত্য। মুসলমানকে কুকুর বেড়ালের মতো দূর দূর করব আর সে আমাদের সঙ্গে এক নেশন হবে! এই তো সেদিন পুলিশ সাহেবের কুঠিতে জল ছিল না। তিনি মুসলমান। প্রতিবেশী এ. ডি. এম. সাহেবের কুঠিতে পানীয় জলের জন্যে কনস্টেবল পাঠান। কনস্টেবলটি

মুসলমান। বাইরের কল থেকে এক বালতি জল নেবে তাও গৃহিণীর মানা। তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁদের জল অশুচি হবে যে! অথচ এই মুসলমান অফিসার সজাগ ও সক্রিয় না থাকলে ময়মনসিংহও নোয়াখালী হতো। আরো চমকপ্রদ কথা এঁরা রাজপুত মুসলমান, এঁদের পরিবারের হিন্দু শাখার সঙ্গে এঁদের বিয়েসাদী হয়। যেযাঁরা যে যার ধর্ম পালন করে, ধর্মান্তরিত হয় না। গোড়ার দিকে ইনি পাকিস্তান চাননি। জিন্না এঁর মতে সাচ্চা মুসলমান নন। কিন্তু শেষের দিকে ইনি বলেন, "এখন আমিও পাকিস্তান চাই।"

ইনি পাকিস্তানের জন্যে অপশন দেন, কিন্তু আমাকে অবাক করে দেন ক্লাবের সেই আই. পি. সাহেব। তিনি ত্রিপুরা জেলার মুসলমান হলেও ভারতের জন্যে অপশন দেন। তেমনি একজন মুসলমান আই. সি. এস.ও দেন ভারতের জন্যে অপশন, যদিও তাঁর বাড়ী পূর্ববঙ্গেই বলে জানতুম। ওদিকে হিন্দু অফিসারদের কতক পাকিস্তানের জন্যে অপশন দেন। আরো দিতেন, আমি তো তাঁদের সেইরকম পরামর্শই দিয়েছিলুম, কিন্তু মুসলিম উপরওয়ালাদের মতিগতি দেখে ও বোলচাল শুনে ভড়কে যান। ফজলে আহমদ করিম সাহেব নাকি তাঁর এক হিন্দু সাবডেপুটিকে বলেন, "পাকিস্তানে থাকতে চান? কেন থাকতে চান? হিন্দুস্থানের হয়ে গুপ্তচরগিরি করতে? হিন্দুস্থানের পঞ্চমবাহিনী হতে?"

এই অবিশ্বাসই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের কাল হলো। সামান্য বেতনে যার চলে না, গ্রামে কিছু জোতজমি আছে বলেই চলে, সেও যাবে পশ্চিমবঙ্গে। কী করে চালাবে? যেমন করে হোক, কিন্তু পাকিস্তানে একটা দিনও নয়। গুণ্ডার ছোরার চেয়েও ধারালো উপরওয়ালার কলম, তিনি হয়তো রিপোর্ট দেবেন যে লোকটা গুপ্তচর। আর সহকর্মীদের জিবও তেমনি ঈর্ষাবিষে বিষাক্ত। তাই ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও যাবে পাকিস্তান থেকে সদলবলে তাদের হোমল্যাণ্ড হিন্দুস্থানে। শুধু যদি চাকুরে শ্রেণী হতো তা হলেও কথা ছিল। চাকুরেদের দেখাদেখি সব শ্রেণী। এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? আগন্তুকদের চাপে যে অধিবাসীরা চাপা পড়বে। তখন রব উঠবে, "চাই লোকবিনিময়"। পাকিস্তানে যদি সারা বাংলা আর সারা আসাম আর সারা পাঞ্জাব পড়ত, তা হলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা গুঁতোর চোটে সত্যি সত্যি লোকবিনিময় ঘটে যেত। আমরা কেউ ঠেকাতে পারতুম না। ভারত পুরোদস্তুর হিন্দুস্থান বনে যেত, সেকুলার স্টেট ভেঙে পড়ত, কাশ্মীরও ভারতে আসত না। আর অবিভক্ত বাংলাদেশ তো বহিরাগত মুসলমানে ভরে যেত, তাদের সংখ্যা হতো তিন কোটি আর অনুপাত শতকরা পঁয়তাল্লিশ। তাদের ভাষা উর্দু হতো সরকারী ভাষা। তাদের সঙ্গে গায়ের জোরে বাঙালী মুসলমান কি এঁটে উঠতে পারত?

আমার দেড় বছরের খুকু আমার জবাকুসুমের শিশিতে হাত দেয়, শিশিটা তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যায়, "তেলের শিশি

ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যেসব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো! তার বেলা?" ময়মনসিংহের জজ কুঠির দোতলার বারান্দায় ঘটে সেই ঘটনা। দোতলা থেকে রোজ গারো পাহাড় দেখতে পেতুম আর ব্রহ্মপুত্র নদ তো আমার বাড়ীর কাছেই, মাঝখানে একফালি পোড়ো জমি। ছুটির দিনে সাঁতার কাটতে যেতুম। তিব্বত থেকে বয়ে আসা জলের অল্পই হয়তো ময়মনসিংহ অবধি পোঁছত। তবু তো মানসসরোবরের জল। আমিও মানসসরোবরের হংস। আর কোনো স্টেশনে সে আনন্দ পাইনি। ময়মনসিংহে পুরো তিন বছর থাকাই ছিল আমার অভিপ্রায়। ততদিনে বড়ছেলের ম্যাট্রিকুলেশন চুকে যেত। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর বিধাতা করেন আরেক।

দেখতে দেখতে দুই শতকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চোখের সামনে মিলিয়ে যায়। শেষ ইংরেজ জেলাশাসক মিস্টার ব্যাস্টিন, ততদিনে নুরন্নবী বদলী হয়ে গেছেন। আমার চেয়ে জুনিয়র এই যুবকটির সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা হয়েছিল। যাচ্ছেন ইনি এঁর স্ত্রীর দেশে, নিউজীলাণ্ডে। ইংলণ্ডে এঁর মুরুব্বির জোর নেই। সেটা না থাকলে চাকরি জোটানো দায়। ইংরেজদের এই এক সমস্যা। পেনসন মিলবে, ক্ষতিপূরণ মিলবে, কিন্তু অসময়ে আই. সি. এস. ছাড়লে সেরকম আর একটা চাকরি মিলবে কোথায়? তাই চাকরির মায়া সহজে কাটতে চায় না। এতদিনে কেটেছে। আর একটা দিনও কেউ থাকতে ইচ্ছুক নয়, যে যেখানে পারে ছিটকে পড়বে। কেউ ইংলণ্ডে, কেউ অস্ট্রেলিয়ায়. কেউ নিউজীলাণ্ডে, কেনিয়ায়, নাইজেরিয়ায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

কিন্তু নিয়ে যেতে পারবে না পুরাতন ভৃত্যদের। আমার বিশ্বস্ত বাবুর্চি আমার সঙ্গে কলকাতা আসতে চেয়েছিল। দাড়ি রাখে না, ধুতি পরে, চেহারা ও চালচলন হিন্দুদের মতো। কিন্তু কলকাতার লোক আজকাল যা অসভ্য হয়েছে একদিন না একদিন আবিষ্কার করবেই যা দেখে মুসলমান চেনা যায়। তখন আমি কি ওকে প্রাণে বাঁচাতে পারব? জাতীয়তাবাদী মুসলমানের মতো সেও তো একটি লায়াবিলিটি। তাকে আমি সীমান্ত গান্ধীর মতো ঝেড়ে ফেলি। বেচারার মুখখানা দেখে মায়া হয়।

তবে মনে মনে আমি সংকল্প করি যে ভারতের মুসলমানকে আমি ভারত থেকে খেদিয়ে দেব না। পাকিস্তান যদি হিন্দুদের খেদিয়ে দেয় তা হলেও আমি পালটা দেব না। এটা শুধু অহিংসাবাদীর কর্তব্য নয়, জাতীয়তাবাদীরও কর্তব্য। জাতি বলতে আমি বুঝি হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান পার্শীর মিশ্র জাতি। ইংরেজরা এদেশে আসার আগেও এদেশের অধিবাসীরা ছিল মিশ্র জাতি। ইংরেজরা চলে গেছে বলে সেই মিশ্র জাতি অমিশ্র হতে পারে না। কংগ্রেসও এটা বোঝে, গান্ধীজীও এটার উপর জোর দেন। আমরা যদি আমাদের সংকল্পে স্থির থাকি, আমাদের পাকিস্তানী ভ্রাতাদেরও সুমতি হবে। সওয়া কোটি বাঙালী

হিন্দুকে পঞ্চম বাহিনী বলে খেদিয়ে দিতে ওঁরা লজ্জা পাবেন। মিশ্র জাতিকে গায়ের জোরে অমিশ্র করতে যাওয়া তাঁদেরও অসাধ্য। সবাইকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান বানাতে তুর্ক মুঘল শাসকরাও পারেননি। জাতীয়তার ভিত্তি যেখানে ধর্ম সেখানে জাতীয়তাই গড়ে উঠবে না। গণতন্ত্রও ধ্বসে পড়বে। যদি কোনোদিন জাতীয়তার ও গণতন্ত্রের সম্যক ধারণা জন্মায় সেদিন পাকিস্তানও হবে আর একটি ভারত। দ্বিতীয় ভারত। তখন শুধু ওর নামটাতেই আমার আপত্তি থাকবে, আর সব আমি মেনে নেব। পৃথক সত্তায় যে কোনো প্রদেশের বা প্রদেশগোষ্ঠির অধিকার আছে। আগেও তো বহু রাজ্য ছিল। ইংরেজরা না এলে সব কটা না হোক গোটাকয়েক তো থাকত।

ময়মনসিংহে আমার দুজন অ্যাডিশনাল জজ ছিলেন। তাই খুনের মামলাগুলো আমাকেই করতে হতো না। আমি শুনতুম সিভিল ও ক্রিমিনাল আপীল। সেইসূত্রে একদিন ফজলুল হক সাহেবকে আমার কোর্টে দেখি। নারীহরণের মামলা, আসামী মুসলমান, স্ত্রীলোকটি হিন্দু, তার স্বামীটি গোবেচারি। হক সাহেব সওয়াল করতে করতে একসময় বলেন, "হাজার হোক, হিন্দু মুসলমানকে একসঙ্গেই থাকতে হবে। আর কোনো বিকল্প নেই।" তাঁর কণ্ঠে কারুণ্য। তিনি ততদিনে সরকার থেকে আউট। বোধহয় আইনসভা থেকেও। রাজা লিয়ারের মতো দশা। দেখে কষ্ট হয়। কবেকার মানুষ হক সাহেব! কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। তার আগে ছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। রাজনীতিক্ষেত্রে বহুরূপী। নইলে মানুষ হিসাবে হৃদয়বান ও উদার।

আরেক ফজলুল হকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি একজন চাকুরে। আমার চেম্বারে বসে গল্প করতে করতে বলেন, "আমাদেরও কিছু জমিদারি সম্পত্তি আছে। অথচ আমাদের আমলারা সবাই হিন্দু।" আমাকে বিস্মিত হতে দেখে বিশদ করেন, "দেখুন হিন্দুরাও খায়, কিন্তু সমস্তটা নয়। মালিকের জন্যে কিছুটা রাখে। আর মুসলমানরা মালিককে একেবারে ফতুর করে ছাড়ে।"

টাঙ্গাইল পরিদর্শনে গিয়ে গজনবী পরিবারের বিখ্যাত গেস্ট হাউসে উঠি। ইউরোপীয় স্টাইলে থাকি। দেখি জমিদারির ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারীরা হিন্দু। এঁদের উপর জমিদারির ভার দিয়ে মালিকরা কলকাতাবাসী।

পার্টিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আমার এক মুসলমান বন্ধু ঢাকা থেকে আসেন দেখা করতে। উৎফুল্ল হয়ে বলেন, "এতদিন পরে বুঝতে পেরেছি হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা আসলে জমিদারের সঙ্গে কৃষক প্রজার, মহাজনের সঙ্গে খাতকের, সরকারী আমলাদের সঙ্গে শাসিতের ও শোষিতের। এইবার মিটবে।"

উত্তম। কিন্তু সাড়ে পনেরো আনা হিন্দু তো জমিদারও নয়, মহাজনও নয়, সরকারী আমলাও নয়। তা হলে নোয়াখালীতে এত নরহত্যা কেন, এত

নারীহরণ কেন, এত ধর্ম পরিবর্তন কেন ? এই নিয়ে আমার মন ভারী ছিল। আমরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এলে এসব কাণ্ড তো জোরকদমে চলবে। তখন কি শুধু নোয়াখালীতেই ?

একদিন কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকীল ও নেতা কামিনীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে বলেন, "যা পড়েছেন, যা শুনেছেন সব অতিরঞ্জিত। নোয়াখালীতে খুন হয়েছে শ'আড়াই। ধর্ষণের কেস খুবই কম। জোর করে যাদের মুসলমান করা হয়েছিল তারা একদিন কি দু'দিন বাদে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হয়েছে। মোল্লাদের কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা।"

দশগুণ কি বিশগুণ অতিরঞ্জিত বিবরণ গান্ধীজীকে দিল্লী থেকে নিয়ে যায় নোয়াখালীতে যে সংকটের মোকাবিলা করতে তার চেয়ে ঢের গুরুতর সঙ্কট ঘনিয়ে আসছিল খাস দিল্লীতেই। বড়লাটের ক্যাবিনেট তখন দুই ভাগে বিভক্ত। কংগ্রেস ক্যাবিনেট ও লীগ ক্যাবিনেট। বড়লাট সিংহাসন ত্যাগ করলে দুই ক্যাবিনেটই হবে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্যাবিনেট। নোয়াখালী থেকে দিল্লীর পরিস্থিতি অনুধাবনই করা যায় না, ঘটনার রাশ ধরা তো আক্ষরিক অর্থে দূরের কথা। রাজনীতিক গান্ধীর নির্বাণ ঘটে রাজধানীর থেকে নির্বাসিত হয়ে নোয়াখালীর প্রান্তরে। সন্ত গান্ধী বেঁচে থাকেন আরো বছরখানেক।

স্বাধীনতা দিবসের একসপ্তাহ পূর্বে আমি বদলী হয়ে আসি হাওড়ায়। সন্ত গান্ধী তখন কলকাতায় জগাই মাধাইকে নিয়ে শান্তি ও মৈত্রীর সাধনায় রত। পনেরোই অগাস্ট এক মহতী বিনষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। মহাত্মা তার মোড় ঘুরিয়ে দেন। সেদিন যা ঘটে তা এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। আমি তার সাক্ষী ও শরিক।

॥ এগারো ॥

পনেরোই অগাস্ট অবিমিশ্র আনন্দের দিন নয়, বহু অশ্রু বহু রক্ত বহু কলঙ্কের বেদনায় মিশ্রিত দিবস। একে অবিমিশ্র আনন্দের করতে কত চেষ্টা হয়েছিল, সব চেষ্টা যে বিফল হলো তা নয়, গান্ধী সুহরাবর্দী প্রফুল্ল ঘোষ সক্রিয় না হলে কলকাতাও হতো দ্বিতীয় লাহোর। তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গও হতো দ্বিতীয় পশ্চিম পাঞ্জাব, তার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিম বঙ্গও হতো দ্বিতীয় পূর্ব পাঞ্জাব। গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ। তবু গৃহযুদ্ধই ব্যাপক আকারে বাধত, যদি না গান্ধীজী থাকতেন ও জীবন পণ করতেন। আর যদি না মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হয়ে পাকিস্তানের গভর্নর

জেনারেল কায়দে আজম জিন্নাকে বেকায়দায় ফেলতেন।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে ক্ষমতার হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ হতো। সেটাই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথমে সেটা গ্রহণ করলেও পরে কংগ্রেস তার চেয়ে বেশী পছন্দ করে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা। ওদিকে মুসলিম লীগও সেটা প্রথমে গ্রহণ করলেও পরে প্রত্যাখ্যান করে। তার চেয়ে বেশী পছন্দ করে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা। কিন্তু কংগ্রেসের মতো দ্বিধাশূন্যভাবে নয়। মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের উপর জোর খাটাননি, কিন্তু লীগকে শাসিয়েছিলেন যে তাঁর প্ল্যান মেনে না নিলে পাকিস্তান কোনো আকারেই মিলবে না। না অখণ্ড আকারে, না খণ্ডিত আকারে। তাঁর এই সাফল্যের জন্যেই কংগ্রেস নেতারা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে রাজী হন। সেটা কানাডার বেলা, অস্ট্রেলিয়ার বেলা, দক্ষিণ আফ্রিকার বেলা যদি স্বাধীনতা হয়ে থাকে তবে ভারতেরও বেলা, পাকিস্তানেরও বেলা স্বাধীনতা। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইনে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অভ ইণ্ডিয়া পদটিই ব্যবহৃত হয়। দেশ সত্যিই স্বাধীন হয়। স্বাধীন ভারত ব্রিটেন প্রমুখ আরো কয়েকটি স্বাধীন দেশের সঙ্গে যুক্ত। ব্রিটেন যতখানি স্বাধীন ভারতও ততখানি স্বাধীন। তবে একটা অদৃশ্য শর্ত ছিল গুরুতর কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভারতকে ব্রিটেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, ব্রিটেনকে ভারতের সঙ্গে নয়।

স্বাধীনতা বলতে সাধারণত বোঝায় ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি। কিন্তু ওর আরো একটা অর্থ চিরটাকাল যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে তাদের হাত থেকেও মুক্তি। অখণ্ড ভারতে তারা হিন্দু। অখণ্ড পাঞ্জাবে তথা বঙ্গে তারা মুসলমান। মুসলিম লীগের প্রাণে ভয় অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা প্রত্যেকটি নির্বাচনে জিতে তাদের মেজরিটি ভোটে সরকার গঠন করবে, সে সরকারে মুসলিম লীগকে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, নিলেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে না, বনিবনা না হলে তাড়িয়ে দেবে। তেমনি কংগ্রেস দলভুক্ত অনেকের আশঙ্কা অখণ্ড পাঞ্জাবে তথা বঙ্গে মুসলমানরা প্রত্যেকটি নির্বাচনে জিতে তাদের মেজরিটি ভোটে সরকার গঠন করবে, সে সরকারে কংগ্রেসকে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, নিলেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে না, বনিবনা না হলে ভাগিয়ে দেবে। নতুন সংবিধান যখন রচিত হতো তখন পাঞ্জাবের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিফলিত হতো, যেটা আগে হয়নি। অথচ বাংলার হিন্দুদের আসনসংখ্যা যতই বাড়ানো হোক না কেন মুসলমানদের আসনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেত না। কংগ্রেস কোনোদিন অখণ্ড পাঞ্জাবে বা অখণ্ড বঙ্গে সরকার গঠন করতে পারত না, যদি না একদল মুসলমান কংগ্রেসকে ভোট দিতে রাজী হতো। যেমন দিয়েছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তেমন

একদল মুসলমানের ভোট সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারলে কংগ্রেস কখনো প্রদেশ ভাগাভাগিতে রাজী হতো না। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সে শুধু রাজী নয়, সে-ই উদ্যোগী হয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে প্রদেশ ভাগের প্রস্তাব জানায়।

বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখার একটা চেষ্টা হয়েছিল। তা হলে সে হতো আরো একটা ডোমিনিয়ন, তার দেখাদেখি হায়দরাবাদ হতো আরো একটা ডোমিনিয়ন, কাশ্মীর হতো আরো একটা ডোমিনিয়ন। এমনি করে বলকানীকরণ হতো। কংগ্রেস বা লীগ কোনো পক্ষই তাতে রাজী নয়। ইংরেজরাও কংগ্রেসের ও লীগের অমতে দুই ডোমিনিয়নকে তিন করতে অনিচ্ছুক। মাউণ্টব্যাটেনের চাপে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য একটা না একটা ডোমিনিয়নের সামিল হয়। বাকী থাকে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর। তিনি যদি চাপ না দিতেন তা হলে বলকানীকরণ এড়ানো কঠিন হতো। জোর জবরদস্তি করতে গেলে গান্ধীজী অনুমোদন করতেন না।

একচক্ষু হরিণের মতো জাতীয়তাবাদীরা দেখছিলেন শুধু একটিমাত্র শত্রু। তা না হলে সেই শত্রুর সঙ্গে একাগ্রভাবে সংগ্রাম করতে পারতেন না। সংগ্রামের জন্যে চাই একাগ্রতা। দুই ফ্রণ্টে লড়াই করতে গিয়ে জার্মানরা গেল হেরে, যেমন কাইজারের আমলে তেমনি হিটলারের আমলে। দুই ফ্রণ্টে লড়তে গেলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও হেরে যেতেন। সেইজন্যে গান্ধীজী মুসলিম লীগের সঙ্গে লড়তে চাননি। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে লড়তেও দেননি। কংগ্রেসের ছিল এক লক্ষ্য, এক ধ্যান। ব্রিটিশ রাজত্বের হাত থেকে মুক্তি। তবে যেন তেন প্রকারেণ নয়। অহিংস উপায়ে। ইংরেজরা গান্ধীজীকে ভুল বুঝেছিল। তাঁদের ধারণা ওটা একটা ছল। অহিংসার আবরণে হিংসাকে ঢাকা দেওয়া। তবে ওরাও হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে ক্ষমতার হস্তান্তর একদিন না একদিন করতে হবেই, তবে এককালে নয়, ক্রমে ক্রমে। প্রথমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, তারপরে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয়করণ, তার পরে সেই সরকারের হাতে সিভিল পাওয়ার সমর্পণ, শেষে মিলিটারি পাওয়ার সঁপে দিয়ে ভারত থেকে অপসরণ। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও ওরা দুই কিস্তিতে দেয়, ১৯২১ সালে ও ১৯৩৭ সালে। কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল অংশটাও দুই কিস্তিতে দিত, ১৯৪২ সালে ও যুদ্ধের পরে কোনো এক সালে। কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ক্রিপস প্রস্তাবে রাজী হয়নি, কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় ব্রিটেনও রাজী হয়নি। দু'পক্ষ রাজী হলে ১৯৪২ সালেই সিভিল পাওয়ার হস্তান্তরিত হতো।

কিন্তু ততদিনে পরিষ্কার হয়েছে যে ব্রিটিশই একমাত্র শত্রু নয়। আরো এক শত্রুর সঙ্গে দরকার হলে লড়তে হবে। তার ঘাঁটি বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ।

কংগ্রেসের এই তিন প্রদেশে না ছিল মেজরিটি, না ছিল সঙ্ঘশক্তি। একটা থানায় বা একটা মহকুমায় জাতীয় সরকার স্থাপন করলে কী হবে, সমগ্র প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য ছিল না। ইংরেজরা যেমন জাপানীদের আক্রমণের মুখে বর্মা ছেড়েছিল তেমনি বাংলা ছাড়তে বাধ্য হলে সেখানে আর যে-ই সরকার গঠন করুক সে কংগ্রেস নয়, সে হয়তো জাপানীদের বশংবদ অন্য এক সরকার। যুদ্ধের পরেও অবস্থার পরিবর্তন কংগ্রেসের অনুকূলে যায় না, যায় লীগের অনুকূলে। লীগেরই মেজরিটি, লীগেরই সঙ্ঘশক্তি। ইংরেজ আর কংগ্রেস দুই পক্ষ মিলে চুক্তিবদ্ধ হলেও লীগ সে চুক্তির দ্বারা বাঁধা থাকত না, সে বিদ্রোহ করত। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" সে বিদ্রোহ দমন করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই ছিল না ইংরেজদের। মুসলমানরা তাদের শত্রু নয় একথা তারা বলে আসছিল কার্জনের আমল থেকেই। শুধু যে বলে আসছিল তাই নয়। কাজের দ্বারাও প্রমাণ করে দিয়ে আসছিল। প্রথম কাজ পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশ গঠন। যেখানে মুসলিম মেজরিটি। পরে বিহার, ওড়িশা ও আসামকে পৃথক করে যুক্তবঙ্গ পুনর্গঠন, সেখানেও মুসলিম মেজরিটি। ইতিমধ্যে ঢাকার নবাববাড়ীতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, তার পেছনেও ইংরেজদের প্ররোচনা। ভূমিষ্ঠ হয়েই সে দাবী করে স্বতন্ত্র নির্বাচনব্যবস্থা। বড়লাট মিণ্টোর শেখানো দাবী। কংগ্রেস গোড়ায় তার বিরোধী ছিল, কিন্তু ১৯১৬ সালে লীগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার বিরোধিতা প্রত্যাহার করে। যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে কংগ্রেস তাদের সংখ্যানুপাতের অধিক ওজন দিতে রাজী হয়। তেমনি যেসব প্রদেশে অমুসলমানরা সংখ্যালঘু সেসব প্রদেশে লীগ তাদের সংখ্যানুপাতের অধিক ওজন দিতে রাজী হয়। এই রাজীনামার অন্তরালে যাঁদের হাত ছিল তাঁরা টিলক ও জিন্না। মণ্টেগু চেমসফোর্ড এরই ভিত্তিতে আসন বণ্টন করেন ও যুক্তবঙ্গে মুসলমানরা যদিও সংখ্যাগুরু তবু অমুসলমানদেরই দেন তাদের চেয়ে বেশী আসন। তাতে এই বিভ্রমের সৃষ্টি হয় যে যুক্তবঙ্গে হিন্দুরাই প্রবলতর পক্ষ, মুসলমানরা নয়। ম্যাকডোনালডের রোয়েদাদ এই বিভ্রমের উপর নিষ্ঠুর আঘাত হানে। ইংরেজরা ১৯৩৭ সালেই বাংলাদেশে একটি মুসলিমপ্রধান সরকারকে সিরাজউদ্দৌলার মসনদে বসিয়ে দেয়। আবার ১৯৪৭ সালে তেমনি একটি মুসলিমপ্রধান সরকারকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা দিত, যদি সে সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করত। সুহরাবর্দী তো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন, যদি ইংরেজেরা অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করে একাধিক ভিত্তিতে করে।

মোট কথা সারা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ইংরেজ বা কংগ্রেস কারো একার হাতে ছিল না, দু'পক্ষের জোড়া হাতেও ছিল না। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে ইংরেজ

কংগ্রেসের সঙ্গে বা কংগ্রেস ইংরেজের সঙ্গে কোনো এগ্রিমেণ্ট সই করলে সে এগ্রিমেণ্ট বাংলায় বা পাঞ্জাবে বা সিন্ধুপ্রদেশে বলবৎ হতো না। সৈন্য পাঠিয়ে বলবৎ করতে গেলে সৈন্যদলেই ভাঙন ধরত। সৈনিকরাও ধর্ম অনুসারে ভাগ হয়ে যেত জনতার মতো। ব্রিটিশ সৈন্য হস্তক্ষেপ করত না। যে এগ্রিমেণ্ট তিনটি প্রদেশে বলবৎ করা যেত না সে এগ্রিমেণ্টের মূল্য কী? তাই প্রয়োজন হলো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বদলে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির, যেটাতে মুসলিম লীগও সই করবে। তেমন একটা চুক্তির পূর্ব শর্ত বিরোধভঞ্জন। কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের। তাও যখন সম্ভব হলো না তখন আর এগ্রিমেণ্ট নয়, এওয়ার্ড। মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান যদিও নামে এওয়ার্ড নয়, তবু কার্যত এওয়ার্ড। যেমন ম্যাকডোনালডের এওয়ার্ড। এবার আর সেবারকার মতো "না গ্রহণ, না বর্জন" নয়। এবার পুরো-পুরি গ্রহণ। নয়তো মাউণ্টব্যাটেন সুহরাবর্দী প্রভৃতিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দিতেন ও ব্রিটেন তাকে স্বীকৃতি দিত। স্বাধীন বঙ্গ অখণ্ড বঙ্গ হতো, ইংরেজ তাকে দ্বিখণ্ড করে দিয়ে যেত না। সেটা তার স্বার্থও নয়। বঙ্গভঙ্গের জন্যে এবার ইংরেজকে দায়ী করা যায় না। এর পরিণামের জন্যে ইংরেজকে দোষ দেওয়া বৃথা। এ আমাদের স্বখাত সলিল। যে প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান সে প্রদেশের মুসলমানদের ইচ্ছাই জয়ী হতো, যদি না তাকে দু'ভাগ করে পশ্চিমভাগে হিন্দুর ইচ্ছাকে ও পূর্বভাগে মুসলমানের ইচ্ছাকে জয়ী হতে দেওয়া যেত। সেদিন হিন্দুর ইচ্ছা পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সামিল করা, মুসলমানদের ইচ্ছা পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের সামিল করা। মাউণ্টব্যাটেন সেই ইচ্ছা দুটি পূরণ করেন। তখন লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। কলকাতায় তাঁদের স্থান নেন কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী।

পনেরোই অগাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। তার আগে থেকেই ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ছায়া মন্ত্রীমণ্ডলী রাইটার্স বিলডিং দখল করে বসেছেন। সুহরাবর্দী সাহেব তখন নামে প্রধানমন্ত্রী। কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করে না। ইংরেজরা আর অফিসে আসেন না, তাঁদের চেয়ারেও এক একজন ছায়া সেক্রেটারি বা চীফ সেক্রেটারি বসেন। ময়মনসিংহে থাকতেই আমি একজন ছায়ামন্ত্রীকে দেখি। কালীপদ মুখার্জি। তিনি গেছেন সরকারী কাজে। সেই সূত্রে কংগ্রেসের কাজে। কংগ্রেস তথা হিন্দু মহাসভার নেতারা সবাই মিলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বুঝিয়েছেন যে, ভয় কী? পশ্চিমবঙ্গ হবে হিন্দুদের নিরাপদ ঘাঁটি। সেই ঘাঁটিতেই বসে তাঁরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরও রক্ষা করবেন। সারা বাংলা যদি পাকিস্তান বনে যায় তবে তো আরো বড়ো বিপদ। তখন কে কাকে বাঁচাবে? ভারত ভাগ যখন অবশ্যম্ভাবী, নইলে গৃহযুদ্ধ, তখন প্রদেশ ভাগই তো মন্দের ভালো।

হিন্দুরা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, এপ্রিল মাসেও কেউ বিশ্বাস করেনি যে অগাস্ট মাসে ইংরেজ চলে যাবে, যাবার সময় দেশ ও প্রদেশ ভাগ করে দিয়ে যাবে। এত কম নোটিসে এত বড়ো একটা পরিবর্তন কেউ কখনো কল্পনা করেনি। আমাদের অপশন দেওয়া হয়। আমরা কে কোন্ ডোমিনিয়নে কাজ করতে চাই। আমি লিখি, আমি চাই সাহিত্যের জন্যে অকালে অবসর নিতে, কিন্তু তার আগে কিছুদিন চাকরিতে থেকে দেশের সেবা করতে। ভারতের পক্ষে অপশন দিই। তখন আমাকে পশ্চিমবঙ্গের সিভিলিয়ান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেকেই চলে যান এই সুযোগে মাদ্রাজ, বম্বে, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অপর প্রদেশে। ইউরোপীয় সিভিলিয়ানরা অবসর ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিদায় হওয়ায় সব প্রদেশেই তাঁদের পদ খালি ছিল। সুতরাং স্থানান্তরে পদোন্নতিও সম্ভবপর। আমার এক বছর আগের সিভিলিয়ানদের পশ্চিমবঙ্গেই পদোন্নতি ঘটে। কারো কারো দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে।

পনেরোই অগাস্টের দিন সাতেক পূর্বে ময়মনসিংহ থেকে হাওড়ার জেলা জজ হয়ে আসি ও সেখানে চৌদ্দই অগাস্ট পর্যন্ত থাকি। তার পরে চলে আসি কলকাতায়, হই শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার ও কৃষি আয়কর ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট। দুটো পদ জুড়ে দিয়ে দু'জনের বদলে একজনের নিয়োগ। দুই ঠিকানায় আপিস। তাতে আমার অখুশি হবার কারণ ছিল না, তবে মন খারাপ হয়ে যেত নিত্য নিত্য বিকলাঙ্গদের দেখে। সমস্ত অন্তরের সঙ্গে তাদের সেবা করি। খাস কামরায় ঝোলানো মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে মনে হতো আমার দেশও বিকলাঙ্গ, প্রদেশও বিকলাঙ্গ। আরো মন খারাপ হতো। এর কি কোনো প্রতিকার আছে? যদি থাকে তবে তা হিন্দু মুসলমানের অন্তঃপরিবর্তন। যার জন্যে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গান্ধীজী। তখনো তিনি কলকাতায়। হিন্দু মুসলমানের হৃদয় যতদিন না জোড়া লাগে ততদিন ভাঙা দেশ ও ভাঙা প্রদেশও আর জোড়া লাগবে না। হৃদয় জোড়া লাগার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, কাজ করতে হবে। ভাঙা হাতের মতো ভাঙা হৃদয়ও একদিন জোড়া লাগতে পারে। এই আমার বিশ্বাস। আমার এই বিশ্বাসে আমি দৃঢ় থাকব। লোকবিনিময় তার উপায় নয়। মুসলমানকে মেরে খেদানো তার উপায় নয়। যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া তার উপায় নয়। গায়ের জোরে পাকিস্তানকে নাশ করা তার উপায় নয়। গ্রাস করা তার উপায় নয়! সমদর্শিতাই তার উপায়। হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতা, ভারত-পাকিস্তানের প্রতি সমদর্শিতা, পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সমদর্শিতা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেই অভিমুখে একটি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ। হিন্দুরাষ্ট্রের মোহ কাটাতেই হবে। তার উপযুক্ত কাল ছিল মধ্যযুগ। আধুনিক যুগ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপযুক্ত কাল। পাকিস্তানও একদিন এ সত্য উপলব্ধি করবে।

ইংরেজী মতে তারিখ বদলে যায় রাত বারোটায়। চোদ্দই অগাস্ট হয়ে যায় পনেরোই অগাস্ট। সে সময় আমি হাওড়ার সারকিট হাউসে নিদ্রার প্রতীক্ষায়। রোজ রাতে যেমন শুনতে পাই তেমনি সে রাতেও শুনি করুণ আর্ত চিৎকার। বস্তিতে গিয়ে মুসলিম উচ্ছেদ চলেছে। কিন্তু পরে জানতে পারি তা নয়। সে রাতে সেটা আনন্দোল্লাস। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার ভুল হয়েছিল শোনার। দুশো বছর পরে পটপরিবর্তন। অভূতপূর্ব! অভাবিতপূর্ব! ইংরেজ শাসন যে সত্যি একদিন শেষ হবে তা ক'জন ভাবতে পেরেছিল! জোর এই পর্যন্ত ভাবতে পারত যে পলাশীর এক শতাব্দী পরে সিপাইবিদ্রোহ, তার আরেক শতাব্দী বাদে আরেক সশস্ত্র বিদ্রোহ বা বিপ্লব ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন। ইতিমধ্যে যা হবার তা ওই স্বায়ত্তশাসন জাতীয় ব্যাপার, যা এক হাতে দিয়ে আরেক হাতে কেড়ে নেওয়া যায়। স্বাধীনতা অত সহজলভ্য নয়।

পনেরোই অগাস্ট সকালবেলা আমাকে হাওড়ার নেতারা এসে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সেখানে পতাকা উত্তোলন করতে হয় আমাকেই। সেখান থেকে যাই জজ আদালতে। সেখানেও করি পতাকা উত্তোলন। আর ইউনিয়ন জ্যাক নয়। স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ নিশান, চক্রলাঞ্ছিত। সেদিন কোনখানে কী বলেছিলুম মনে পড়ে না। মন ভরে রয়েছিল এক অনির্বচনীয় আনন্দে। এতদিন আমাদের পরিচয় ছিল আমরা ব্রিটিশ সাবজেক্ট। এখন আমরা আর কারো প্রজা নই, তাঁবেদার নই। আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। এর পরে শ্রীঅতুল্য ঘোষ দূত পাঠান। সন্ধ্যাবেলা হরিতকীবাগানে একটি গৃহসভায় আমার নিমন্ত্রণ। আমাকেই বসিয়ে দেওয়া হয় আচার্যের বেদীতে। ভাষণ দিতে হয় একমাত্র আমাকেই। সেই আশ্চর্য দিনটিকে সবই অলৌকিক বোধ হয়েছিল। সকলি সম্ভব। স্বাধীনতা যেন সব পেয়েছির দেশ। যা চাইবে দেশের লোক সব পাবে। দুঃখ শুধু এই যে দেশের সিকিভাগ এখন বিদেশ। কাল যারা ভাই ছিল আজ তারা বিদেশী। ঠিক সেই অর্থেই যে অর্থে ইংরেজ ফরাসী জাপানী। এ ব্যথা বহন করতে হবে। দেখতে হবে স্বাভাবিক সম্পর্ক যেন অস্বাভাবিক না হয়। সেদিন সভাশেষে অতুল্যবাবু পাঁচজন মন্ত্রীকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা সেইদিনই শপথ নিয়েছেন। তাঁরাও অভিভূত, আমিও অভিভূত। আজকের এই আরম্ভ যেন শুভ হয়। শুভায় ভবতু।

সেদিন রাস্তায় রাস্তায় লরি বোঝাই মানুষ আনন্দধ্বনি করে চলেছে। বলছে হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। পথে ঘাটে হিন্দু মুসলমান কোলাকুলি করছে। একবছরের ভয় ভীতি রাগ দ্বেষ সব ভুলে গেছে। মহাত্মা তো তাঁর জীবনে বার বার অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন, এটাও আর একটি, হয়তো এইটেই সেরা।

তিনি নিজে কিন্তু শহরের এককোণে আজকের মতো আনন্দের দিনেও উপবাস করছেন। এত যে হৈ-হুল্লোড় কিছুই তাঁকে শান্তি দিচ্ছে না। ইংরেজ গেছে, কিন্তু বিষবৃক্ষ আছে। হিন্দু মুসলমান স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু একসঙ্গে থাকতে পারবে কি না সেটাই আজকের দিনের চ্যালেঞ্জ। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা একসঙ্গে থাকতে পারবে। নয়তো দেশভাগের পরিণাম লোকভাগ ও লোকভাগের পরিণাম যুদ্ধ।

দেশ স্বাধীন হলে কী হবে, সে যদি অহিংসার মূল্য না বোঝে তবে তাকে তার নিজের হাত থেকে বাঁচাবে কে? গৃহযুদ্ধ তার ললাটলিখন। দুই সম্প্রদায়কে দুই নেশন ও দুই খণ্ডকে দুই রাষ্ট্র আখ্যা দিলে কী হবে, দুই নেশন বা দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধও গৃহযুদ্ধ। তেমন যুদ্ধ যদি বাধে তৃতীয় পক্ষ হস্তক্ষেপ করবেই, কার সঙ্গে কার কী গোপন চুক্তি রয়েছে কে জানে! যুদ্ধ যদি না এড়াও তো স্বাধীনতাও হারাবে, তখন তোমাদের নির্বাচিত সরকারও হবে তাঁবেদার সরকার, তোমাদের রাষ্ট্রও হবে অপরের উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট। তাই যুদ্ধের প্রলোভন সংবরণ করতে হবে। তেমনি সংবরণ করতে হবে লোকবিনিময়ের প্ররোচনা, পলিসি হিসাবে সেটা যুদ্ধেরই অগ্রদূত। যারা পালিয়ে আসবে তারা সম্পত্তি ফেলে আসবে ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ বাধাতে চাইবে। যারা পালিয়ে যাবে তারাও সম্পত্তি ফেলে যাবে ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ বাধাতে চাইবে। শরণার্থীদের সংখ্যা যতই বাড়বে চাপ ততই বাড়বে। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় সে রাষ্ট্রে বাস করত প্রায় আড়াই কোটি হিন্দু শিখ। আর এ রাষ্ট্রে বাস করত প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলমান। লোকবিনিময় সর্বাঙ্গীণ হলেও দু'কোটি মুসলমান বাড়তি হয়। তারা যাবে কোথায়, গেলে থাকবে কোথায়? তাদের পুনর্বাসনের জন্যে পাকিস্তান আরো জমি চাইবেই ও তার জন্যে লড়বেই। যদি তারা যায় আর যদি তারা থাকে তবে তারা এত হীনবল হবে যে তাদের উপর নির্যাতন চললে তারা প্রতিকার দাবী করতেও সাহস পাবে না, তাই পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী হবে। যুদ্ধ করতে পাকিস্তানকে উস্কানি দেবে। লোকবিনিময় কারো পক্ষে শুভ হবে না, না ভারতের না পাকিস্তানের, না মুসলমানের না হিন্দুর। গান্ধী জিন্না দু'জনেই ওটা খারিজ করেন।

তা সত্ত্বেও এক প্রকার লোকবিনিময় ঘটে যায় বেসরকারীভাবে, দুই পাঞ্জাবে। সেই ১৯৪০ সাল থেকেই পাঞ্জাবের তিন সম্প্রদায়ই অস্ত্র সংগ্রহ করছিল গোটা পাঞ্জাব জয় করার জন্যে, যদি যুদ্ধে হেরে যায় ইংরেজ। তাদের জঙ্গী মেজাজ অহিংসার ধার ধারে না। শিখেরা ফিরে পেতে চায় রণজিৎ সিংহের শিখ রাজ্য, মুসলমানরা বাদশাহী আমল, হিন্দুরা পৃথ্বীরাজের যুগ। গান্ধী বা কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য খুব কম লোকের ছিল। যদিও লাহোরেই গৃহীত হয়েছিল

স্বাধীনতা প্রস্তাব। আবার জিন্না বা লীগের উপরে আস্থাও বেশী দিনের নয়। প্রভাবশালী মুসলমানরা তাঁদের পুত্রদের পাঠাতেন মিলিটারি সার্ভিসে আর প্রজাদের বলতেন সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে উপার্জনের টাকায় ক্ষেত খামার করতে। অমনি করে ব্রিটিশ ভারতের সামরিক ব্যয়ের সিংহের ভাগ পেত পাঞ্জাব, আর মুসলমানরাই যেহেতু ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদলের শতকরা চল্লিশ ভাগ ও তাদের অধিকাংশ পাঞ্জাবী সেহেতু সে প্রদেশের প্রভাবশালী মুসলমানরাই ছিল পরের ধনে পোদ্দার। তাঁরা বরাবরই লয়ালিস্ট। কিন্তু ইংরেজ প্রস্থানোম্মুখ দেখে পাকিস্তানপন্থী বনে যান। সেই লাহোরেই পাশ হয় পার্টিশন প্রস্তাব। তাঁরা নির্বাচনে মুসলিম লীগকে জিতিয়ে দেন। ভেবেছিলেন সমগ্র পাঞ্জাব পড়বে পাকিস্তানের ভাগে। কিন্তু শিখ ও হিন্দুরা খিজর হায়াৎ খানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন করেন ও খিজর হায়াৎ খানের পতন হলে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের আশা নেই দেখে পার্টিশনের ধুয়ো ধরেন। তাঁরা চান প্রদেশের একভাগ। কংগ্রেস সেটা সমর্থন করে। মাস ছয়েকের মধ্যেই পাঞ্জাব হয় দ্বিখণ্ড। তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শিখ মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। পশ্চিমে যদি শিখ মরে তো পূর্বে মরে মুসলমান। যঃ পলায়তি স জীবতি। এই প্রবাদবাক্য মেনে দলে দলে শিখ মুসলমান পূব থেকে পশ্চিমে ও পশ্চিম থেকে পূবে পালায়। ইংরেজ সরকার থাকতেই। জিন্না সাহেব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারল হয়ে একজন ইংরেজকেই পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর নিয়োগ করেন। যাতে হিন্দু শিখ আশ্বাস পায়। কিন্তু পলায়ন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? পূর্ববঙ্গের গভর্নর পদেও তিনি একজন ইংরেজকেই বসান। তাতে হিন্দুরা তখনকার মতো আশ্বস্ত হয়।

গান্ধীজী তো নোয়াখালী ফিরে যাবেন বলেই কলকাতা এসেছিলেন। কলকাতায় আটকা না পড়লে নোয়াখালী গিয়ে হিন্দুদের অভয় দিতেন। উল্টে ফিরে যেতে হলো দিল্লী, সেখানকার মুসলমানদের অভয় দিতে। তাদের নিরাপদে রেখে যেই তিনি নোয়াখালী ফিরতে যাবেন, তার আগে সেবাগ্রামে গিয়ে কয়েকটা কাজ সেরে নেবেন, অমনি আততায়ীর অস্ত্রে নিধন। ততদিনে আমি কলকাতা থেকে বদলী হয়ে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সেখানেও তাঁর নিধনের রাতে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়েছিল। শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি যে কথাটা ঠিক। ভারতের নানাস্থানে একই কালে মিষ্টান্ন বিতরণও তেমনি সত্য যেমন সত্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত শোকপ্রকাশ। গান্ধীজী কারো চক্ষে মহাত্মা, কারো চক্ষে দুরাত্মা, কারো মতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত হিন্দু, কারো মতে হিন্দুর সর্বনাশ যারা ঘটিয়েছে তিনিই তাদের সর্ব নিকৃষ্ট। তাঁকে হত্যা না করলে নাকি তিনি হিন্দুকে তার সর্বনাশের চরম সীমায় নিয়ে যেতেন। তাঁর অহিংসাই নাকি

হিন্দু ভারতকে নিবীর্য করেছে ও স্বাধীন ভারতকে পাকিস্তানের পদানত করত।

দেশ যেভাবে স্বাধীন হলো তাতে অহিংসার জয় সূচিত হয়নি। গান্ধীজী বলেন, "আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। এতদিন যাকে আমি অহিংসা বলে প্রচার করেছি তা ননভায়োলেন্স নয়, প্যাসিভ রেজিস্টান্স। প্যাসিভ রেজিস্টান্স সংকটের ক্ষণে ভায়োলেন্সের আশ্রয় নেয়।" তবে একথাও তিনি স্বীকার করেন যে কাপুরুষতার চেয়ে ভায়োলেন্স শ্রেয়। কাপুরুষতা হচ্ছে দ্বিগুণ পরিস্রুত ভায়োলেন্স। জাতীয়তাবাদীদেরও তিনি নিন্দা করেন এই বলে যে ইংরেজের উপর অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রেখে সংগ্রাম করলে তার দ্বারা ইংরেজের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো যায় না। যেটা হচ্ছে সত্যাগ্রহের মূল কথা। বিদ্বেষ জাগায় বিদ্বেষ। প্রেম জাগায় প্রেম। অন্তঃপরিবর্তন যেটুকু ঘটেছে সেটুকু সত্যাগ্রহের জন্যেই, যদিও সে সত্যাগ্রহ নিখুঁত ছিল না। নিখুঁত হলে তো মুসলিম লীগেরও অন্তর জয় করতে পারত। জিন্না সাহেবও কি সাড়া দিতেন না ?

ইতিহাস যদি নিয়তি হয়ে থাকে তবে "নিয়তি কেন বাধ্যতে" ? নিয়তিকে বাধা করতে পারে কে ? গান্ধীও না, জিন্নাও না। হিংসাও না, অহিংসাও না। সে তার অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুসারেই কাজ করে যায়। যে দেশে গণতন্ত্র ছিল না সে দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর প্রশ্ন উঠবেই। কংগ্রেসের মতে কংগ্রেস রাজনৈতিক অর্থে মেজরিটির প্রতিনিধি, লীগের মতে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক অর্থে মেজরিটির প্রতিনিধি। ব্রিটিশ সরকারের মতও মুসলিম লীগের মতের অনুরূপ। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আদি থেকেই কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে কোল দিয়েছে, তবু মুসলমানদের সংশয়মোচন করতে পারেনি, ইংরেজদেরও না। গান্ধীজী যখন বড়লাটের সঙ্গে কথা বলতেন তখন তিনি ভারতীয় স্বার্থের প্রহরী। যখন জিন্না সাহেবের সঙ্গে কথা বলতেন তখন তিনি হিন্দু স্বার্থের রক্ষক। জিন্না সাহেবের সঙ্গে তাঁর গোড়ায় যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে জিন্না সাহেব যদি সংখ্যানুপাতের দ্বিগুণ ওয়েটেজ দাবী করেন গান্ধীজী কেমন করে রাজী হবেন ? প্রত্যেকটি সম্প্রদায় যদি দ্বিগুণ ওয়েটেজ দাবী করে তবে তিনি কোন সম্প্রদায়ের ভাগ থেকে কেটে সে দাবী মেটাবেন ? হিন্দুরাই তখন একটি মাইনরিটিতে পরিণত হবে। গান্ধীজী তাই স্থির করেন যে ওয়েটেজ তিনি কোনো সম্প্রদায়কেই দেবেন না। যে যার সংখ্যানুপাত অনুসারে আসন ইত্যাদি পাবে। এতে জিন্না সাহেবের অসন্তোষ। ওয়েটেজ না নিয়ে তিনি ছাড়বেন না। তার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে যাবেন। তাঁরাই বা কার ভাগ থেকে কেটে একে ওকে তাকে ওয়েজেট বিতরণ

করবেন? হিন্দুর ভাগ থেকেই তো? সেটারও একটা সীমা আছে। সে লাইনে আর এগোতে না পেরে জিন্না অন্য লাইন ধরেন। আসন ভাগ ইত্যাদির পরিবর্তে ভূমি ভাগ। ভারত ভাগ। পাকিস্তান। এক্ষেত্রেও হিংসা অহিংসা অবান্তর। তিনি বিশুদ্ধ শাসনতান্ত্রিক উপায়েই পাকিস্তান অর্জন করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে লীগপন্থীদের জিতিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ইনটারিম গভর্নমেণ্ট গঠনের জন্যে কংগ্রেসকে আহ্বানের সিদ্ধান্ত তাঁকে ডাইরেকট অ্যাকশনের দিকে ঠেলে দেয়। সেটা নিয়ন্ত্রণের অভাবে হিংসার দিকে মোড় নেয়। ফলে ১৯৪৬ সালের ষোলই অগাস্ট যার শুরু ১৯৪৭ সালের পনেরোই অগাস্ট তার শেষ। হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিয়তি সেই একটি বছরেই নির্ধারিত হয়ে যায়। সেটা কেবল উভয়ের সম্মতিতে নয়, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায়। কিন্তু গান্ধীজীকে কোনো মতেই দায়ী করা যায় না। পাকিস্তান না দিয়ে মুসলিম মাইনরিটিকে ও তারই মতো অন্যান্য মাইনরিটিদের তিনি যদি বাড়তি কিছু দিতেন তা হলে হিন্দু স্বার্থ কম ক্ষুন্ন হতো না। কিছুই না দিলে তো গৃহযুদ্ধ ও তার থেকে উদ্ধারের জন্যে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য প্রার্থনা। দেশের লোক সেই পরিমাণ অহিংসার জন্য প্রস্তুত ছিল না যে পরিমাণ গৃহযুদ্ধনিবারক। মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস বনবাসে যেত না রামচন্দ্রের মতো। গেলে লীগও পারত না দেশকে আয়ত্তে রাখতে।

বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মোগল আমলে সেটা সারা ভারতকে আয়ত্তে রাখতে পারত না, বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে অক্ষম ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমল সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। সারা ভারতটাই ওদের আয়ত্তাধীন। প্রদেশগুলো প্রত্যক্ষভাবে, দেশীয় রাজ্যগুলো পরোক্ষভাবে। এটা এমন একটা বিবর্তন যেটা ভারতের ইতিহাসে একান্ত আবশ্যক ছিল বলেই ভারতীয়রা পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করেছিল। সে জ্বালা যখন অসহ্য হলো তখন দেখা গেল কংগ্রেস এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বহনে অসমর্থ। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বঙ্গ তার আয়ত্তাধীন নয়। বড়লাট আছেন বলেই শান্তিরক্ষা। মুসলিম লীগও এককভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ববহনে অপারগ। চাই দুই শরিকে মিলে মিশে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মভার পরিচালনা, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ থাকতেই তারা স্বন্দরত। বিদায় নিলে তো বিচ্ছিন্ন হতোই। কে তাদের জোড় মেলাতে পারত। আল্লা? ঈশ্বর? না, তিনিও না। গান্ধীজী তো ননই।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিবর্তনে বহু শতাব্দী পরে ছেদ পড়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য। তবু ভালো যে, সাতটি প্রদেশ, দুটি খণ্ডিত প্রদেশ, রাজধানী দিল্লী ও বিপুলসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। তার আয়তন

প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ব্রিটিশ ভারতের চেয়েও বৃহৎ। আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনে ছেদ পড়লেও তার ক্ষতিপূরণও এইভাবে হয়। পরে যখন ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান রচিত হয় তখন সেটা হয় সর্ববাদীসম্মত। স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা রদ হয়। ওয়েটেজ পরিত্যক্ত হয়। চাকরিবাকরিতে সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ কেবল তফশীলী হিন্দু ও আদিবাসীদের বেলাই স্বীকৃত হয়। তাও সাময়িক-ভাবে। পূর্ববর্তী চল্লিশ বছরের সযত্নরোপিত বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হয় এইভাবেই। এটা কিন্তু মুসলিম লীগ থাকতে সম্ভব হতো না। ডালপালা সমেত বিষবৃক্ষটিকে সংবিধানের ভিতরে সংরক্ষণ করতে হতো। নইলে তাই নিয়ে বেধে যেত তাণ্ডব।

স্বাধীনতার তিন সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচলক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, এককোটি মানুষ পালিয়ে বাঁচে, ধর্ষিতা ন্যরীর তো লেখাজোখা নেই। তার জের টানা হয় ক্ষেপে ক্ষেপে ও পরিশেষে ১৯৭১ সালে। শরণার্থী চলাচল এখনো থামেনি। এটা বোধ হয় একতরফাও নয়। মানুষে মানুষে ধর্মের অমিল এখনো ভাষার মিলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তা হলেও আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন ঠিক পথেই চলেছে।

স্বাধীনতা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা যা চেয়েছিলুম তা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। গান্ধীজী আমাদের বলে যান যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেইসঙ্গে অর্জিত হয়নি, তাকে পরে অর্জন করতে হবে। সেদিক থেকে কাজ এখনো বাকী। তাই স্বাধীনতা দিবসে আমরা প্রাণভরে আনন্দ করতে পারিনে। অধিকাংশ লোকের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য আমাদের আনন্দ উৎসবকে লজ্জা দেয়। তারা যদি হতাশ হয়ে বিপ্লবের জন্যে দিন গোনে তো হলে তাদের দোষ কী? তার পর স্বাধীনতা বলতে সামাজিক স্বাধীনতাও বোঝায়। যাদের হরিজন বলে অভিহিত করেছেন গান্ধীজী তারা যে তিমিরে তারা সেই তিমিরে। তাদের উপর জুলুম যতই বাড়ছে তারাও হয়ে উঠছে ততই অসহিষ্ণু ও অবাধ্য। কেউ কেউ তো দস্তুরমতো জঙ্গী। বর্ণচেতনার সঙ্গে শ্রেণীচেতনা মিশ্রিত হলে তারা একদিক থেকে হবে বৌদ্ধ, আরেকদিক থেকে মার্কসবাদী। গান্ধীবাদীরা আজ কোথায়? অথচ তাঁদেরি প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

গান্ধীজী যে নৈতিক আদর্শ রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে রেখে যান আজ তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? ভারতকে যাঁরা গান্ধীর দেশ বলে শ্রদ্ধা করতেন তাঁরা আর করেন না। অথচ সে যে গ্রেট পাওয়ার হয়ে শ্রদ্ধা পাবে তাও নয়। তার আগে কমিউনিজমের পথ ধরে চীন গ্রেট পাওয়ার হয়ে উঠবে, ক্যাপিটালিজমের পথ ধরে জাপান গ্রেট পাওয়ার হয়ে উঠবে। এশিয়াতে ভারতের স্থান কোনোদিনই প্রথম বা দ্বিতীয় হবে না। হতে পারত, যদি সে গান্ধীপন্থা ধরে এগোতে

পারত। সেটা এখন একটা বাঁধা বুলি। গঠনকর্ম আর সংগ্রাম ছিল গান্ধীজীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। গঠনকর্মহীন সংগ্রামবিমুখদের জন্যে গান্ধীবাদ নয়। অথবা নয় তাঁদের জন্যে যাঁরা কথায় কথায় অনশন করেন বা মিছিল বার করেন বা 'সত্যাগ্রহ' ঘোষণা করে জেলে যান ও ছাড়া পান। বিলেতে যাকে বলে ইঁদুর বেড়াল খেলা। স্বাধীনতাদিবসে আমাদের সবাইকে আত্মপরীক্ষা ও হৃদয় অনুসন্ধান করতে হবে।
(১৯৭৮)

পরিশিষ্ট

'চতুরঙ্গ' জানুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয়ের কলকাতার দাঙ্গা বিষয়ক প্রবন্ধে একটি তথ্যের ভুল আছে। দাঙ্গা যে বছর অগাস্ট মাসে বাধে আমি সে বছর জানুয়ারি মাসের গোড়ায় ময়মনসিং জেলায় বদলি হই। শ্রীঅশোক মিত্রও সে সময় সেখানে ছিলেন। আমি জেলা জজ, তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আমার পরিষ্কার মনে আছে—সে সময় গভর্নরের শাসন চলছিল। কেসী সাহেব ছিলেন গভর্নর। তিনি বারোজ সাহেবকে শাসনভার দিয়ে বাঙলাদেশ থেকে বিদায় নেন। মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সার নাজিমউদ্দীন নির্বাচনে দাঁড়ান না। সুহরাবর্দী সাহেব নির্বাচনে জিতে মুসলিম লীগের বিধায়ক দলের দলপতি নির্বাচিত হন। পার্লামেনটারি প্রথা অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলপতিকেই প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গঠনের ভার দিতে হয়। সেক্ষেত্রে গভর্নরের কোনো স্বাধীনতা নেই। সুহরাবর্দী সাহেব মুসলিম লীগ বিধায়ক দলের দলপতি বলেই বারোজ সাহেব তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছিলেন। তখনকার দিনে প্রধানমন্ত্রীই বলা হত।

ত্রিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লনডন থেকে 'ট্রান্সফার অভ পাওয়ার' নামক বারো খণ্ডে সমাপ্ত একটি মহাভারত প্রকাশ করেছেন। সেই গ্রন্থের সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম খণ্ডে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালের আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্রের বিশদ বিবরণ আছে। কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা তার অন্তর্গত বিষয়। শ্রীঅশোক মিত্র যদি সে গ্রন্থ না পড়ে থাকেন তবে তাঁকে পড়তে অনুরোধ করি। আমি যে চার খণ্ড পড়েছি তা পড়ে আমার বহু ভুল ধারণা দূর হয়েছে। নোয়াখালির জন্যে দায়ী মুসলিম লীগের টিকিট না পেয়ে রুষ্ট গোলাম সারওয়ার। সুহরাবর্দী নন। মুসলিম লীগও নয়। কলকাতার জন্যে সুহরাবর্দীই একমাত্র দায়ী নন। কতক পরিমাণে নাজিমউদ্দীনও দায়ী। তিনি তখন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি, 'স্টার অভ্ ইণ্ডিয়া' পত্রের

মালিক বা কর্তৃপক্ষ। একহাতে তালি বাজে না। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার লোকরাও আগে থেকে তৈরি ছিল। 'লড়কে লেঙ্গে'র জবাব লড়কে দেঙ্গে।

কেউ ভাবতেই পারেন নি যে দাঙ্গা এত ভয়াবহ আকার নেবে। সার ফ্রেডরিক বারোজ ইঞ্জিন ড্রাইভার থেকে শ্রমিকদলে উঠতে উঠতে ভারতের সেরা প্রদেশের গভর্নর হন। তিনি যদি সার জন অ্যানডারসন হতেন, কড়া হাতে দমন করতে পারতেন। তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শুরু হলে তিনিও পারতেন না। বারোজ আসার আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই টের পেয়েছে যে ইংরেজরা যাচ্ছে, তারা ফাঁসি দিতেও পারবে না, জেলে দিলেও ছাড়া পেতে কতক্ষণ?

পরবর্তী জানুয়ারি মাসে বারোজ সাহেব ময়মনসিং পরিদর্শনে যান। আমাকে ও আমার স্ত্রীকে ডিনারে ডাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি থাকতে কলকাতায় দাঙ্গা বাধল কেন? বাধল যদি তো আপনি বন্ধ করলেন না কেন?' তিনি ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে উত্তর দেন, 'হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় তো লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব?' রিং মানে বক্সিং রিং। 'আমরা চলে যাচ্ছি। আয়ারল্যানড থেকে চলে গিয়ে আমাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে এদেশেও আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হবে।'

আমি তো থ! ওঁরা তা হলে সত্যি-সত্যি চলে যাচ্ছেন! তা হলে ওঁদের দায়ী করে আমাদের কী লাভ? আমার বিশ্বাস ছিল শেষ মুহূর্তে হিন্দুতে-মুসলমানে, কংগ্রেসে-লীগে একটা মিটমাট হবে। তার ফলে বাংলাদেশে হবে কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলী। কোয়ালিশনের বিকল্প গভর্নরের শাসন নয়, পার্টিশন।

কলকাতার দাঙ্গার পর শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা বারোজ সাহেবকে অনুরোধ করেন গভর্নরস রুল জারি করতে। তিনি রাজি হন না। সুহরাবর্দী সাহেবকে তিনি পরামর্শ দেন কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে। সুহরাবর্দী যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কংগ্রেস হাইকমানড সর্বত্র কোয়ালিশনে রাজি না হলে লীগ হাইকমানড বাংলাদেশে কোয়ালিশনে রাজি হবেন না। কয়েকজন লীগপন্থী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোয়ালিশনের প্রস্তাব করেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'আমি কোয়ালিশনে বিশ্বাস করি নে।' ভারতবর্ষের মতো দেশে, বাংলাদেশের মতো প্রদেশে কোয়ালিশন ছাড়া আর কোন্ প্রকার সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে? কোথাও হিন্দু সংখ্যালঘু, কোথাও মুসলিম সংখ্যালঘু, কোথাও শিখ।

মুসলমানদের মধ্যে সুহরাবর্দীর চেয়ে যোগ্যতর মন্ত্রী সাঁইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ—এই দশ বছরে আমরা দেখি নি। কোয়ালিশন হলে তিনিই হতেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের যিনি আস্থাভাজন, অধিকাংশ হিন্দুর চোখে তিনি গুণ্ডার সর্দার। আর তাঁর দলটিও গুণ্ডার দল। তাঁদের হাত

থেকে বাঁচতে হলে চাই তাঁদের পদ্মার ওপারে চালান করে দেওয়া। অন্তত কলকাতা তো নিষ্কণ্টক হবে। হলও শেষ পর্যন্ত তাই। অনুতপ্ত সুহরাবর্দী তখন কলকাতার মুসলমানদের বাঁচাতে মহাত্মা গান্ধীর শরণ নিলেন। সেটাও সম্ভব হল। কথা ছিল গান্ধীজীকে পরে তিনি নোয়াখালি নিয়ে যাবেন ও সেখানকার হিন্দুদেরও বাঁচাবেন। রাজনীতিতে আর তাঁর স্থান ছিল না। নাজিমউদ্দীন হলেন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী। হঠাৎ দিল্লী থেকে বার্তা পেয়ে গান্ধীজী নোয়াখালি না গিয়ে দিল্লী যান ও সেখানেই নিহত হন। সুহরাবর্দী দুই বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যান। তাঁকে শেষ দেখা যায় করাচীতে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে। পরে গদিচ্যুত হয়ে বেইরুটে মৃত্যু।

সেকালের অভিনেতাদের কেউ বেঁচে নেই, থাকলেও পরিত্যক্ত। তাঁদের প্রতি সুবিচার করা উত্তরকালের লেখকদের কর্তব্য। বিশেষ করে ইংরেজদের ও মুসলমানদের প্রতি। সুহরাবর্দী সাহেবকে আমি দেখি নি, কিন্তু নাজিমউদ্দীন সাহেবকে চিনতুম। তিনি ছিলেন একবার আমার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আনীত লঞ্চের অতিথি আর আমি তাঁর ডিনারের অতিথি। আমি তখন নদীয়ার অস্থায়ী কলেকটর আর তিনি গভর্নরের শাসনপরিষদের সদস্য। তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বলেন, 'শুনে সুখী হবেন নওগাঁও থাকতে আপনি যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন সরকার তার স্কীম গ্রহণ করেছেন।' পরের দিন চুয়াডাঙ্গায় কয়েক হাজার কৃষক-প্রজা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁকে ঘেরাও করে। আমার পুলিস সুপার আর আমি তাঁকে উদ্ধার করি। সে সময় কৃষক প্রজা আন্দোলন জোর কদমে চলছিল। হিন্দু-মুসলিম ভেদ ছিল না। সেদিন সভাস্থলে আমি তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দিতে গেলে তিনি হেসে বলেন, 'আপনি দেখছি আনাড়ি।' আমার হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নিয়ে আমার সিগারেট ধরিয়ে দেন। মহকুমা হাকিম ইয়াহিয়া শিরাজী অসুস্থ শুনে তিনি তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করেন। দয়ামায়া, ভদ্রতা, সততা, বিদ্যাবুদ্ধি—সমস্তই তাঁর ছিল। কিন্তু সুহরাবর্দী সাহেবের পরিবর্তে তিনি যদি ছেচল্লিশ সালের অগাস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতেন তাহলে তিনিও কি দাঙ্গা ঠেকাতে বা থামাতে পারতেন?

না। ডাইরেকট অ্যাকশন ঘোষণা জিন্না সাহেবের আদেশ। সে আদেশ উপেক্ষাবা অমান্য করা কারো সাধ্য নয়। না সুহরাবর্দী সাহেবের, না নাজিম-উদ্দীন সাহেবের। উপেক্ষা বা অমান্য করলে মুসলিম লীগ থেকে তাঁদের নাম কাটা যেত। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' তখন মুসলিম লীগ পলিসি। জিন্না সাহেব বলেছিলেন তাঁর হাতেও পিস্তল আছে। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে আর তাঁর বিশ্বাস নেই। সোজা কথায়—লড়তে হবে অস্ত্র হাতে। বাংলাদেশের প্রধান-মন্ত্রী পদে যিনিই থাকুন তাঁর কর্তব্য হত পদত্যাগপূর্বক সংগ্রামে যোগদান। কিন্তু সেই প্রাথমিক কাজটি সুহরাবর্দী বা নাজিমউদ্দীন কেউ করতেন না।

গুণ্ডাকে বলতেন, গুণ্ডামি করো। পুলিসকে বলতেন, গুণ্ডাকে ধরো। পার্লামেনটারি ডেমোক্রাসিতে এমন ব্যাপারে কেউ কখনো দেখে নি। বারোজ সাহেবের উচিত ছিল মুসলিম লীগ সরকারকে বরখাস্ত করা। তা হলে কিন্তু জিন্না সাহেব জেহাদ ঘোষণা করতেন। 'ট্রান্সফার অভ পাওয়ার' গ্রন্থের পরে এক জায়গায় জেহাদের সম্ভাব্যতার উল্লেখ আছে। জবাহরলাল ভারতের প্রধান-মন্ত্রী হবেন, জিন্না হবেন তাঁর ক্যাবিনেটে সাধারণ একজন মন্ত্রী, এটা অপমান-কর। মুসলিম লীগের সদস্য নন এমন মুসলমানকে কংগ্রেস তার দলের মন্ত্রী করবে এটা অমার্জনীয়। সুহরাবর্দী তথা নাজিমউদ্দীন জিন্না সাহেবের আজ্ঞাবহ সৈনিক মাত্র।

অগাস্ট মাসের দাঙ্গা জেহাদের ওয়ার্নিং। পাকিস্তানের দাবিতে জিন্না সাহেব অটল। ইংরেজরাও তাঁকে বোঝাতে পারেন নি পাকিস্তান পেতে হলে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হারাতে হবে। ইতিহাসের সেই মুহূর্তে জিন্নাই মুসলিম লীগ আর মুসলিম লীগই মুসলিম সম্প্রদায় বা মুসলিম নেশন। জিন্নাকে শত্রু করার সাহস ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। কারণ সারা ভারতের বেবাক মুসলমানই বিদ্রোহী হত। হিন্দুদের হাতে গোটা ভারত সঁপে দেওয়া ব্রিটিশ পলিসি ছিল না। কারো হাতে সমগ্র ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই ইংরেজরা বিদায় নিত অথবা দুইজনের হাতে দু'ভাগ দিয়ে যেত। মারামারির চেয়ে গালাগালি ভালো বলে কংগ্রেস নেতারা মেনে নেন। লীগ নেতারাও। ইংরেজের সঙ্গে উভয়ের সমঝোতা হল, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তাই হল না। ঝগড়াও মিটল না। ঘরোয়া ঝগড়াটা পরিণত হল আন্তর্জাতিক বিবাদে।

ঘটনাপঞ্জী

১৯২৯ অক্টোবর	আমার I. C. S জীবন শুরু।
১৯২৯ ডিসেম্বর	লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব।
১৯৩০	লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
১৯৩১	গান্ধী আরউইন চুক্তি। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীজী।
১৯৩২	আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ।
১৯৩৩	সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। পাকিস্তান শব্দটির সৃষ্টি।
১৯৩৫	নতুন ভারতশাসন আইন। মুসলিম লীগে জিন্না অধিনায়ক।
১৯৩৭	প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রীমণ্ডলী।
১৯৩৯	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ। কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ।
১৯৪০	মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব।
১৯৪০	ব্যক্তি সত্যাগ্রহ আরম্ভ।
১৯৪২	অগাস্ট আন্দোলন।
১৯৪৩	বাংলায় মন্বন্তর। ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন।
১৯৪৫	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ।
১৯৪৬	মুসলিম লীগের ডাইরেকট অ্যাকশন শুরু। কেন্দ্রে ইনটারিম গভর্নমেণ্ট।
১৯৪৭	ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ। দেশভাগ, প্রদেশভাগ ও ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা। দেশীয় রাজ্য বিলোপ। আমার I. C. S. জীবন শেষ। এর পরে I. A. S. জীবন, I. C. S.-এর জের।